তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত

প্রথম খণ্ড

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম্-এ, ডি-লিট্
পদ্মবিভূষণ
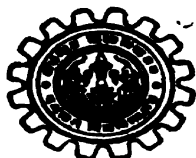
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান
১৯৮৩

মনীষী মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

জন্ম ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭

তন্ত্রের স্বরূপ, আবির্ভাব ও ভেদ

ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা করিতে হইলে বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বেদ ও তন্ত্রের অনুসন্ধান আবশ্যক। বর্তমান সময়ে এই দুইটি সাধনার কোনটিই সাঙ্কর্যদোষ হইতে মুক্ত নহে। শুধু তাহাই নহে, বৈদিক সাধনামূলক স্মার্ত ও পৌরাণিক ধারাও বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায় না—সর্বত্রই মিশ্রণ লক্ষিত হয়। যে প্রকার বৈদিক সাধনার বিকাশক্রমে অবান্তর ধারার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছে, ঠিক সেইপ্রকার তান্ত্রিক সাধনার ক্রমেও বিভিন্ন ধারার আবির্ভাব ও সাঙ্কর্য ঘটিয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে মধ্যযুগ এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা বিষয়ে ভারতের সাংস্কৃতিক ধারাতে বাহ্য ভাবধারার আগন্তুক প্রভাব অল্পবিস্তর পতিত হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। তাত্ত্বিক আলোচনাতে ঐতিহাসিক দৃষ্টি উপযোগী নহে; কারণ, তত্ত্ব ও তাহার উন্মেষক্রম কালের ক্রমবিকাশ ও তদ্‌গত নিয়মের অধীন নহে। যদিও ইহা সত্য যে তত্ত্বান্বেষণেরও ক্রমবিকাশ আছে, তথাপি উহা ঐতিহাসিক গবেষণার বাহিরের বিষয়।

প্রাচীন কালের ন্যায় মধ্যযুগে ও বর্তমান সময়েও বৈদিক সাধনার আলোচনা এবং মনন চলিতেছে। ঐতিহাসিক, শাব্দিক, পৌরাণিক এবং অন্যান্য দৃষ্টিকোণ হইতে এই বিষয়ে পর্যাপ্ত অনুসন্ধান হইতেছে। ইহার মহত্ত্ব ও আবশ্যকতা অস্বীকার করা চলে না। আধুনিক যুগে যোগবিজ্ঞানের দৃষ্টি-কোণ হইতে শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার কতিপয় অনুযায়ী এই বিষয়ে প্রচুর পরিশ্রম করিতেছেন। ইহাও অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ কার্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই রহস্যময় ক্ষেত্রে বহু রহস্য অনুদ্‌ঘাটিতই রহিয়াছে।

তান্ত্রিক সাধনা বিষয়েও কিছুদিন হইতে কার্যারম্ভ হইয়াছে। মহাত্মা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, তাঁহার শিষ্য স্যার জন্ উড্রফ্, পরমশ্রদ্ধাস্পদ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণ এই বিষয়ে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু ইহা দিগ্‌দর্শনমাত্র। প্রাচীন বৈদিক সাধনার ক্রমবিষয়ক অনুশীলন যেমন বহির্মুখ, ঠিক সেইপ্রকার তান্ত্রিক সাধনা বিষয়ক আলোচনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহির্মুখই রহিয়াছে। তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে অধিক আলোচনা এখনও হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে তাহা হইতেও উহার নিগূঢ় রহস্যের উপর আলোকপাত হয় না।

বস্তুস্বরূপ জানিতে হইলে তাহার অন্তরঙ্গ জ্ঞান আবশ্যক। সংস্কৃতির প্রতি বিভাগেই একটা দিক্ আছে যাহা রহস্যাচ্ছন্ন বলিয়া শুধু বিশিষ্ট অধিকারীর অধিগম্য। জগতের সকল সংস্কৃতি সম্বন্ধেই ইহা সত্য।

তান্ত্রিক অথবা বৈদিক সাধনার আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব এখানে আলোচ্য নহে। 'তান্ত্রিক সাধনা' শব্দ দ্বারা এখানে শাক্তসাধনা ও আনুষঙ্গিকরূপে শৈবসাধনা লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বৈষ্ণব ও সৌরাদি সাধন-প্রণালীও বস্তুতঃ তান্ত্রিক পরম্পরার প্রকারভেদ মাত্র। সাধনার সকল ক্ষেত্রেই বাহ্য প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তৎ তৎ প্রণালীর নামকরণ হইয়াছে। বৈষ্ণবক্রমে পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতধারা প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু মিশ্রণ ঘটিয়াছে। পাঞ্চরাত্র তন্ত্র, সাত্বত তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাচীনকাল হইতেই বৈষ্ণব সমাজে সম্মানিত। বর্তমান সময়ে পাঞ্চরাত্র সংহিতা লুপ্তপ্রায় হইলেও প্রায় দুইশত সংহিতা গ্রন্থ এখনও উপলব্ধ হয়। বর্তমান নিবন্ধে বৈষ্ণব অথবা অন্য কোনো তন্ত্রের আলোচনা অভিপ্রেত নহে। শৈব ও শাক্তগণের তান্ত্রিক সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের কিঞ্চিৎ আলোচনাই উদ্দেশ্য।

বেদ ও তন্ত্র শব্দাত্মক হইলেও বস্তুতঃ উহা জ্ঞানেরই প্রকারভেদ মাত্র। এই জ্ঞান দিব্য ও অপৌরুষেয়। বহির্মুখী দৃষ্টি অনুসারে বেদ শব্দের তাৎপর্য যাহাই হউক্ না কেন, বস্তুতঃ বেদের স্বরূপ হইল অতীন্দ্রিয় শব্দাত্মক সূক্ষ্ম জ্ঞানবিশেষ। মন্ত্রদর্শী ঋষিগণ এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সর্বজ্ঞ হইতেন এবং চরমস্থিতিতে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করিয়া জীবন সফল করিতেন। এইজন্য পুরাকল্পে লিখিত আছে—

'যাং সূক্ষ্মাং নিত্যামতীন্দ্রিয়াং বাচং ঋষয়ঃ সাক্ষাৎকৃতধর্মাণো মন্ত্রদৃশঃ পশ্যন্তি, তাম্ অসাক্ষাৎকৃতধর্মেভ্যঃ পরেভ্যঃ প্রতিবেদয়িষ্যমাণা বিল্মং সমামনন্তি, স্বপ্নবৃত্তমিব দৃষ্টশ্রুতানুভূতমাচিখ্যাসন্তে।'

অর্থাৎ যাঁহারা ধর্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন এমন সব ঋষিবৃন্দ নিত্য ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম বাক্যের প্রদর্শন করেন। যাঁহারা ধর্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন নাই, তাঁহারা উহা দর্শন করিতে পারেন না। সকল ব্যক্তিকে সূক্ষ্ম বাকের জ্ঞান দান করার জন্য ঋষিগণ ঐ অতীন্দ্রিয় বাক্‌কে ইন্দ্রিয়গোচর বেদ-বেদাঙ্গ-রূপে প্রকট করেন। এই বেদ ও বেদাঙ্গই বিল্মপদবাচ্য।

স্বপ্নানুভূতি প্রকাশিত করিবার জন্য যেমন স্থূলেন্দ্রিয়গোচর বাণীর আশ্রয় নেওয়া হয়, ঠিক সেইপ্রকার অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বাকের নিরূপণও আবশ্যক।

এই সূক্ষ্ম বাক্‌ই পরাবাক্‌।[১] বেদ এই অতীন্দ্রিয় নিত্যবাকের অবতীর্ণ রূপমাত্র—স্বরূপ নহে। কারণ, মন্ত্রদ্রষ্টা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকটে বেদের স্বরূপ প্রকট হইতে পারে না। বস্তুতঃ বেদ এক এবং স্বরূপতঃ অভিন্ন। উহা বোধাত্মক কিন্তু অভিব্যক্তির সময়ে বাগাত্মক হইয়া শব্দক্রমে প্রকাশিত হয়। এই বেদই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। অহংকার গ্রন্থি—অহম্‌ (আমি) এবং মম (আমার) রূপে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া উত্তীর্ণ হওয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। প্রচলিত বেদের বিভিন্ন আম্নায় রহিয়াছে। এই সকল ঐ অনাম্নাত অখণ্ড বেদের অনুকরণমাত্র। আচার্য ভর্তৃহরিও প্রচলিত বেদ সকলকে 'অনুকার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[২]

বেদের ন্যায় তন্ত্রক্রমও বোধাত্মক ও বাগাত্মক। শিবসমবেতা শক্তির দুইটি রূপ আছে—একটি জ্ঞান, অপরটি ক্রিয়া। জ্ঞানরূপা শক্তি পর ও অপরভেদে দুইপ্রকার। পরজ্ঞান বোধাত্মক ও অপরজ্ঞান বাগাত্মক। বাগাত্মক জ্ঞান শাস্ত্র-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। বোধাত্মক পরজ্ঞান, বাগাত্মক অপরজ্ঞান বা শব্দের উপর আরূঢ় হইয়া অর্থপ্রকাশনে প্রবৃত্ত হয়। সাত্বত সংহিতাতে পরজ্ঞানকে শিবের সাক্ষাৎশক্তি ও অপরজ্ঞানকে তন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টির উন্মেষকালে ভগবান্‌ পরাপর মুক্তি সম্পাদনের জন্য জ্ঞানের প্রকাশ করেন। সর্বপ্রথম পরমকারণ নিষ্কল শিব হইতে অববোধরূপ জ্ঞানের নাদাত্মক প্রসার

---

১ সূক্ষ্ম বাক্‌ বলিতে পরাবাক্‌ই বুঝিতে হইবে। এই সম্বন্ধে দুইটি মত আছে—শব্দব্রহ্মবাদীর মতে সূক্ষ্ম বাক্‌ পুরুষসমবায়িনী ও পুরুষের অমৃতকলাস্বরূপ। সিদ্ধান্তশৈবমতে সূক্ষ্ম বাক্‌ বিন্দুর কার্য ও শব্দবৃত্তি। শৈবদৃষ্টিতে সূক্ষ্ম বাক্‌ পুরুষসমবেতা শক্তি নহে। উহা আত্মাতে অবিভক্তরূপে অবস্থান করে। পরাবাক্‌ কারণ ও নিত্য নহে, কিন্তু কার্য এবং অনিত্য। ইহারই নাম শব্দব্রহ্মরূপ 'রবি' অথবা সূর্য। ইহাকে ভেদ করিতে পারিলেই বিবেক-জ্ঞানের উদয় হয় বুঝিতে হইবে। শব্দব্রহ্মভেদ হইলেই মুক্তির উদয় হইল বুঝিতে হইবে। শব্দব্রহ্মবাদীর মতে সূক্ষ্ম বাক্‌ পশ্যন্তী হইতে অভিন্ন কিন্তু শাক্তমতে উহা আত্মার অথবা পরমশিবের পরাশক্তিস্বরূপ। যখন আত্মস্বরূপে নিজের স্বরূপদর্শন করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তখন প্রকাশাংশ ও বিমর্শাংশ অর্থাৎ শান্তা ও অম্বিকাশক্তি উভয়ের মধ্যে সামরস্য ঘটে। ইহারই নাম পরাবাক্‌ অথবা পরামাতৃকা, যাহার মধ্যে ছত্রিশ তত্ত্বসমন্বিত বিশ্ব বীজস্থিত বৃক্ষের ন্যায় অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং সৃষ্টিকালে অভিব্যক্ত হয়।

২ বস্তুতঃ বেদের যথার্থ স্বরূপই প্রণব—"স হি সর্বঃ শব্দার্থপ্রকৃতিঃ", 'সর্বা বাচো বেদমনুপ্রবিষ্টাঃ'। 'নাবেদবিন্মনুতে ব্রহ্ম কিঞ্চিৎ'।

ঘটিয়া থাকে। তাহার পর নাদাত্মক জ্ঞান সদাশিব রূপ আশ্রয় করিয়া তন্ত্র অথবা শাস্ত্রের রূপ গ্রহণ করেন। এইজন্য পৌষ্করাগমে শাস্ত্রকে নাদরূপ বলা হইয়াছে। নাদরূপে প্রসৃত এই অববোধাত্মক বিমলজ্ঞানের পাঁচটি ধারা আছে—পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও ঊর্ধ্ব। নিষ্কল পরমশিবে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সম্ভাবনা না থাকিলেও নাদের সম্ভাবনা থাকে। অয়স্কান্তের যেমন লৌহাকর্ষণ সামর্থ্য, ইহাও কিয়দংশে তাহারই অনুরূপ। শাস্ত্র শুদ্ধ আত্মবর্গকে ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে।

শাস্ত্রজ্ঞানের প্রকাশ এইপ্রকারে হইয়া থাকে। তন্ত্রানুসারে এই জ্ঞান পর ও অপর ভেদে দুই প্রকার। বস্তুতঃ ইহা অনন্ত। যে জ্ঞানের দ্বারা পশু বা জীবের তত্ত্ব জানা যাইতে পারে অথবা পাশ বা মায়িক জগতের অর্থবোধ হইতে পারে উহার নাম অপরজ্ঞান। ভগবৎতত্ত্বের প্রকাশক জ্ঞানই পরজ্ঞান। ভগবৎতত্ত্বের শিবাত্মক প্রকাশ হইতে রুদ্রাত্মক প্রকাশ ভিন্ন। পরমশিব হইতে প্রবৃত্ত শিবের প্রকাশক জ্ঞানই শিবজ্ঞান। আণব আত্মার মায়াখ্য এবং কার্ম বন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মাকে আণবমল হইতে মুক্তিদান করা শিবজ্ঞানের মহত্ত্ব। ইহা প্রকাশিত হইলে শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। পূর্বোক্ত পশু অথবা পাশজ্ঞান হইতে শিবজ্ঞান সর্বদা পৃথক্, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

অদ্বৈত মতানুসারে জ্ঞানের অবতরণক্রম এইপ্রকারঃ পরাবাক্ অবশ্য সকলের মূল। ইহা বোধস্বরূপ ও পূর্ণস্থিতি। যাবতীয় ভাব এই স্থিতিতে পূর্ণ থাকে। ইহাকেই পরমপরামর্শ বলে। অনন্ত শাস্ত্র পরবোধরূপী পরাবাকে বর্তমান থাকে। সৃষ্টির উন্মেষকালে পরাস্থিত শাস্ত্রাদি ক্রমশঃ নিম্নভূমিকাতে অবতীর্ণ হয় অথবা বহির্মুখ রূপ লইয়া প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রথমে পরমবোধরূপে অহংজ্ঞানের উদয় হৃদয়াভ্যন্তরে ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় পরমবোধ অস্ফুট থাকে। এই বিমর্শস্বভাবে বাচ্যবাচকভাব থাকে না। পশ্যন্তীভূমির অবস্থায় আন্তর পরামর্শ অসাধারণরূপে উদিত হয়। এইজন্য প্রত্যবমর্শনকারী আত্মা বাচ্যার্থের পরামর্শন ব্যাপারে অর্থকে অহন্তা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া অভিব্যক্ত করে। ইহার পর মধ্যমা ভূমির অন্তরালে বাচ্যার্থ বাচ্যবাচক স্বভাবসহকারে উদিত হয়। কিন্তু এই উল্লাস বেদ্যবেদক প্রপঞ্চের উদয় হইতে ভিন্ন। এই মধ্যমা ভূমিতে পরমেশ্বর আপন স্বরূপকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া স্বয়ংই গুরু ও শিষ্যরূপ ধারণ করেন। এই কল্পিত গুরু-শিষ্য ভাবের সাহায্যে গুপ্তজ্ঞান প্রকট করেন।[৩] ঐ সময়ে সদাশিব নামক

---

৩ গুরু কে, শিষ্যই বা কে? বস্তুতঃ অন্বয়মার্গে পরমার্থসত্তারূপ সংবিদ্ই সব কিছু। প্রশ্নকর্তা শিষ্য এবং প্রতিবক্তা গুরু বস্তুতঃ অভিন্ন। পারমার্থিক ও পূর্ণস্বভাব

গুরু এবং ঈশ্বর নামক শিষ্যের আবির্ভাব হয়। গুরু অথবা সদাশিবে পরমেশ্বর নিজের পঞ্চশক্তি অর্থাৎ চিৎ, আনন্দ, জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্রিয়া পঞ্চ মুখের রূপে প্রকট করিয়া থাকেন। সদাশিবের এই পঞ্চমুখের সংঘটন হইতে পঞ্চ-স্রোতোময় অভেদ, ভেদাভেদ এবং ভেদদশা প্রকট হইয়া থাকে। তৎ তৎ প্রভেদ সহিত বৈচিত্র্যময় নিখিলশাস্ত্র এই ভাবেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু আবির্ভূত হইলেও মধ্যমা অবস্থায় এই সকল অস্ফুট থাকিয়া যায়। বৈখরী অবস্থায় আসিবার পর এই সকল পরিষ্কৃত হইয়া শাস্ত্রের রূপ এবং আকার ধারণ করে।

বস্তু সংবিদাত্মক। ইহাই পশ্যন্তী প্রভৃতি ভূমিকে স্পর্শ করিয়া বৈখরী ভূমি পর্যন্ত স্ফীত হয়। এই স্বসংবিদ্‌ই সংকুচিত হইয়া প্রমাতৃরূপ শিবভূমি অবভাসন করিয়া প্রশ্নকর্তা সাজেন। বস্তুতঃ সংবিদ্‌ই প্রশ্নকর্তা। বস্তুতঃ প্রশ্ন ও উত্তর অথবা শিষ্য ও গুরু উভয়েই সংবিন্মাত্র।

গুরুশিষ্যপদেঽপ্যেব বেদ্যভেদোঽপ্যতাত্ত্বিকঃ।

প্রষ্ট্রী চ প্রতিবক্ত্রী চ স্বয়ং দেবী ব্যবস্থিতা ॥ তন্ত্রালোক ১০।২৫৬

সংশয় ও নিশ্চয় বস্তুতঃ এক। সামান্য প্রতীতি সংশয়াত্মিকা, বিশেষ প্রতীতি নিশ্চয়াত্মিকা। বেদান্তদেশিকাচার্য 'তত্ত্বমুক্তাকলাপে' বলিয়াছেন যে ঈশ্বরই অভিনয়চ্ছলে আচার্য এবং শিষ্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন।—

যুক্তিপ্রশ্নোত্তরাদের্নহি পুরুষাভিদাং বুদ্ধিভেদং চ ভুক্ত্বা।

তস্মাদ্ ব্যূহাদিভেদে কতিচন পুরুষাঃ স্যুঃ পরেণানুবন্ধাঃ।

তত্র স্বচ্ছন্দশীলঃ স্বয়মভিনয়তি স্বান্যতাং সর্ববেদী

তদ্‌বচ্ছিষ্যাদিবৃত্তিপ্রসৃতিমিহ সতাং শিক্ষয়ন্ সানুকম্পঃ ॥

উদয়নাচার্যের মত এই—মায়াবৎ সময়াদয়ঃ (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ২য় স্তবক)। মীমাংসকগণ সৃষ্টিপ্রলয় স্বীকার করেন না। সেইজন্য তাঁহাদের দৃষ্টিতে বৈদিক সাধনা-পরম্পরার লোপের প্রশ্নই উঠে না। নৈয়ায়িকগণ প্রলয় এবং প্রলয়ান্তে অভিনব সৃষ্টি স্বীকার করিয়া থাকেন। তথাপি কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। সৃষ্টির আদিতে সকলেই থাকে বলিয়া সময় গ্রহণের প্রশ্ন উঠে। তাই শব্দ ব্যবহার লুপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। কারণ, শব্দ ব্যবহার দৃশ্য ব্যবহারের অনুরূপ। সেইজন্য আদর্শ অর্থাৎ প্রদর্শক না থাকায় দরুণ ঘটাদির নির্মাণ প্রভৃতির সংগতি থাকে না। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বলেন "স্বর্গাদৌ স্বয়মেব পরিগৃহীতপ্রয়োজ্যপ্রয়োজকবৃদ্ধশরীরব্যবহারস্য পরমেশ্বরস্য ব্যবহারত এব সুকরঃ" অর্থাৎ ঘটাদি ক্রিয়াও কুলালাদিবিগ্রহধারী ভগবান্ হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য এই গুরুশিষ্যভাব ধারণ করিয়া পরমাত্মাই জ্ঞান এবং ক্রিয়ার উপদেশ দান করেন।

মালিনীবিজয় বার্তিকে কথিত হইয়াছে যে বিশ্ব বাচ্য এবং বাচক ভেদে দুইপ্রকার। বাচক অংশ শুদ্ধ অথবা দিব্য এবং মানব ভেদে দুই প্রকার। শৈবাগম দিব্যশব্দ অথবা পরমবিমর্শের স্থূলরূপ। স্থূল মানবীয় বাক্ বিশুদ্ধ বিমর্শের রূপ।

অদ্বৈত আগমের সিদ্ধান্ত এই যে, যে সকল শাস্ত্রের প্রকাশ জগতে হইয়া গিয়াছে এবং যাহাদের প্রকাশ এখনও হয় নাই এবং যাহারা প্রকাশিত হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সবই পরাবাকে পরবোধরূপে নিত্য বর্তমান রহিয়াছে। উহাই তন্ত্রের পরম স্বরূপ। পশ্যন্তী প্রভৃতি ভূমিতে পরবোধাত্মক শাস্ত্র তৎ তৎ ভূমির বৈশিষ্ট্য সহ অভিব্যক্ত হয়।

পরবোধ ক্রমশঃ যে প্রণালীতে নিম্নতম ভূমি পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়, উহাই বাস্তবিক পক্ষে তন্ত্রমতানুসারে আবির্ভাবের প্রকার। ইহা কোন ঐতিহাসিক বিশিষ্ট কালে সংঘটিত ঐতিহাসিক ক্রমের ব্যাপার নহে। প্রথমে এই মহাজ্ঞান অহংজ্ঞানের রূপ ধারণ করিয়া অন্তরে স্ফুরিত হয়, ইহা অসাধারণরূপে হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বাচ্য ও বাচক অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ পরস্পর পৃথক্‌রূপে ভাসমান হয় না। এই অবস্থাতে ইদংরূপে বাচ্যার্থের ভান হয় না। প্রত্যবমর্শনকারী প্রমাতা বাচ্য অর্থের পরামর্শ মাত্র করিয়া থাকেন। বাচ্য-বাচক ভাব তখনও থাকে না। ইহা হইল পশ্যন্তী ভূমির কথা। ক্রমশঃ বহির্মুখ-ভাবের বৃদ্ধি হইলে কিছু কিছু বিলক্ষণতা অনুভূত হয়। সর্বপ্রথম বেদ্য-বেদকরূপে প্রপঞ্চের উদয় হয় এবং ইহা হয় অন্তরে। ইহার পর ঐ মহাজ্ঞানে বাচ্য-বাচক ভাবের আবির্ভাব হয় কিন্তু ইহা হয় ভিতরে, বাহিরে নহে। এই ভূমিটি মধ্যমা পদবাচ্য। এই সময় বিশ্বগুরু পরমেশ্বর হইতে অনন্ত শাস্ত্রের স্পষ্ট অবতরণ ঘটিয়া থাকে, ইহাতে নানাপ্রকার ভেদ প্রভেদ বিদ্যমান থাকে।

উপরিবর্ণিত চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই পাঁচটি স্রোতের প্রত্যেকটিতে দুইটি অবস্থা আছে। একটি উদ্ভব-উন্মুখ বলা যায় এবং দ্বিতীয়টি উদ্ভূত। শিবের এই পঞ্চমুখের শাস্ত্রীয় নাম ঈশান, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, বামদেব এবং অঘোর। বর্তমান প্রবন্ধে 'ঈ', 'ত', 'স', 'বা', 'অ'— এই সংকেত দ্বারা ইহাদিগকে বুঝান হইবে। আগমের মতানুসারে মহেশ্বরের স্বরূপ এক, কিন্তু শক্তিবর্গের সম্বন্ধভেদবশতঃ উহাতে অনেকত্ব এবং ভেদের উপচার হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে ভেদাভেদ-প্রধান এবং অভেদ-প্রধান অবস্থার উদয় হয়।

মহেশ্বরের ভেদপ্রধান অবস্থা দশটি এবং ভেদের প্রতিপাদক আগমও মূলে দশটি। ইহাদের আবির্ভাব প্রণালী এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়া থাকে—

উদ্ভব-উন্মুখ 'ঈ', 'ত', 'স' এই তিন মুখ হইতে একেকটি এবং উদ্ভূত 'ঈ', 'ত', 'স' এই তিন মুখের একেকটি। তারপর 'ঈ', 'ত', 'স' ইহাদের দ্বিমুখ মিলন হইতে একেকটি, এই প্রকারে মোট নয়টি। 'ঈ', 'ত', ও 'স'-এর ত্রিমুখ মিলন হইতে একটি। সমষ্টিতে এই দশটি ভেদপ্রধান আগম প্রকট হইয়া থাকে। ইহাদের নাম এইপ্রকার—কামিক, যোগজ, চিন্ত্য, মুকুট, অংশুমান্ দীপ্ত, অজিত, সূক্ষ্ম, সহস্র ও সুপ্রভেদ।[৪]

পরমেশ্বরের ভেদাভেদ প্রধান দশা অথবা রৌদ্র অবস্থা আঠারোটি। ইহা হইতে প্রবৃত্ত রৌদ্রাগমের বিবরণ এইপ্রকার—'বা', 'অ' দুইটি একক, শেষ তিনটি একক 'ঈ', 'ত' ও 'স' ভেদপ্রধান অবস্থার অন্তর্গত ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।

বা — ঈ	}	এই তিনটির দ্বিক।
অ — ঈ		
বা — অ		

ঈ — ত
ঈ — শ
ত — শ

ইহাদের নিরূপণ ভেদপ্রধান তন্ত্রের বিবরণে করা হইয়াছে। 'ত' এবং 'স' এর মধ্যে সংগতি হয় না। ত-বা, স-বা, স-অ, ত-অ এইগুলি বাদ গিয়াছে কারণ 'ত', 'স', 'বা', 'অ' ইহাদের মধ্যে দুই দুই অথবা চার চার মিলন হইতে পারে না।

৪ এই স্থানে দশ শিবজ্ঞানের বিবরণ আচার্য জয়রথের বিবরণের আধারে প্রদত্ত হইল। কিরণাগম অনুসারে নাম কয়টি এইপ্রকার—কামিক, যোগজ, চিন্তা, কারণ, অজিত, দীপ্ত, সূক্ষ্ম, সহস্র, সুপ্রভেদ ও অংশুমৎ। কিরণ-আগমের দৃষ্টিতে পূর্বোক্ত শিবজ্ঞান দশটি আত্মজ শিবের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান। কামিক প্রণব শিবের জ্ঞান, যোগজ সুধাখ্য শিবের জ্ঞান, চিন্ত্য দীপ্তাখ্য শিবের জ্ঞান, কারণ কারণাখ্য শিবের জ্ঞান, অজিত সুশিবের জ্ঞান, সুদীপ্ত ঈশ্বরের জ্ঞান, সূক্ষ্ম শিবের জ্ঞান, সহস্র কালশিবের জ্ঞান, সুপ্রভেদ গণেশ শিবের জ্ঞান এবং অংশুমৎ অংশুশিবের জ্ঞান।

ঈ - স - ত — এক
ঈ - বা - স — এক
ঈ - অ - ত — এক
ঈ - স - বা — এক
ঈ - স - অ — এক
ঈ - বা - অ — এক
ত - স - বা — এক

ত - স - অ — এক
ত - বা - অ — এক
স - বা - অ — এক

এই সবগুলি ত্রিক। 'ঈ', 'ত', 'স' ভেদপ্রধান হওয়ার দরুণ বাদ গিয়াছে এবং 'ঈ', 'বা' 'অ' ইহার নিয়োগ সম্ভবপর নহে।

ঈ - ত - স - বা — এক
ঈ - ত - স - অ — এক
ঈ - ত - বা - অ — এক
ঈ - স - বা - অ — এক

এই চারিটি চতুষ্ক। 'ত', 'স', 'বা', 'অ' ইহার সংগতি হয় না এবং ইহা দ্বিক বা চতুষ্কেতে মিলিত হইয়া জ্ঞানের উৎপাদন করে না।

ঈ - ত - স - বা - অ — ইহা একটি পঞ্চক।

এইপ্রকারে দুইটি একক, তিনটি দ্বিক, আটটি ত্রিক, চারিটি চতুষ্ক এবং একটি পঞ্চক—ইহাদের মিলন হইতে অষ্টাদশ রৌদ্র আগম উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের নাম এইপ্রকার—বিজয়, নিঃশ্বাস, মদ্‌গীত, পারমেশ্বর, মুখবিম্ব, সিদ্ধ, সন্তান, নারসিংহ, চন্দ্রাংশু, বীরভদ্র, আগ্নেয়, স্বয়ম্ভু, বিসর, রৌরব, বিমল, কিরণ, ললিত, সৌমেয়। কোন কোন স্থানে মদ্‌গীত স্থানে প্রোদ্‌গীত নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] ঊর্ধ্বস্রোতে শিব এবং রুদ্র এই দুইপ্রকার জ্ঞান আছে। ইঁহাদের শাস্ত্র আগমরূপে উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ভেদপ্রধান দশটি শৈবাগম এবং ভেদাভেদ-প্রধান আঠারোটি রৌদ্রাগমের উল্লেখ করা হইয়াছে। পরমেশ্বরের অভেদপ্রধান চৌষট্টি দশা আছে। ঐগুলি ভৈরবাগমের সহিত সংসৃষ্ট। শিবের দক্ষিণ মুখকে যোগিনীবক্ত্র বলা হয়। এইটি শিবশক্তির অন্বয় এবং সংঘট্টরূপ। অন্যান্য মুখের মধ্যে প্রত্যেকের উদ্‌ভবোন্মুখ, উদ্‌ভূত, তিরোধানোন্মুখ ও তিরোহিত এই চারিটি স্বরূপ আছে। এই চারিটি মুখে ষোলটি ভেদ নিহিত আছে।

---

৫ কিরণাগমের মতে অষ্টাদশ রুদ্রাগম এইপ্রকার—বিজয়, পারমেশ, নিঃশ্বাস, প্রোদ্‌গীত, মুখবিম্ব, সিদ্ধমত, সন্তান, নারসিংহ, চন্দ্রহাস, ভদ্র, স্বায়ম্ভুব, বিরক্ত, কৌরব্য, মুকুট, কিরণ, ললিত, আগ্নেয় ও পর।

যখন একই সময়ে চারিটি মুখ অন্তলীন হইয়া পরস্পর মিলিত হয়, তখন চৌষট্টি প্রকার অদ্বয়প্রধান ভৈরবাবস্থার আবির্ভাব হয়। এই দক্ষিণ হার্দলিঙ্গ সর্বসংহারক বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ ও তিমিররূপী। ইহা ভেদভাবের মায়ীয় তেজঃ অংশকে গ্রাস করে এবং অন্তরে অনন্ত সৃষ্টির তত্ত্বসমূহ দ্বারা পূর্ণ থাকে। এই দক্ষিণ মুখ বৈসর্গিক, হার্দ এবং স্বতন্ত্র শিবস্বরূপ। যখন ইহাতে একই সময়ে অবশিষ্ট চারি মুখের লয় ঘটে, তখন ভৈরব আগমের আবির্ভাব হয়। ষোল প্রকার ভেদ তখন অস্তমিত হয়। এইজন্য এই অবস্থাটিকে অদ্বয় বলে।

প্রস্থানভেদে ভৈরবাগমের বিভাগ এইপ্রকার—

১। ভৈরবাষ্টক—স্বচ্ছন্দ, ভৈরব, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, অসিতাঙ্গ, মহোচ্ছুষ্ম, কঙ্কালীশ।

২। যামলাষ্টক—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, আথর্বণ, রুরু, বেতাল, স্বচ্ছন্দ।

৩। মতাখ্যাষ্টক—রক্তাখ্য, লম্পটাখ্য, লক্ষ্মী, মত্ত, চালিকা, পিঙ্গল, উৎফুল্লক, বিশ্বাদ্য।

৪। মঙ্গলাষ্টক—ভৈরবী, পিচুতন্ত্র, সমুদ্ভব (দুইপ্রকার), ব্রাহ্মীকলা, বিজয়া, চন্দ্রাখ্যা, মঙ্গলা, সর্বমঙ্গলা।

৫। চক্রাষ্টক—মন্ত্রচক্র, বর্ণচক্র, শক্তিচক্র, কলাচক্র, বিন্দুচক্র, নাদচক্র, গুহ্যচক্র।

৬। শিখাষ্টক—ভৈরবী, বীণা, বীণামণি, সম্মোহ, ডামরু, আথর্বক, কবন্ধ, শিরশ্ছেদ।

৭। বহুরূপাষ্টক—অন্ধক, রুরুভেদ, অজাখ্য, মলসংজ্ঞক, বর্ণকণ্ঠ, বিভঙ্গ, জ্বালিন, মাতৃরোদন।

৮। বাগীশাষ্টক—ভৈরবী, চিহ্নিকা, হংসাখ্য, কাদম্বিকা, হৃল্লেখা, চন্দ্রলেখা, বিদ্যুল্লেখা, বিদ্যুন্মাল।

এইটি সদাশিবচক্র—ইহার চৌষট্টি ভেদই চতুঃষষ্টি আগম। শিবের প্রত্যেক মুখে পাঁচটি অবান্তরভেদ আছে। আগমের উপভেদ বস্তুতঃ অসংখ্য।

একৈকং পঞ্চবক্ত্রং চ বক্ত্রং যস্যাং প্রগীয়তে।
দশাষ্টাদশভেদশ্চ ততো ভেদেষ্বসংখ্যতা॥

শ্রীকণ্ঠীতে তন্ত্রাবতার বিষয়ে লিখিত রহিয়াছে যে তৎপুরুষ বক্ত্র হইতে আটাশ প্রকার গারুড় হৃদয়ের আবির্ভাব হয়। পশ্চিমবক্ত্র হইতে ভূততন্ত্রের ও দক্ষিণবক্ত্র হইতে চব্বিশ প্রকার দক্ষিণ মার্গের আবির্ভাব হয়।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তন্ত্রের মূল স্বরূপ পরাবাক্" রূপ। ইহাই ভগবানের পরাশক্তি। অবতরণক্রমে নিখিল বেদ্যের

স্ফুরণ হয়। এই অবস্থায় কালগত অতীত, অনাগত ও বর্তমানের ভেদ থাকে না; ভেদ স্বাত্মা হইতে অভিন্নরূপে বা তদ্রূপে ভাসমান হয়।

বস্তুতঃ এইটি আত্মবোধের অবস্থা। এখানে বাচক শব্দের অস্তিত্ব নাই এবং বাচ্য অর্থেরও অস্তিত্ব নাই। দ্বিতীয় ভূমিতে অর্থ ইদংরূপে প্রতীত হয়। এই স্তরে অর্থ বাচ্য, এবং শব্দ, ভিন্নাবস্থাতে, বাচকরূপে প্রকাশ পায়। এই স্তরে সূক্ষ্মরূপে যাবতীয় শাস্ত্র বাচক শব্দের আশ্রয়ে আবির্ভূত হয়। আত্মা স্বয়ংই বক্তা গুরু এবং শ্রোতা শিষ্যরূপে প্রকট হন। এইটি মধ্যমা ভূমির ব্যাপার। এই ভূমিতে সর্বশাস্ত্র নিত্য প্রকাশমান। ইহার অল্প অংশ বৈখরীরূপে স্থূলেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূতরূপে আমাদিগের নিকট প্রকট হয়। অবশিষ্ট শাস্ত্র ঐখানেই থাকিয়া যায়। মধ্যমাভূমিতে অনেকপ্রকার অপরিমেয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে। যোগী এবং জ্ঞানী প্রয়োজন অনুসারে ঐ ভূমি হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের দহরবিদ্যাপ্রকরণে এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস আছে। আচার্য ভর্তৃহরি বলেন—'ঋষীণামপি যজ্জ্ঞানং তদপ্যাগমহেতুকম্'। সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভজ্ঞানকে 'অনৌপদেশিক' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহা আগম ও সর্ববিষয়ক।

পূর্বপ্রদর্শিত ক্রমে অবতরণের প্রথম ভূমিই প্রাতিভজ্ঞান। এই বাচ্য-বাচক বিভাগশূন্য পশ্যন্তীভূমিতে উপদেষ্টা ও উপদেশ্যে ভেদ থাকে না। অনৌপদেশিক জ্ঞানের মূলে আগম আছে, ইহা সত্য, কারণ পরাবাক্ অথবা আগমই পশ্যন্তী অথবা প্রতিভার নিদান। তন্ত্রের অবতরণক্রম বিষয়ে যোগী অমৃতানন্দের দৃষ্টি মহত্ত্বপূর্ণ। তিনি বলেন—

বিমর্শরূপিণী শক্তিরস্য বিশ্বগুরোঃ সদা।
পরিস্ফুরতি সৈকাপি নানাভাবার্থরূপিণী॥

মহাস্বচ্ছন্দ তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

গুরুশিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়ং দেবঃ সদাশিবঃ।
প্রশ্নোত্তরপদৈর্বাক্যৈঃ তন্ত্রং সমবতারয়ৎ॥

অমৃতানন্দ আরও বলিয়াছেন—

"প্রকাশাত্মকঃ পরশিবোঽহমেব বিশ্বানুগ্রহপরঃ পরা-পশ্যন্তী মধ্যমা-বৈখরীক্রমেণ ব্যাপৃত্য বিমর্শাংশেন প্রকটো ভূত্বা প্রকাশাংশেন প্রতিবচনদাতাপি সন্ তন্ত্রং সমবতারয়ামি॥"

তান্ত্রিক সংস্কৃতি

এক

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি বর্তমান যুগে আমাদিগের মধ্যে ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের বিষয়। বেদ এবং লুপ্তপ্রায় বৈদিক-সাহিত্যের পুনরুদ্ধারের জন্য পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ সুদীর্ঘকাল হইতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, ইহা সকলেরই পরিজ্ঞাত। তৎকালীন ভারত সরকার দ্বারা পুরাতত্ত্ববিভাগের স্থাপনার সময় হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে--বিশেষতঃ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা, শিলালেখ প্রভৃতি বিষয়ে—অসংখ্য বিস্তৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। দেশের সৌভাগ্যবশতঃ তান্ত্রিক সংস্কৃতিবিষয়ক অন্বেষণ-কার্য ক্রমশঃ সফলতা লাভ করিতেছে। বর্তমান যুগে বিস্মৃতপ্রায় বৈদিক-সাহিত্যের পুনরুদ্ধারবিষয়ক প্রাথমিক উদ্যম যেমন মোক্ষমূলের প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইপ্রকার বিস্মৃতপ্রায় তান্ত্রিক-সাহিত্যের দিকেও সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই বিষয়ে স্যার জন্‌ উড্‌রফ্‌ ওরফে আর্থার এভালনের কথা আমরা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। যদিও বিভিন্ন স্থান হইতে আংশিকভাবে তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহের প্রকাশনকার্য হইতেছে, তথাপি কোনো প্রতিষ্ঠান এখনও পর্যন্ত সামূহিকরূপে এই মহান্‌ কার্যে ব্রতী হয় নাই। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে বর্তমান সময়ে বারাণসীর সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয় এই মহান্‌ কার্যে উৎসাহী হইয়াছেন।

এই কার্য কাশীর পক্ষে উপযুক্ত সন্দেহ নাই। ভারতীয় আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে প্রায় সকল সাধনার জন্যই কাশীর বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। আমার মনে হয় বুদ্ধদেবের সময় হইতেই—অথবা তাহারও পূর্ব হইতে—বিদ্যাক্ষেত্ররূপে কাশী সুপ্রসিদ্ধ। ইহা ভারতে আগত বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণ হইতে জানা যায়। ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে এ-বিষয়ে বহু তথ্য জানা যাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। মধ্যযুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যে এই সময়েও বহুসংখ্যক বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধক ও গ্রন্থকার কাশীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন সাধকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। **সরস্বতীতীর্থ—**

ইনি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ও প্রকাণ্ড বিদ্বান্‌ ছিলেন। তাঁহার আদি নিবাস ছিল দক্ষিণ-ভারতে। ইনি বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, সাহিত্য ও ব্যাকরণের অধ্যাপনা করিতেন। ইঁহার মুখ্যগ্রন্থ ছিল শ্রীশংকরাচার্যকৃত প্রপঞ্চসারের টীকা।

২। **রাঘবভট্ট—**

ইঁহার পিতা নাসিক (পঞ্চবটী) হইতে কাশী আসিয়া এখানেই স্থায়ীরূপে বাস করেন। ইনি শারদাতিলকের টীকা সুপ্রসিদ্ধ পদার্থাদর্শ নামক গ্রন্থ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন।

৩। **সর্বানন্দ পরমহংস—**

ইনি পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) নিবাসী উচ্চকোটির সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে ইনি একসঙ্গে দশমহাবিদ্যার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। ইহা প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বের কথা। ইনি জীবনের শেষ-ভাগে কাশীতে অবস্থান করিতেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি রাজগুরু মঠে বাস করিতেন। ইঁহার বহু অলৌকিক শক্তি ছিল, এরূপ কিংবদন্তী আছে। সর্বোল্লাসতন্ত্র নামক প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ ইঁহারই সংকলন।

৪। **বিদ্যানন্দনাথ—**

ইনি দক্ষিণ-ভারতের লোক। ইঁহার নিবাসস্থান ছিল কাঞ্চীরও দক্ষিণে। ইনি সর্বশাস্ত্রে নিষ্ণাত ছিলেন। তবে তন্ত্রশাস্ত্রেই ইঁহার অনুরাগ অধিক ছিল। ইনি তীর্থযাত্রা ব্যপদেশে জলন্ধর নামক সিদ্ধপীঠ দর্শন করিতে উত্তর-ভারতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে সুন্দরাচার্য অথবা সচ্চিদানন্দনাথ নামক একজন সিদ্ধমহাপুরুষের দর্শন লাভ করেন। পরে তাঁহার নিকট শাস্ত্রবিহিতক্রমে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও বিদ্যানন্দনাথ নামে পরিচিত হন। তাহার পর গুরুর আদেশ অনুসারে কাশী আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কাশী বাসকালে ইনি তন্ত্রশাস্ত্রে বহুসংখ্যক বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা প্রায় ৪০০ বৎসরের পূর্বের কথা।

৫। মহীধর—

ইনি অহিচ্ছত্র হইতে কাশী আসিয়া অন্তিমসময় কাশীতেই অতিবাহিত করেন। "নৌকা" টীকা সহিত মন্ত্রমহোদধি ইঁহার প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ। ইহার রচনাকাল ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। ইঁহার শুক্লযজুর্বেদের টীকা সুপ্রসিদ্ধ।

৬। নীলকণ্ঠচতুর্ধর—

ইঁহার আদিনিবাস ছিল প্রতিষ্ঠানপুর বা পৈঠান। ইনি আজীবন কাশীতেই ছিলেন। মহাভারতের টীকাকাররূপে ইঁহার ব্যাপক প্রসিদ্ধি আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইনি শিবতাণ্ডব নামক গ্রন্থের অনুপারাম নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার রচনাকাল ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

৭। প্রেমানিধি পন্থ—

ইনি কুর্মাচল (কুমায়ুন) হইতে আসিয়া কাশীতে বাস করেন। ইনি জীবনের শেষ পর্যন্ত কাশীতেই ছিলেন। ইনি বহুসংখ্যক তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে মন্ত্রাদর্শ নামক শিবতাণ্ডব টীকা উল্লেখযোগ্য। ইনি শারদাতিলক ও তন্ত্ররাজেরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইনি প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন।

৮। ভাস্কর রায়—

ইনি দক্ষিণদেশের লোক তথাপি দীর্ঘকাল পর্যন্ত কাশীতে বাস করিয়াছিলেন। সিদ্ধপুরুষরূপে ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ইনি তন্ত্রশাস্ত্রে ললিতাসহস্র নামের টীকা, সেতুবন্ধ, বরিবস্যারহস্য, বরিবস্যাপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার জীবিতকাল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী।

৯। শঙ্করানন্দনাথ—

ইঁহার পূর্বনাম ছিল শম্ভুভট্ট। ইনি অদ্বিতীয় মীমাংসক খণ্ডদেবের শিষ্য ছিলেন ও মীমাংসাশাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। ইঁহার রচিত সুন্দরীমহোদয় নামক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ ইঁহার সময় বলা চলে।

১০। মাধবানন্দনাথ—

ইনি সৌভাগ্যকল্পদ্রুমের রচয়িতা। এই গ্রন্থখানি পরমানন্দতন্ত্রের আধারে লিখিত হইয়াছিল। ইনিও কাশীতে বাস করিতেন। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ইনি জীবিত ছিলেন।

১১। ক্ষেমানন্দ—

ইনি মাধবানন্দের শিষ্য ও তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইনি সৌভাগ্য-কল্পলতিকার রচয়িতা।

১২। সুভগানন্দনাথ—

ইনিও কাশীবাসী প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য। ইনি কেরলদেশের ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার পূর্বনাম ছিল শ্রীকণ্ঠ। ইনি কাশীতে তন্ত্র ও বেদের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি মাধবানন্দজীর সমসাময়িক।

১৩। কাশীনাথ ভট্ট—

ইনি ছোট ছোট বহু তান্ত্রিক-গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। ইনি প্রায় একশত বৎসর পূর্বেকার লোক।

এইপ্রকার গৌরবশালী পরম্পরার মধ্যে কাশীতে এই সাংস্কৃতিক উজ্জীবন স্বাভাবিক।

দুই

বর্তমান সময়ে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির যে রূপের সঙ্গে পরিচিত তাহা কালপ্রভাবে বিকৃত এবং সংকুচিত প্রতীত হইলেও এক বিশাল গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই প্রাচীন সংস্কৃতির আদি রূপ কিপ্রকার ছিল তাহা এখন অনুমান করা অসম্ভব। কারণ এই সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানি তাহা প্রায় ঐতিহাসিক যুগের সহিত সংসৃষ্ট। তথাপি এই সম্বন্ধে কিছু আভাস জ্ঞান অবশ্যই আমাদের আছে; কারণ, পণ্ডিতগণ

নিরন্তর যে-সকল গবেষণা করিয়াছেন তাহার ফলে বহু অন্ধকারাবৃত ক্ষেত্রে আলোকসম্পাত হইয়াছে।

বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্লেষণ হইতে জানা যায় যে ইহার বিভিন্ন অংশ আছে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপ নানা বিভাগ আছে। এই সংস্কৃতিতে বৈদিক সাধনারই মুখ্যস্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে এই মূল ধারাতে বিভিন্ন সময়ে নূতন নূতন বিবর্তন ঘটিয়াছে। ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও ইতিহাস পুরাণাদি আলোচনা করিলে এবং ভারতীয় সমাজের আন্তরিক জীবনের দিকে লক্ষ্য করিলে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ঠিক ধারণা হইতে পারে। বৈদিক ধারার প্রাধান্য থাকিলেও ইহাতে যে বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে জানা যাইবে যে এইসব ধারার মধ্যে তন্ত্রের ধারাই সর্বাপেক্ষা প্রধান।

তান্ত্রিক ধারারও বহু দিক্ আছে। তন্মধ্যে একটি ধারা বৈদিক ধারার অনুকূল ছিল। ভবিষ্য গবেষকগণ গভীরভাবে তুলনামূলক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে বৈদিকধারার উপাসনাক্রম অনেকাংশে তত্ত্বতঃ তান্ত্রিক ধারার সহিত একসূত্রে গ্রথিত এবং বহু তান্ত্রিক বিষয় অতি প্রাচীন সময় হইতেই পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। আমার বিশ্বাস, উপনিষদাদিতে যে সকল গুপ্তবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন সম্বর্গ, উদ্গীথ, উপকোসল, ভূমা, দহর, পর্যঙ্ক ইত্যাদি—এইসব ইহারই অন্তর্গত। আমার বিশ্বাস, বেদের রহস্য অংশেও এই সকল রহস্যবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা অসম্ভব নহে যে বেদের ক্রিয়াকাণ্ডও অধ্যাত্মবিদ্যারই বাহ্যরূপ। ইহা অবশ্য নিম্ন অধিকারীর উপযোগী মনে করা হইত। যদি এই সব রহস্যবিদ্যার তত্ত্বনির্ণয় কোনদিন হয়, তখন বুঝিতে পারা যাইবে যে মূলভূত বৈদিক ও তান্ত্রিক বা আগমিক জ্ঞানে বিশেষ ভেদ নাই।

এইখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব মনে হইতে পারে, তথাপি ইহা সত্য যে বেদ ও তন্ত্রের নিগূঢ় রূপ একই প্রকার। উভয়েই অক্ষরাত্মক অর্থাৎ শব্দাত্মক জ্ঞানবিশেষ।

নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা করিলে জানা যায় যে ঋষিগণ সাক্ষাৎকৃতধর্মা ছিলেন এবং তাঁহারা ধর্মসাক্ষাৎকার-বিরহিত জনসাধারণকে উপদেশ মন্ত্র দান করিতেন। ঋষিগণ সাক্ষাৎকৃতধর্মা ছিলেন বলিয়া বস্তুতঃ শক্তিশালী ছিলেন। তাই তাঁহারা কাহারও উপদেশ শ্রবণ করিয়া ঋষিত্বলাভ করিতেন না, প্রত্যুত তাঁহারা স্বয়ং বেদার্থ দর্শন করিতেন। এইজন্যই তাঁহাদিগকে মন্ত্রদ্রষ্টা বলা হইত। মন্ত্রার্থজ্ঞানের মুখ্য উপায় হইল প্রতিভান। ইহারই নামান্তর প্রাতিভ অথবা অনোপদেশিক জ্ঞান। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।

এখানে 'গুরু' শব্দের তাৎপর্য অন্তর্গুরু অথবা অন্তর্যামী। এইপ্রকার উত্তম অধিকারিগণকে প্রাচীনকালে 'দৃষ্টর্ষি' বলা হইত। শক্তির মন্দতাবশতঃ মধ্যম অধিকারিগণ দৃষ্টর্ষি হইতে নিকৃষ্ট ছিলেন। ইঁহারা 'শ্রুতর্ষি' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। উত্তম অধিকারী উপদেশ-নিরপেক্ষভাবে দর্শন লাভ করিতেন কিন্তু মধ্যম অধিকারী উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিতেন। প্রথম জ্ঞানের নাম আর্যজ্ঞান, দ্বিতীয় জ্ঞানের নাম ঔপদেশিক জ্ঞান। মনুসংহিতায় আছে—

আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ॥

কিন্তু সামান্য অধিকারীর জ্ঞান হইত সৎতর্ক দ্বারা। বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কই সৎতর্ক। তদ্দ্বারা অনুসন্ধান আবশ্যক। আগমশাস্ত্রে—বিশেষতঃ ত্রিপুরারহস্যে ও ত্রিক দার্শনিক সাহিত্যে—সৎতর্কের বিশেষ আলোচনা আছে। বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায় যে ঋষিগণ যখন অন্তর্ধান করিতে লাগিলেন তখন তর্কের উপরই জ্ঞানের ভার দিয়া যান। সাধারণ জিজ্ঞাসুমাত্রই নিম্নস্তরের লোক। আমরা সকলেই তাই। তাই সৎতর্কই আমাদের সকলের অবলম্বনীয়।

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে তন্ত্রের মূলাধার কোন পুস্তক নহে। উহা অপৌরুষেয় জ্ঞানবিশেষ। এই জ্ঞানকেই আগম বলে। এই জ্ঞানরূপ আগম শব্দরূপে অবতরণ করে। তন্ত্রমতে পরাবাক্ই অখণ্ড আগম। পশ্যন্তী অবস্থাতে ইহা স্বয়ংবেদ্যরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা স্বয়ংপ্রকাশরূপ। ইহাই সাক্ষাৎকারের অবস্থা। এখানে দ্বিতীয় বা অপরের মধ্যে জ্ঞান-সঞ্চারের কোনো প্রশ্ন থাকে না। এই জ্ঞান মধ্যমাতে অবতীর্ণ হইয়া শব্দের আকার ধারণ করে। এই শব্দ চিন্তাত্মক। এই ভূমিতে গুরু-শিষ্য ভাবের উদয় হয়। ইহার ফলে জ্ঞান এক আধার হইতে অন্য আধারে সঞ্চারিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্র এবং গুরু-পরম্পরার প্রাকট্য মধ্যমা ভূমিতে হইয়া থাকে। বৈখরীতে ঐ জ্ঞান বা শব্দ স্থূলরূপ ধারণ করে, তখন উহা অন্যের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়।

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে বেদ ও তন্ত্রের মৌলিক দৃষ্টি একই। বেদ এক হইলেও বিভক্ত হওয়ার দরুণ ইহাকে 'ত্রয়ী' বা চতুর্বিধ বলা হয়। বস্তুতঃ বেদ অনন্ত। "বেদা অনন্তাঃ", ইহাও বেদেরই বাণী। আগমের স্থিতিও ইহারই অনুরূপ। অবশ্য তন্ত্রের আরও একটি দিক্ আছে। তবে উহা বেদ হইতে কোনো কোনো অংশে বিলক্ষণ, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইতে তান্ত্রিক সাধনার বৈশিষ্ট্যও বুঝিতে পারা যায়। যাহা

হোক্, এসব মিলিত হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গীভূত। যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলধারা নির্গত হইয়া নদীর আকার ধারণ করে এবং চরমে মহাসমুদ্রে বিলীন হয়, তদ্রূপ বৈদিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি অন্যান্য সাংস্কৃতিক ধারা ভারতীয় সংস্কৃতিতে মিলিত হয় এবং উহার বিশালতা উৎপাদন করে।

তিন

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিচার করিলে মনে হয় যে প্রাচীন কাল হইতেই বৈদিক এবং তান্ত্রিক সাধন-ধারার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইহা খুবই সত্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে উভয়ের মধ্যে আংশিক বৈলক্ষণ্যও ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শিষ্টগণ তন্ত্রের সমাদর করিয়াছেন, ইহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে বহুসংখ্যক দেবতা তান্ত্রিক সাধনার প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক সাধনার চরম আদর্শ ছিল শাক্তসাধনা। এই সাধনার লক্ষ্য মহাশক্তি জগদম্বাকে মাতৃরূপে উপাসনা অথবা শিবোপাসনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, স্কন্দ, বীরভদ্র, লক্ষ্মীশ্বর, মহাকাল, কাম অথবা মন্মথ প্রভৃতি সকলেই শ্রীমাতার উপাসক ছিলেন। প্রসিদ্ধ ঋষিদের মধ্যে কেহ কেহ তান্ত্রিক মার্গের উপাসক ছিলেন। কেহ কেহ তান্ত্রিক উপাসনার প্রবর্তকও ছিলেন। ব্রহ্মযামলে বহুসংখ্যক শিবজ্ঞানপ্রবর্তক ঋষির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। উশনা, দধীচি, বৃহস্পতি, সনৎকুমার, নকুলীশ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জয়দ্রথযামলে মঙ্গলাষ্টক প্রকরণে তন্ত্রপ্রবর্তক বহুসংখ্যক ঋষির নাম আছে। তন্মধ্যে দুর্বাসা, সনক, বিষ্ণু, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, সংবর্ত্ত, গালব, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, শাতাতপ, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, ভৃগু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইহাদের মধ্যে দুর্বাসার নামই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তান্ত্রিক সাহিত্যে "ক্রোধ ভট্টারক" নামে দুর্বাসার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে ইনি শ্রীকৃষ্ণকে চৌষট্টি অদ্বৈতকলাবিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে কলিযুগে দুর্বাসাই আগমশাস্ত্রের প্রকাশকর্তা ছিলেন। নেপাল দরবারের গ্রন্থালয়ে সুরক্ষিত মহিম্নস্তোত্রের এক পুঁথিতে ইঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—"সর্বাসামুপনিষদাং দুর্বাসা জয়তি দেশিকঃ প্রথমতঃ"। জয়দ্রথযামল নামক আগমের মতেও তন্ত্রের প্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে দুর্বাসার নাম অগ্রগণ্য। এখন প্রশ্নঃ এই দুর্বাসার ধারা কি প্রকার ছিল? প্রসিদ্ধি আছে যে ব্রহ্মযামলানুসারী সকল তন্ত্রের মধ্যে দুর্বাসার মত অগ্রগণ্য।

এই সিদ্ধান্ত দরবার গ্রন্থাগারের পিঙ্গলাগমে পিঙ্গলামতের প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রকলা বিদ্যাসমূহের মধ্যেও দুর্বাসামত উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকলা বিদ্যাসমূহে কৌল ও কাপালিক (সোম) মতের সংমিশ্রণ। প্রাচীনকালে এইসকল বিদ্যাতে চারিবর্ণেরই অধিকার ছিল। তবে বিশেষ এইমাত্র যে ত্রৈবর্ণিকগণ দক্ষিণমার্গে অনুষ্ঠান করিতেন এবং অন্যান্য সকলে বামমার্গে করিতেন।

দুর্বাসা শ্রীমাতার উপাসক ছিলেন। শ্রীমাতার দ্বাদশ উপাসকের মধ্যে তাঁহারও স্থান আছে। শুনা যায় যে, তাঁহার উপাস্য দেবী ছিলেন ষড়ক্ষরী বিদ্যা। (দ্রষ্টব্য: ত্রিপুরাতাপিণী উপনিষদ্ টীকা)। কোন কোন আচার্যের মতে তিনি ত্রয়োদশাক্ষরী বিদ্যার উপাসক ছিলেন। সৌন্দর্যলহরীর টীকাতে কৈবল্যাশ্রম কাদি মত অনুসারে এই বিদ্যার উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও দুর্বাসার সম্প্রদায় আজকাল লুপ্তপ্রায়।

আমার স্মরণ হয় ৩৮ বৎসর পূর্বে সম্ভবতঃ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার হইতে কৌলসূত্রের একটি প্রতিলিপি পাইয়াছিলাম। উহার প্রারম্ভে লিখিত আছে—

ষড়্দর্শনাতিরিক্তেঽর্থে সূত্রধারো ভুবং শ্রিতঃ রুদ্রাবতারো দুর্বাসাঃ স্তুয়তে স্পর্শকালধৃক্।

এই গ্রন্থ দুর্বাসার মতানুসারে কৌলজ্ঞানবিষয়ক ছিল। নিম্নলিখিত গ্রন্থে দুর্বাসার চর্চা দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) ত্রিপুরসুন্দরী (দেবী) মহিম্নস্তোত্রটীকাতে নিত্যানন্দ নাথ বলিয়াছেন—

সকলাগমাচার্যচক্রবর্তী সাক্ষাৎ শিব এব অনসূয়াগর্ভসম্ভূতঃ ক্রোধভট্টারকাখ্যো দুর্বাসা মহামুনিঃ ॥

(২) ললিতাস্তবরত্ন।

(৩) পরাশিবমহিম্নস্তোত্র অথবা পরশম্ভুস্তুতি।

দুর্বাসা শ্রীবিদ্যা ও পরশিবের উপাসক ছিলেন। কালীসুধানিধি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তিনি কালীরও উপাসক ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে অগস্ত্য সম্বন্ধেও কিছু বলা যাইতেছে। অগস্ত্য বৈদিক ঋষি ছিলেন। পাঞ্চরাত্র ও শাক্তাগমেও অগস্ত্যের বিষয় আলোচনা আছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রায় সব প্রাচীন শাস্ত্রেই অগস্ত্যের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ধর্মপত্নী ছিলেন বিদর্ভরাজকন্যা লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রার বিবরণও প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়। লোপামুদ্রাও অগস্ত্যের ন্যায় বৈদিক ঋষি ছিলেন। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড হইতে জানা যায় যে সুতীক্ষ্ণ

মুনি ভগবান রামচন্দ্রকে গোদাবরী তটস্থিত অগস্ত্যাশ্রমের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে বৈষ্ণব ধনু, ব্রহ্মদণ্ড নামক শস্ত্র, অক্ষয় তূণীর ও খড়্গ দান করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যপর্বতের সঙ্গে অগস্ত্যের সম্বন্ধ সর্বজনবিদিত। দক্ষিণদিকের সহিত অগস্ত্যের সম্বন্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধি আছে যে দক্ষিণভারতে এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির প্রসার মহর্ষি অগস্ত্যের প্রভাবে ঘটিয়াছিল। অগস্ত্য শাক্তসূত্র নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ব্রহ্মসূত্র ও শিবসূত্রের ন্যায় ইহারও প্রসার ব্যাপক ছিল। এই মূল্যবান গ্রন্থ ৪ অধ্যায় ও ৩০২ সূত্রে সম্পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত শ্রীবিদ্যা ভাষ্যও অগস্ত্যের নামে প্রসিদ্ধ। ইহা হয়গ্রীব হইতে প্রাপ্ত পঞ্চদশী বিদ্যার ব্যাখ্যা। অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা উভয়েই শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে ব্রহ্মসূত্রের উপরও অগস্ত্যের ভাষ্য ছিল। কিংবদন্তী এই যে শ্রীপতি পণ্ডিতকৃত শ্রীকর ভাষ্য উহারই মতানুসারী। ত্রিপুরা-রহস্যের মাহাত্ম্যখণ্ড হইতে জানা যায় যে অগস্ত্য উচ্চকোটির বৈদিক ঋষি হওয়া সত্ত্বেও মেরুস্থিত শ্রীমাতার দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়াও দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই : ইহার কারণ ঐ সময় পর্যন্ত তাঁহার তান্ত্রিক দীক্ষা সম্পন্ন হয় নাই। শ্রীমাতার দর্শনোপযোগী বিশুদ্ধ শাক্তদেহ তাঁহার ছিল না। শেষে পরাশক্তির গুহ্য উপাসনার উপযোগী অধিকারলাভের জন্য তিনি দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্বক শাক্তদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপাসনার প্রভাবে পতি ও পত্নী উভয়েই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধির মহিমা এত অধিক ছিল যে ইহার প্রভাবে পতি-পত্নী উভয়েই গুরুমণ্ডলে উত্তমস্থান লাভ করিয়াছিলেন। মানসোল্লাস অনুসারে শ্রীবিদ্যার মুখ্য উপাসকের মধ্যে অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা উভয়েরই স্থান আছে।

দত্তাত্রেয়ও শ্রীবিদ্যার একজন প্রধান উপাসক ছিলেন। দুর্বাসার ন্যায় ইনিও অনসূয়ার গর্ভ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে ইনি শিষ্যগণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে শ্রীবিদ্যার উপাসনার জন্য শ্রীদত্তসংহিতা নামক এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। পরে পরশুরাম উহা অধ্যয়ন করিয়া পঞ্চাশৎ খণ্ডাত্মক সূত্রগ্রন্থরূপে পরিণত করেন। শুনা যায় যে ইহার পর শিষ্য সুমেধা দত্তসংহিতা ও পরশুরামসূত্রের সারাংশ অবলম্বন করিয়া ত্রিপুরা-রহস্য রচনা করেন। শুনা যায় যে দত্তাত্রেয় মহাবিদ্যা মহাকালীরও উপাসক ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শিবভক্ত নন্দিকেশ্বরের কথা মনে পড়ে। ইনিও শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। জ্ঞানার্ণবে ইঁহার উপাসিত বিদ্যার উদ্ধার দৃষ্ট হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম কাশিকা। ইহা ক্ষুদ্র কারিকাত্মক গ্রন্থ। উপমন্যু ইহার উপর টীকা রচনা করেন। নন্দিকেশ্বরও ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ববাদী ছিলেন। কিন্তু ইঁহার তত্ত্বগণনা প্রচলিত মত হইতে বিলক্ষণ। ইঁহার অভিমত ৩৬ তত্ত্বের

মধ্যে সাংখ্যসম্মত ২৫ তত্ত্ব আছে। তদ্ব্যতীত শিবশক্তি, ঈশ্বর, প্রাণাদিপঞ্চক ও গুণত্রয় অন্তর্গত। তাঁহার মতে প্রধান ও গুণত্রয় পৃথক্ পৃথক্। কেহ কেহ মনে করেন যে "অকারঃ সর্ববর্ণাগ্র্যঃ প্রকাশঃ পরমঃ শিবঃ" এই কারিকা নান্দিকেশ্বরের কাশিকার অন্তর্গত। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় যে দুর্বাসা মুনি শ্রীনন্দিকেশ্বরেরই শিষ্য ছিলেন। ইহাও শুনা যায় যে বীরশৈবাচার্য প্রভুদেবের রচনাবলীর কন্নড ভাষার টীকাকার দুর্বাসার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ঐতিহাসিক যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যে ভারতীয় সংস্কৃতির বাস্তবিক প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য ও তাঁহার পূর্বগামী এবং তাঁহার পরবর্তী আচার্যগণের মধ্যে তান্ত্রিক উপাসকের সংখ্যা কম ছিল না। শ্রীশঙ্করের পরমগুরু শ্রীগৌড়পাদ ও গুরুদেব শ্রীগোবিন্দপাদের স্থান ভারতীয় দার্শনিক-গণের মধ্যে অতি উচ্চ। এই প্রসঙ্গে একটি দুর্ভেদ্য রহস্যের সমাধান আবশ্যক। শ্রীশঙ্করাচার্য একদিকে যেমন বৈদিক ধর্মের সংস্থাপক ছিলেন অপরদিকে তেমনই তান্ত্রিক ধর্মের প্রচারক ও উপদেষ্টা ছিলেন। এই রহস্যের প্রকৃত মীমাংসা ভবিষ্যৎ গবেষকগণ করিবেন। উভয় পক্ষেই শঙ্করাচার্যের প্রসিদ্ধি বর্তমান। তাঁহার ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তন গুরু-পরম্পরার দিকে লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে দুই-দিকেই আচার্যপরম্পরা প্রায় একই রূপ। কেহ কেহ মনে করেন যে উভয়পক্ষের আচার্যপরম্পরা এক ও অভিন্ন। দ্বিতীয় মত এই যে বৈদিক ও তান্ত্রিক মতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাই উভয়পক্ষের আচার্য-নামাবলীর অভেদ হইতে সূচিত হয়। গৌড়পাদ প্রকাণ্ড বেদান্তী ছিলেন—তাঁহার মাণ্ডূক্য কারিকা ব্রহ্মাদ্বৈত-সিদ্ধান্তের অপূর্ব আলোচনা। গৌড়পাদ একদিকে যেমন মাধ্যমিক অদ্বয়বাদে নিষ্ণাত ছিলেন, অপরদিকে তেমনি যোগাচার অদ্বয় সিদ্ধান্তেরও পূর্ণ জ্ঞাতা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধদর্শনের পূর্ণ পরিজ্ঞাতা ছিলেন। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞপ্তিমাত্রবাদ উভয় মতই তিনি ভালভাবে জানিতেন। আগম সিদ্ধান্তেও তিনি সুপ্রবিষ্ট ছিলেন। দেবীকালোত্তরের কোন বচন তাঁহার কারিকাতে উপলব্ধ হয়। অবশ্য এ বিষয়ে অধিক বলা বর্তমান সময়ে সম্ভব নহে। আগমমার্গে তিনি সময়াচার অনুসরণ করিতেন, ইহা প্রসিদ্ধ। তাঁহার সুভগোদয়স্তুতি প্রাচীন স্তুতিসাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে। ইহার উপর অনেক টীকাও ছিল। প্রসিদ্ধি আছে যে শঙ্করাচার্যও এক টীকা লিখিয়াছিলেন। 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র'ও ইঁহারই রচনা—ইহারও বহু টীকা আছে। শুনা যায় যে গৌড়পাদ উত্তরগীতার ন্যায় দেবীমাহাত্ম্যেরও ভাষ্য রচনা করিয়া-ছিলেন। এই টীকার রচয়িতা তান্ত্রিক গৌড়পাদও পরমহংস পরিব্রাজক ও অদ্বৈতবিদ্যানিষ্ণাত ছিলেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য বিষয়ে চারিখানা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কিছু বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহা আলোচনা করিলে তাঁহার বৈদিক ও তান্ত্রিক নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পরিস্ফুট হইবে।

(১) প্রথম গ্রন্থের নাম শ্রীক্রমোত্তম।

প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে ইহা রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে শ্রীশঙ্করের একটি গুরুপরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে আছে যে আদিগুরু শিব হইতে বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুকদেব, গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ ও শঙ্কর—ইহাই পরম্পরা। এই গ্রন্থ অনুসারে শঙ্করের শিষ্য ছিলেন বিশ্বদেব। তাহার পর বোধঘন ও গ্রন্থকার মল্লিকার্জুন পর্যন্ত ক্রম আছে। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় শ্রীবিদ্যা।

(২) দ্বিতীয় গ্রন্থ সুমুখীপূজাপদ্ধতি।

—এই গ্রন্থের বিষয় মাতঙ্গীপূজা।

এই গ্রন্থ সুন্দরানন্দনাথের শিষ্য শঙ্করের রচনা। এই গ্রন্থে শঙ্করের গুরুপরম্পরার ক্রম শিব হইতে গোবিন্দপাদ পর্যন্ত একই প্রকার। শঙ্করের শিষ্য বোধঘন, তারপর জ্ঞানঘন প্রভৃতি হইতে ক্রমশঃ ভারতীতীর্থ পর্যন্ত।

(৩) তৃতীয় গ্রন্থ শ্রীবিদ্যার্ণব।

বর্তমান সময়ে এই গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে শ্রীশঙ্করের চৌদ্দজন শিষ্য ছিলেন। পাঁচজন ভিক্ষু ও নয়জন গৃহস্থ।

(৪) চতুর্থ গ্রন্থ ভুবনেশ্বরী রহস্য।

ইহার রচয়িতা পৃথীধর শংকরের শিষ্য, গোবিন্দপাদের প্রশিষ্য ও গৌড়পাদের বৃদ্ধ প্রশিষ্য ছিলেন।

এইসব দেখিয়া মনে হয় যে শঙ্কর শ্রীবিদ্যা ব্যতীত মাতঙ্গী ও ভুবনেশ্বরীরও উপদেষ্টা ছিলেন। আশা করি ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন।

আর এক কথাঃ শঙ্করের শিষ্যকোটি মধ্যে বেদান্তপ্রস্থানের আচার্য পদ্মপাদ পঞ্চপাদিকার রচয়িতা ছিলেন। তিনিই কি শঙ্করকৃত প্রপঞ্চসারের টীকাও লিখিয়াছিলেন? কোনো কোনো প্রাচীন আচার্য ইহা বিশ্বাস করেন, কিন্তু বর্তমান পণ্ডিতগণ ঐ বিষয়ে সংশয়াকুল। শ্রীশঙ্করের তান্ত্রিকরচনাবলী মধ্যে প্রপঞ্চসার প্রধান। ইহার পরই সৌন্দর্যলহরী প্রভৃতি। আনন্দলহরীর সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী টীকাতে শ্রীশঙ্করকৃত ক্রমস্তুতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তুতির একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকের তাৎপর্য এই যে বেদানুসারে মায়াবীজই ভগবতী পরাশক্তির নাম। এই পরাশক্তি জগন্মাতা, ত্রিপুরা ও ত্রিযোনিরূপা। অভিনবগুপ্তের পরাত্রিংশিকাতে যে ক্রমস্তোত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কি এই শ্রীশঙ্করকৃত ক্রমস্তুতি হইতে অভিন্ন?

চার

তান্ত্রিক সংস্কৃতিতে মূলগত সাম্য সত্ত্বেও উহাতে দেশকাল ও ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। এইপ্রকার ভেদ সাধকগণের প্রকৃতিগত ভেদ অনুসারে স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকগণ যখন বিভিন্ন তান্ত্রিকসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংকলন করিবেন ও গভীরভাবে তত্ত্বাদির বিশ্লেষণ করিবেন তখন স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যাইবে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষম্য যতই থাকুক্ তাহাতে তাহাদের মর্মগত সাম্যভাব নষ্ট হয় না। কত তান্ত্রিক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছে এবং কালক্রমে কত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা বলা কঠিন। উপাস্যগত ভেদবশতঃ উপাসনা প্রক্রিয়াতে এবং আচারাদিতে ভেদ হয়। সাধারণতঃ পার্থক্যের ইহাই কারণ। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য সম্প্রদায়ের কথা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এইসকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অবান্তরভেদ অনেক। শৈব এবং শৈব-শাক্ত মিশ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অবান্তরভেদ অনেক আছে। যথা—সিদ্ধান্ত-শৈব, বীর বা জঙ্গমশৈব, রৌদ্র, পাশুপত, কাপালিক অথবা সোম, বাম, ভৈরব ইত্যাদি। অদ্বৈত দৃষ্টি অনুসারে শৈব সম্প্রদায়ের ভেদ ত্রিক, অথবা প্রত্যভিজ্ঞা, স্পন্দ ইত্যাদি। অদ্বৈতমতে শক্তির প্রাধান্যমূলে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে—যথা, স্পন্দ, মহার্থ, ক্রম ইত্যাদি। শিবাগম দশটি এবং রুদ্রাগম আঠারোটি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যেও যে পরস্পর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভেদ না আছে এমন নহে। দ্বৈতমতের মধ্যে কোনো মত খাঁটি দ্বৈত, কোনো মত দ্বৈতাদ্বৈত এবং কোনো মত শুদ্ধাদ্বৈত।

ইহাদের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদে কেহ শিবসাম্যবাদ মানিতেন, আবার অন্য কেহ শিখাসংক্রান্তিবাদ মানিতেন। কাশ্মীরের শিবাদ্বৈত অদ্বৈতভাবে আবিষ্ট। শাক্তগণের মধ্যে কৌলগণও তদ্রূপ। কোনসময়ে ভারতবর্ষে পাশুপতমতের খুব বিস্তার হইয়াছিল। ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোতকর সম্ভবতঃ পাশুপত ছিলেন। ন্যায়ভূষণকার ভাসর্বজ্ঞ তো পাশুপত ছিলেনই। ইঁহার রচিত গণকারিকা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও পাশুপতদর্শনের একটি প্রধান গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়। লাকুলীশ পাশুপতমতও একসময়ে প্রবল ছিল। এই পাশুপতদর্শন একসময়ে পঞ্চার্থবাদ দর্শন ও পঞ্চার্থলাকুলাম্নায় নামে পরিচিত হইত। প্রাচীন পাশুপত সূত্রের উপর রাশীকর কৃত ভাষ্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে দক্ষিণ ভারত হইতে পাশুপতসূত্রের উপর কৌণ্ডিণ্য ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। লাকুল মত বাস্তবিকপক্ষে খুব পুরাতন। সুপ্রভেদ

ও স্বায়ম্ভুব লাকুলাগমের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাব্রত সম্প্রদায় কাপালিক সম্প্রদায়েরই নামান্তর মনে হয়। যামুন মুনির আগমপ্রামাণ্য, শিবপুরাণ প্রভৃতিতে বিভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র চারিটি মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতে (১০.৮৮) 'সোমসিদ্ধান্ত' নামে যে মতের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা যে কাপালিক সিদ্ধান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। 'সোম' শব্দের অর্থ 'উমাসহিত' অর্থাৎ শিবশক্তিযুগল। রঘূত্তম ভাষ্যচন্দ্র নামক টীকাতে সোমসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অকুলবীর তন্ত্রেও এবিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। নরকপাল ধারণবশতঃ কাপালিক নামের আবির্ভাব মনে হয়। বস্তুত ইহা বহিরঙ্গ ব্যাখ্যা। ইহার অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যা প্রবোধচন্দ্রোদয়ের 'প্রকাশ' নাম্নী টীকাতে প্রকট করা হইয়াছে। তদনুসারে এই সম্প্রদায়ের সাধক কপালস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র উপলক্ষিত নরকপালস্থ অমৃত অথবা চান্দ্রী পান করিত। কাপালিক নামের ইহাই রহস্য। ইঁহাদের ধারণা এই যে ইহা অমৃত পান। ইহারা এই পানের দ্বারাই মহাব্রতের সমাপ্তি করে। ইহাই ব্রতপারণা। বৌদ্ধ আচার্য হরিবর্মা ও অসঙ্গের সময়েও কাপালিক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। শাবরতন্ত্রে বারোজন কাপালিক গুরুর ও তাঁহাদের বারোজন শিষ্যের নামসহ বর্ণনা উপলব্ধ হয়। গুরুবর্গের নাম—আদিনাথ, অনাদি, কাল, অমিতাভ, করাল, বিকরাল ইত্যাদি। শিষ্যবর্গের নাম—নাগার্জুন, জড়ভরত, হরিশ্চন্দ্র, চর্পট ইত্যাদি। এইসকল শিষ্য তন্ত্রমার্গের প্রবর্তক ছিলেন। পুরাণাদিতে মতের প্রবর্তক ধন বা কুবেরের উল্লেখ আছে।

কালামুখ ও ভট্টনামক সম্প্রদায়ের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সবিশেষ বিবরণ উপলব্ধ হয় না। প্রাচীন সময়ে শাক্তগণের মধ্যেও সময়াচার ও কৌলাচারের ভেদ বিদ্যমান ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে সময়াচার বৈদিকমার্গের সমকালীন ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। গৌড়পাদ শঙ্কর প্রভৃতি সময়াচারের উপাসক ছিলেন। কৌলদের মধ্যেও পূর্বকৌল ও উত্তরকৌল নামে দুইটি অবান্তর বিভাগ ছিল। পূর্বকৌলদের মতে শিব ও শক্তি আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবী নামে পরিচিত। এই মতে শিব ও শক্তির মধ্যে শেষশেষিভাব স্বীকৃত হয়। কিন্তু উত্তরকৌলমতে তাহা স্বীকৃত হয় না। উত্তরকৌলগণ বলেন যে সর্বদা শক্তিরই প্রাধান্য থাকে, তাই শক্তি কখনও শেষ হয় না ; শিব তত্ত্বরূপে পরিণত হয় কিন্তু শক্তি সর্বদাই তত্ত্বাতীত থাকেন। যখন শক্তি কার্যাত্মক সমগ্র প্রপঞ্চকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করেন তখন তাহার নাম হয় কারণ। ইহারই পারিভাষিক নাম "আধার কুণ্ডলিনী"। প্রাচীন সময় হইতেই কৌলমতের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। কৌলমতেই মানবের

চরম উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। ইঁহারা বলেন যে তপস্যা, মন্ত্রসাধনা প্রভৃতি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই কৌলজ্ঞান ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। সেতুবন্ধ-টীকাতে (পৃঃ ২৫) বলা হইয়াছে—

পুরাকৃততপোদানযজ্ঞতীর্থজপব্রতৈঃ।
শুদ্ধচিত্তস্য শান্তস্য ধর্মিণো গুরুসেবিনঃ॥
অতিগুপ্তস্য ভক্তস্য কৌলজ্ঞানং প্রকাশতে॥

বিজ্ঞানভৈরবের টীকাতে ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন—

বেদাদিভ্যঃ পরং শৈবং শৈবাৎ বামং তু দক্ষিণম্।
দক্ষিণাৎ পরতঃ কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥

কিন্তু সুভাগমপঞ্চকের অন্তর্গত সনৎকুমার সংহিতাতে কৌলজ্ঞানের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। কৌল, ক্ষপণক, দিগম্বর, বামক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ তাহাতে আছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কিছু কিছু বিবরণ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্রের বিষয়েও অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা সম্ভব নহে।

এক সময়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও তান্ত্রিক সাধনার বিস্তার ঘটিয়াছিল। তন্ত্র মধ্যে 'কাদি' ও 'হাদি' মত ছাপ্পান্নটি দেশে প্রচলিত ছিল। এই দুই মতের প্রচারক্ষেত্রের সূচী পরস্পর মিলাইয়া দেখিলে কোন্ কোন্ প্রদেশে কাদি ও কোন্ কোন্ প্রদেশে হাদি মত ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সকল দেশ ভারতবর্ষের চারিদিকে ও মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। পূর্বদিকে ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, কামরূপ, উৎকল, মগধ, গৌড়, সিলহট্ট, কীকট ইত্যাদি। দক্ষিণ দিকে ছিল—কেরল, দ্রবিড়, তৈলঙ্গ, মলয়াদ্রি, চোল, সিংহল ইত্যাদি। পশ্চিমে ছিল—সৌরাষ্ট্র, আভীর, কোকণ, লাট মৎস্য, সৈন্ধব ইত্যাদি। উত্তরে ছিল—কাশ্মীর, শৌরসেন, কিরাত, কোশল ইত্যাদি। মধ্যে ছিল—মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ, মালব, আবন্তক ইত্যাদি। ভারতের বাহিরে ছিল—বাহ্লীক, কাম্বোজ, ভোট, চীন, মহাচীন, নেপাল, হূণ, কৈকয়, মদ্র, যবন ইত্যাদি।

কাদি ও হাদি উভয়মতেরই নানাপ্রকার অবান্তর বিভাগও ছিল।

পাঁচ

তন্ত্রবিস্তারের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। ইহা হইতে জানা যায় যে ভারতবর্ষের প্রায় সব ক্ষেত্রেই বৈদিক সংস্কৃতির সমান্তরালভাবে তান্ত্রিক

সংস্কৃতির বিস্তার হইয়াছিল। কোনো কোনো সময়ে ইহার স্বতন্ত্র পৃথক্ সত্তা ছিল, কখনও তটস্থরূপে এবং কখনও অঙ্গীভূত রূপে। কখনও কখনও প্রতিকূল রূপেও এই সংস্কৃতির প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু সর্বদা ও সর্বত্র ইহা ভারতীয় সংস্কৃতির অংশরূপেই পরিগণিত হইত। ভারতবর্ষের বাহিরে পূর্বে এবং পশ্চিমে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাববিস্তার ঘটিয়াছিল। উহা শুধু বৌদ্ধ সংস্কৃতির স্রোতরূপে নহে, বহুস্থানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারারূপেও। প্রায় বারোশত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় জয়বর্মার রাজত্বকালে কম্বোজ অথবা কাম্বোডিয়াতে ভারতবর্ষ হইতে তন্ত্রগ্রন্থ নীত হয়। ঐগুলি বৌদ্ধতন্ত্র নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র। ঐগুলি শিবাগমের অন্তর্গত। এইসব গ্রন্থের নাম—(১) নয়োত্তর (২) শিরশ্ছেদ (৩) বিনয়শীল এবং (৪) সম্মোহ। ঐতিহাসিকগণের মতে নয়োত্তর বোধ হয় নিঃশ্বাস সংহিতার অন্তর্গত নহে এবং সম্ভবতঃ ইহাই উত্তরসূত্র। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে গুপ্তলিপিতে লিখিত নিঃশ্বাস তত্ত্বসংহিতা নেপাল দরবার পুস্তকালয়ে আছে। এই গ্রন্থ ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতকের হইতে পারে। মনে হয় "শিরশ্ছেদ তন্ত্র" জয়দ্রথ যামলেরই নামান্তর। জয়দ্রথ যামলের এক পুঁথি দরবার পুস্তকালয়ে আছে। কেহ কেহ বিনয়শীলকে জয়দ্রথযামলের পরিশিষ্ট মনে করেন। সম্মোহন তন্ত্র পরিশিষ্টরূপেই গণ্য হয়। ইহা বর্তমান সময়ে প্রচলিত সম্মোহন তন্ত্রের প্রাচীন রূপ বলিয়াই মনে হয়।

ভারতবর্ষ হইতে যেমন তন্ত্র বা তান্ত্রিক সংস্কৃতি বাহিরে গিয়াছে, তেমনই বাহির হইতেও কোন কোন তন্ত্র ভারতে আসিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কুব্জিকাতন্ত্রের নাম স্মরণ হয়। বশিষ্ঠের উপাখ্যান প্রসঙ্গে শুনিতে পাওয়া যায় যে চীন অথবা মহাচীন হইতে উপাসনাক্রম ভারতবর্ষে আনীত হয়, এরূপ কিংবদন্তী আছে। তারা, একজটা ও নীল সরস্বতী হইতে অভিন্ন। তারাতন্ত্রে তারা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিবদ্ধ আছে।

পূর্বে কম্বোজ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা কেবল কম্বোজ সম্বন্ধেই সত্য নহে, নিকটবর্তী অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও সত্য। দেবরাজ নামে শিবের উপাসনা এবং বিভিন্ন প্রকার শক্তির উপাসনা ভারতবর্ষ হইতে বহির্জগতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই সকল দেবদেবীর নাম ভগবতী, মহাদেবী, উমা, পার্বতী, মহাকালী, মহিষমর্দিনী, পাশুপত, ভৈরব ইত্যাদি। চীনা ভাষায় লিখিত প্রাচীন ইতিহাস হইতে এইসব বিবরণ উপলব্ধ হয়। এই কার্য সম্বন্ধে Andhra Historical Society কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছে।

এখন তন্ত্রপীঠ, বিদ্যাপীঠ, মন্ত্রপীঠ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। কামরূপ, জালন্ধর, পূর্ণগিরি ও উড্ডীয়ান—এই চারিটি পীঠ

সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা অনেকেরই আছে। কামরূপের সঙ্গে মৎস্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ছিল। জালন্ধর পীঠের সঙ্গে অভিনব গুপ্তের গুরু শম্ভুনাথের সম্বন্ধ ছিল। ইহা একটি জ্যোতির্লিঙ্গের স্থান। প্রাচীনকালে এইসব স্থান বিদ্যাকেন্দ্র অথবা পীঠস্থান রূপে পরিগণিত ছিল। ইহাদের মধ্যে শ্রীশৈল অথবা শ্রীপর্বত প্রধান ছিল। প্রসিদ্ধি আছে যে স্বয়ং নাগার্জুন অন্তিম সময়ে এই স্থান হইতে তিরোহিত হন। বিভিন্ন তান্ত্রিক বিদ্যার সাধনা, প্রত্যক্ষ অনুভব ও যোগ্য আধারে বিদ্যা-সমর্পণ এইসব পীঠে হইত। পরবর্তীকালে বৌদ্ধগণ নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদন্তপুরী প্রভৃতি স্থানে এই প্রাচীন পীঠের অনুকরণ করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ। সম্পূর্ণ দেশে উনপঞ্চাশ অথবা পঞ্চাশটি পীঠ আছে—ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। এই বিষয়ে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। পীঠতত্ত্বের রহস্য অত্যন্ত গম্ভীর। বস্তুতঃ পীঠশব্দে জাগ্রৎশক্তিসম্পন্ন স্থানকে বুঝায়। সেখানে মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহংকারাদির বিষয়, অব্যক্ত অলিঙ্গের ব্যক্ত জ্যোতিঃস্বরূপ, লিঙ্গরূপ ধারণ করে। অম্বিকা ও শান্তা শক্তিদ্বয়ের সামরস্য যে স্থানে তাহা প্রধান পীঠ। সেখানে অলিঙ্গ অব্যক্ত মহাপ্রকাশ পরমজ্যোতি-রূপে অভিব্যক্ত হয়। এই পীঠের পারিভাষিক নাম পরাবাক্‌। এইপ্রকার যেখানে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এবং বামা, জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রীর সামরস্য হইয়াছে সেই সব স্থান তৎ তৎ পীঠরূপে পরিণত হইয়াছে।

ছয়

এখন পর্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল তাহা তান্ত্রিক সংস্কৃতির বাহ্য অঙ্গের একটি লঘু চিত্রচ্ছায়া মাত্র। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে সংস্কৃতির মহত্ত্ব উহার বাহ্য অবয়বের আড়ম্বরের উপর নির্ভর করে না। সংস্কৃতির মহত্ত্বের পরিচায়ক হইল মানব আত্মার মহনীয়তার আদর্শ প্রদর্শন। যে সংস্কৃতিতে আত্মার স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্যের ও সামর্থ্যের অতিশয় যত অধিক পরিমাণে অভিব্যক্ত হয় ঐ সংস্কৃতির গৌরব তত অধিক স্বীকার করা আবশ্যক। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতিনিধি আর্য ঋষিগণ গাহিয়াছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামাণি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

মানব আত্মাই এই মহান্ আদিত্যবর্ণ পুরুষ, যাঁহাকে জানিলে মৃত্যু অতিক্রান্ত হয়।

এই মানদণ্ড দ্বারাই তান্ত্রিক সংস্কৃতির মহত্ত্ব বোধগম্য হইবে। আত্মার স্বরূপগত এবং সামর্থ্যগত পূর্ণতার আদর্শই ইহার মহত্ত্বের অভিব্যঞ্জক। আগম শাস্ত্র স্পষ্ট নির্দেশ করে যে যদিও আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ তথাপি উহার প্রবুদ্ধ অবস্থা শ্রেষ্ঠ। অপ্রবুদ্ধ অবস্থা চিৎস্বরূপ হইলেও চেতন না হওয়ার দরুণ উহা অচিৎকল্পই বলিতে হইবে। বিমর্শহীন চিৎ অথবা প্রকাশ চিৎ হইলেও অচিৎসদৃশ, প্রকাশ হইলেও অপ্রকাশবৎ এবং শিব হইলেও শববৎ। সেইজন্য ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী।
ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিনী॥

এইজন্য আণবমলকেই আদিমল মনে করা হয়, এবং উহার অপনয়ন না হওয়া পর্যন্ত চিৎস্বরূপ অবস্থাকে শিবত্বহীন পশুকল্প দশা বলা হইয়া থাকে। ঐ সময়ে আত্মা সাঞ্জন না হইলেও নিরঞ্জন পশুমাত্র।

এই ভিত্তির উপর তান্ত্রিক সংস্কৃতির উদাত্ত ঘোষণা এই যে মনুষ্যকে নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না, তাহাকে জাগিতে হইবে "প্রবুদ্ধঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ।" যে পূর্ণত্বকে মানবজীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা হয় উহার উপলব্ধির জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক অনাদি নিদ্রা হইতে জাগরণ অর্থাৎ প্রবোধন। ইহার পর আত্মার ক্রমিক ঊর্ধ্বগতির মার্গে পরমশিব, পরাসংবিৎ অথবা পরম সত্তার সাক্ষাৎকার করা।

মানুষকে জাগিতে হইবে ইহাই প্রথম কথা। কিন্তু ইহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রায় সকল আত্মাই সুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কর্মী, জ্ঞানী অথবা অন্য যে কোন অবস্থায় অবস্থিত আত্মা অধিকাংশস্থলেই আত্মবিমর্শশূন্য লক্ষিত হয়। মানব আপন বিশুদ্ধ স্থিতিতে অবস্থান করিলে অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যময় শিব হইতে অভিন্ন। অশুদ্ধ অবস্থাতে চৈতন্যের অবচ্ছেদ থাকে। অবচ্ছিন্ন অবস্থায় আত্মা গ্রাহকরূপে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন অহংরূপে অথবা পরিমিত বা খণ্ড প্রমাতারূপে অভিব্যক্ত হয়। খণ্ড প্রমাতার সম্মুখে যাবতীয় প্রমেয় গ্রাহ্যরূপে অনুভূত হয়। গ্রাহক আত্মা গ্রাহ্যসত্তাকে নিজ সত্তা হইতে পৃথক্ দেখে। আত্মা গ্রাহ্যের দিকে উন্মুখ হইলেই বুঝিতে হইবে যে চৈতন্য অবচ্ছিন্ন হইয়াছে। পিণ্ডবিশেষের সহিত অর্থাৎ দেহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ অন্যের সহিত অহন্তা অভিমান প্রকট হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ণত্বের অবস্থায় অনাশ্রিত শিব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ছত্রিশ তত্ত্বাত্মক সমগ্র বিশ্বই আত্মার রূপ বা শরীরভাবে প্রকাশিত হয়। অপূর্ণ

অহংএর পূর্ণত্বলাভ আবশ্যক। ইহাই আত্মার পরম জাগরণ। অদ্বৈত সাধনা ইহাকেই পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যে নিয়ত বিশেষ রূপের ভান হয় না। যদি হয় তাহা হইলে ঐ অবস্থার অনবচ্ছিন্নতা মানা সম্ভব নহে—উহা তখন আত্মার গ্রাহক অবস্থা। তখন সামান্য সত্তার রূপে পূর্ণত্বের ভান হয়। এই সামান্যাত্মক মহাসত্তার ভান সবিশেষ এবং নির্বিশেষ উভয়রূপেই হইতে পারে। সর্বাতীত রিক্তরূপ ভামাত্র এবং সর্বাত্মক পূর্ণরূপও ভা। উভয়ত্র ভাস্বররূপতা রহিয়াছে। এই সামান্য সত্তার ভানই 'স্বভাব'পদবাচ্য। ইহা বস্তুতঃ বহুর মধ্যে একের অনুসন্ধান। প্রথমে যে গ্রাহক আত্মার প্রতিনিয়ত ভান হইত তাহা তখন থাকে না। এইভাবে ক্রমশঃ অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দিকে প্রগতি বাড়িতে থাকে।

আত্মা যতদিন নিদ্রিত থাকে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি যতদিন প্রবুদ্ধ না হয় ততদিন উহার স্তরভেদ স্বাভাবিকই থাকে। ঐ সময় উহার অস্মিতা, যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় অথবা শূন্য বা মায়াতে ক্রিয়া করিতে থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে এই অস্মিভাব বাস্তবিক পক্ষে চৈতন্যেরই, গ্রাহকের নহে। অনাশ্রিত হইতে পৃথিবী পর্যন্ত পদের বিস্তারক্ষেত্র বলিয়া পদসংখ্যা অনেক। কিন্তু অস্মিতা কোনো পদের ধর্ম নহে, উহা চিতির ধর্ম। যে কোন পদে অস্মিতার ধারণা হইতে পারে। ধারণার অভিপ্রায় দৃঢ় অভিনিবেশ, যাহার প্রভাবে ইচ্ছামাত্র হইতে ক্রিয়া পর্যন্ত উদ্ভব ঘটিতে পারে।

শুদ্ধ আত্মার অস্মিতাজন্য অভিনিবেশ শুদ্ধাবস্থাতে বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; কারণ, শুদ্ধ আত্মা গ্রাহক নহে, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিন্দু হইতে দেহ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থিতিতে ইহা সর্বত্র ব্যাপক। তাহা হইলেও ইহার বিকাশ সর্বত্র নাই, কারণ বিকাশ ভাবনাসাপেক্ষ। যাহাকে আমরা কর্তৃত্ব, ঈশ্বরত্ব বা স্বাতন্ত্র্যনামে অভিহিত করি তাহা অহন্তার বিকাশ ব্যতীত অপর কিছু নহে। তান্ত্রিক সিদ্ধগণ উহাকেই চিৎস্বরূপতা বলিয়া থাকেন। সকল-প্রকার সিদ্ধিই অহন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত।

তান্ত্রিক যোগ অথবা জ্ঞান সাধনার লক্ষ্য সুপ্ত আত্মাকে জাগাইয়া তোলা। যে সকল আত্মার সঙ্গে আমরা পরিচিত তাহারা প্রায় সকলেই সুপ্ত, কারণ তাহাদের দৃষ্টিতে চিৎ ও শক্তি পরস্পর বিলক্ষণ। সুপ্ত আত্মার দৃষ্টিতে গ্রাহক চিদ্রূপ এবং গ্রাহ্য অচিদ্ রূপ। বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্ব অখণ্ড প্রকাশমাত্র এবং আত্মার অন্তঃস্থিত। তথাপি সুপ্ত আত্মা মনে করে যে বিশ্ব তাহার বাহিরে। এইসকল সুপ্ত আত্মাই সংসারী আত্মা—ইহাদের সঙ্গেই সাধারণতঃ আমাদের পরিচয়। যখন আত্মার নিদ্রাভঙ্গ হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে এই স্থিতির পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়। ইহা শুদ্ধবিদ্যার প্রভাবে হইয়া থাকে। এইসকল আত্মার

তাৎকালিক অবস্থা ঠিক সুপ্তিও নহে অথচ জাগরণও নহে। ইহা উভয়ের মধ্যবর্তী অন্তরাল অবস্থা। এই অবস্থাতে সুপ্তিজনিত ভেদের প্রতীতি থাকে অথচ জাগরণের অভেদজ্ঞানও থাকে। এইসকল লোকের সংসার থাকে না, কিন্তু সংসারের সংস্কারটা থাকে। ইহাদের স্থিতি ভবও নহে, উদ্ভবও নহে। কোনো কোনো অংশে এইসকল আত্মা পাতঞ্জলদর্শনে বর্ণিত সম্প্রজ্ঞাতসমাধির অনুরূপ, কারণ এই অবস্থায় অবিবেক থাকিয়া যায়। ইহার পর শুদ্ধ চিত্তের প্রকাশ হয়—এই অবস্থা কোন কোন অংশে পাতঞ্জল যোগদর্শনের বিবেকখ্যাতির অনুরূপ। ইহা স্বপ্নবৎ অবস্থা—ঠিকঠিক সুপ্তিও নহে, জাগ্রৎও নহে। এইজন্য ইহাকে ঠিকঠিক প্রবুদ্ধ অবস্থা বলা চলে না। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে এই অবস্থার কর্মক্ষয় সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহাকে একদৃষ্টিতে এই সকল আত্মার মুক্ত অবস্থা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তান্ত্রিকদৃষ্টিতে ইহা মুক্ত অবস্থা নহে। তান্ত্রিক পরিভাষাতে এইসকল আত্মাকে রুদ্রাণু বলা যাইতে পারে। ইহারাও পশুকোটিতে অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহা সত্য যে এই সকল আত্মা সংবিৎ মার্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী।

ইহার পরই যথার্থ জাগরণের সূত্রপাত বলা চলে। তখন প্রমাতা সত্যসত্যই প্রবুদ্ধ হয়। তখন ভেদদৃষ্টি মোটেই থাকে না। তবে ভেদ ও অভেদ উভয়ের সংস্কারটা থাকে। তাই এই অবস্থাতেও ইদংরূপে জড়াবস্থার প্রতীতি থাকে। এইসকল আত্মা সমগ্র জগৎকে নিজের শরীর বলিয়া অনুভব করেন। কোনো কোনো অংশে এই অবস্থা ঈশ্বরের অনুরূপ। ইহার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু তাহা স্বানুভববেদ্য।

ইহার পর আত্মার জাগরণ আরও স্পষ্টরূপে ঘটে। তখন প্রবুদ্ধভাবের বৃদ্ধি হয় এবং উহার ফলে ইদং প্রতীতিবেদ্য প্রমেয় অহংরূপে আত্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিমেষবৎ প্রতীত হয়। কিন্তু এতটা হইলেও ইহাকে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা বলা চলে না। ইহা যে প্রবুদ্ধ অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তান্ত্রিক যোগিগণ এই সকল আত্মাকে উদ্‌ভবী নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই সকল আত্মা অভেদপ্রতিপত্তি অথবা কৈবল্যপ্রাপ্তি দ্বারা অহমাত্মক স্বরূপে নিমগ্ন থাকে। এখানে ইদন্তা থাকিলেও অহন্তা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া অস্ফুট থাকে। এই অবস্থাটিকে কোনো কোনো অংশে সদাশিবের অনুরূপ বলিয়া মনে করা চলে, কিন্তু ইহাও পূর্ণত্ব নহে।

এইপ্রকার সুদীর্ঘ মার্গ অতিক্রম করিবার পর বাস্তবিক পূর্ণতার উদয় হয়। কিন্তু উহা উদয়মাত্র। উহা স্থায়ী হয় না, কারণ তখনও উন্মেষ-নিমেষের ব্যাপার চলিতে থাকে। এই ব্যাপার থাকে বলিয়া স্থিতি হয় কখনও ঈশ্বরবৎ এবং কখনও সদাশিববৎ। যখন উন্মেষ বিদ্যমান থাকে তখনকার স্মৃতি

ঈশ্বরসদৃশ, আর যখন নিমেষ বিদ্যমান থাকে তখনকার স্থিতি সদাশিবসদৃশ। উভয় অবস্থাতেই মহাপ্রকাশ অনাবৃত থাকে। শিবাদি ধরণী পর্যন্ত বিশ্বের ভান কখনও থাকে, কখনও থাকে না। যখন বিশ্বের ভান থাকে তখন প্রকাশাত্মক রূপেই উন্মেষ থাকে। আর যখন বিশ্বের ভান থাকে না তখন প্রকাশাত্মক রূপেই নিমেষ থাকে। ইহার পর পূর্ণতা স্থায়ী হয়।

পূর্ণত্বের স্ফুরণের কথা বলা হইল। কিন্তু প্রথমাবস্থাতে পূর্ণত্ব স্থায়ী হয় না, কারণ তাহার সঙ্গে মনের সম্বন্ধ থাকে। মন থাকিলে, মনের অবস্থান-কালে উন্মেষ হয় এবং মনের সম্বন্ধ না থাকিলে নিমেষ হয়। মন থাকা পর্যন্ত উন্মেষ ও নিমেষের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। ইহার পর মন আর থাকে না। তখন উন্মনী অবস্থার আবির্ভাব হয়। উহার প্রভাবে পূর্ণত্ব সুসিদ্ধ হয় বলা যাইতে পারে। আগমবিৎ আচার্য ইহাকে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। এইবার আত্মার জাগরণ পূর্ণ হইল বলা চলে।

সিদ্ধিরহস্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা প্রসংগতঃ বলা যাইতেছে। মনে রাখিতে হইবে, তত্ত্ব ও অর্থ—এই উভয়ের মধ্যে কোনো একটিকে আশ্রয় করিয়া সিদ্ধি উদিত হয়। জাগতিক দৃষ্টিতে জগতের প্রত্যেকটি পদার্থের একটি বিশিষ্ট ক্রিয়াকারিত্ব আছে। যোগিগণ সংযমের দ্বারা তৎ তৎ পদার্থ হইতে তৎ তৎ কর্ম সম্পাদন করিতে পারেন। তত্ত্বমূলক সিদ্ধির দুইটি প্রকার আছে—একটি পরা, অপরটি অপরা। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রেও তত্ত্বময় অবস্থা হইতে সিদ্ধির উদয়ের বিবরণ দৃষ্ট হয়। অর্থবিশেষে আত্মভাবনা করিয়া যোগী তদ্রূপ ধারণ করেন ও উক্ত কার্য সম্পাদন করেন। যে দেবতা যে কার্য সম্পাদন করেন, যোগী সেই দেবতার সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভ করিয়া অর্থাৎ অহংভাবস্থাপন করিয়া সেই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে কোন তত্ত্বে অহন্তার অভিনিবেশ করিলে তদনুরূপ সিদ্ধির উদয় হইতে পারে। মায়া পর্যন্ত একত্রিশ তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া এইপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। এই সকল সিদ্ধির নাম গুহাসিদ্ধি। 'গুহা' শব্দ মায়ার বাচক। মায়াতীত শুদ্ধবিদ্যা অথবা সরস্বতীকে আশ্রয় করিয়া যে সকল সিদ্ধির উদয় হয় তাহাদের নাম তত্ত্বমূলক পরাসিদ্ধি। লৌকিক কার্যের জন্য যে সকল সিদ্ধির প্রয়োজন হয় সেগুলিকে অপরাসিদ্ধি বলে।

এই সকল পরা ও অপরা সিদ্ধি উভয়ই খণ্ড সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি নহে। মহাসিদ্ধি এই উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহাসিদ্ধিও দুই প্রকার। প্রথমটি সকলীকরণ ও দ্বিতীয়টি শিবত্বলাভ। সকলীকরণ অবস্থায় যোগীর ভীষণ জ্বলন অনুভব হয়। তাহার পর শান্ত স্নিগ্ধ শীতলতার আবির্ভাব হয়। যে সময় কালাগ্নি যোগীর দেহাবস্থিত পাশসমূহকে দগ্ধ করে সেই সময় ষড়ধ্বার

দাহ সম্পন্ন হয়। ঐ অবস্থায় ভীষণ তাপের অনুভব হয়। তাহার পর স্নিগ্ধ অমৃতরসে যোগীর সকল সত্তা আপ্লাবিত হইয়া যায়। এই সময় যোগী পূর্ণরূপে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তখন যোগী শোধিত অধ্বা অথবা সমগ্র বিশ্বের অনুগ্রাহক হন। এই অমৃতপ্লাবনের নাম পূর্ণাভিষেক। যোগী এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগদ্‌গুরু পদে অধিষ্ঠিত হন। এই-প্রকারে পূর্ণত্ব লাভ করিয়া তাহাকেও অতিক্রম করিতে হয়, কারণ ইহাও অপূর্ণস্থিতি; ইহার পর যথার্থ পূর্ণখ্যাতির উদয় হয়। উহারই নাম শিবত্ব। ইহা পরমশিবের অবস্থা। ইহাই বাস্তবিক পূর্ণত্ব। এই অবস্থায় পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের আবির্ভাব হয়। তখন ইচ্ছামাত্র ভুবনরচনা বা বিশ্বরচনার অধিকার জন্মে। পঞ্চকৃত্যকারিতার আবির্ভাব এই সময়েই হয়।

বৌদ্ধমতে সুখাবতীর রচনা অমিতাভ বুদ্ধ দ্বারা হইয়াছিল, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বিশ্বামিত্র প্রভৃতির জগদ্ রচনার বিষয় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তান্ত্রিক অধ্যাত্মদৃষ্টির লক্ষ্য এই পরিপূর্ণ অবস্থার প্রাপ্ত। কেবলমাত্র স্বর্গাদি ঊর্ধ্বলোক ও লোকান্তরে গতি অথবা কৈবল্য অথবা নিরঞ্জন ভাবের প্রাপ্তি অথবা মায়াতীত অধিকারী পদলাভমাত্র নহে। মনুষ্যমাত্রের এই অবস্থা-লাভের স্বরূপযোগ্যতা আছে। ইহাই তান্ত্রিক সংস্কৃতির অবদান—ইহা তুচ্ছ মনে করা যাইতে পারে না।

অনাদি সুষুপ্তি ও তাহার ভঙ্গ

যে প্রবুদ্ধ বা জাগরিত অবস্থা তান্ত্রিক সাধনার মূল লক্ষ্য তাহা বুঝিতে হইলে জীবের সুষুপ্তি ও তাহা হইতে জাগরণ বুঝা আবশ্যক। জীবের প্রথম জাগরণ কখন হয় তাহার কালনির্দেশ চলে না। কারণ, যখন জীব প্রথম জাগিয়া উঠে বস্তুতঃ তাহার পক্ষে তখনই কালের গতি আরম্ভ হয়। যখন জীব সুষুপ্ত থাকে তখন কাল স্তম্ভিতবৎ, থাকিয়াও থাকে না। নিদ্রা বা সুষুপ্তি অনাদি ও আদি ভেদে দুইপ্রকার। আদিসৃষ্টির প্রথমে জীব প্রবুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ পথে যাত্রা করে। এই জাগরণ যে-নিদ্রা হইতে হইয়া থাকে তাহাই অনাদি নিদ্রা, কারণ ঐ নিদ্রার পূর্বে জীব জাগিয়া ছিল না—বস্তুতঃ ঐ নিদ্রার পূর্বাবস্থাই নাই। যদি পূর্বাবস্থা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে উহাকে আর অনাদি নিদ্রা বলা চলে না। প্রলয়ান্তে যে সৃষ্টি হয় তাহা সাদি নিদ্রা হইতে জাগরণক্রমে হইয়া থাকে। আদিসৃষ্টির পূর্বে খণ্ডপ্রলয় বা মহাপ্রলয় কিছুই ছিল না। তথাপি যদি প্রলয় শব্দের ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে উহাকে অনাদি নিদ্রারই নামান্তর বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে 'আদিসৃষ্টি' বলার কোন সার্থকতা থাকে না। জীবভাবের ক্রমবিকাশের প্রথম সূত্রপাত আদিসৃষ্টিতেই হইয়া থাকে। অনাদি সুষুপ্তি অবস্থায় অনন্ত জীব অপৃথগ্‌ভাবে লীন থাকে। অনাদিসুষুপ্তির ঊর্ধ্বে যেখানে নিত্য চৈতন্য বিরাজ করিতেছে সেখান হইতে অব্যক্তভাবে সুষুপ্তিমধ্যে অনন্ত জীবের সূচনা হয়। এই সুষুপ্তিটি বিশ্বমাতৃকা মহামায়া। যিনি এই মহামায়ার ঊর্ধ্বে সর্বদা বিরাজ করিতেছেন তিনিই পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী শিব-শক্তি বা ভগবান্-ভগবতীর নিত্যমিলিত অদ্বয়স্বরূপ। পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যবলে তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তি ব্যক্তচৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। চৈতন্যের আত্মপ্রকাশের পূর্বে শক্তি পরমেশ্বরের স্বরূপে গুপ্ত থাকেন। তখন একদিকে যেমন শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না, তেমনি অপরদিকে পরমেশ্বরেরও আত্মোপলব্ধি হয় না। শক্তির অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভবপর নহে।

অতএব শক্তির দুইটি অবস্থা বুঝিতে পারা গেল। একটি গুপ্ত অবস্থা এবং অপরটি প্রকট অবস্থা। শক্তি যখন গুপ্ত থাকে তখন একমাত্র স্বরূপই

থাকে, কিন্তু তাহা না থাকার সমান। শক্তি থাকিলেও তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভূতিগোচর হয় না। ইহাই শিবের 'শব' অবস্থা। ইহা একপ্রকার জড়ত্ব। কিন্তু শক্তি যখন প্রকট তখন তাহাকে চৈতন্য বলে। ইহার প্রভাবেই সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারের স্ফুরণ হইয়া থাকে। শক্তির প্রকট বা চৈতন্য অবস্থাকে বিশিষ্ট আগমবিদ্‌গণ 'পরনাদ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় জড় নাই, শুধু চৈতন্যই চৈতন্য। পরনাদ বা চৈতন্যের প্রভাবে মহামায়ার ঘুমন্ত সত্তা ঝংকার দিয়া জাগিয়া উঠে। মহামায়ার গতি চৈতন্যের প্রভাবেই নিরন্তর শক্তির অধীন হইতেছে। দৃষ্টিই শক্তি। ক্ষণভেদে অনন্ত দৃষ্টি যেন সেই মহামায়াসত্তায় সুপ্ত অনন্ত জীবরূপে বিলীন রহিয়াছে। একদিকে 'রহিয়াছে' বলা চলে, অন্যদিকে লৌকিক প্রজ্ঞার অনুরোধে নিরন্তর 'হইতেছে' বলাও চলে। এই বিলীন ভাব বস্তুতঃ অনাদি নিদ্রারই একটি অবস্থা। ঐ যে পরনাদের কথা বলা হইল উহাই যেন বিশ্বগুরু শ্রীভগবানের ডাক। ঐ ডাকেই বিশ্বসৃষ্টি হইয়া থাকে।

পরনাদের প্রভাবে মহামায়া বা বিন্দু ক্ষুব্ধ হইলে মহামায়ার কার্যরূপে অপরনাদের সূত্রপাত হয়। অপরনাদ শব্দরূপে জ্ঞান, পরনাদ শব্দাতীত বোধরূপে জ্ঞান।

জ্ঞান বোধরূপে ও শব্দরূপে—এই দুই প্রকার। বোধরূপে জ্ঞানও শব্দরূপে আরূঢ় হইয়া প্রবৃত্ত হয়। নতুবা তাহার প্রবৃত্তি থাকিত না। যখন মহামায়া হইতে সুপ্ত জীবসকল জাগিয়া উঠে, তখন তাহারা যে জ্ঞানভূমিতে অবস্থান করে তাহা পরনাদরূপে সাক্ষাৎ চৈতন্য নহে এবং মায়িকজ্ঞান, ভেদজ্ঞানও নহে। কারণ, তখন মায়ার ক্ষোভ হয় নাই। উহাই শব্দরূপে জ্ঞান, যাহা বিন্দুজনিত নাদ বা অপরনাদের দ্বারা অনুবিদ্ধ। এই অবস্থায় নাদাত্মক মহাজ্ঞান হইতে তাহার পঞ্চধারা অবলম্বন করিয়া পঞ্চস্রোতোময় জ্ঞানধারা উপদেশরূপে আবির্ভূত হয়। ইহাই আদিগুরু এবং আদি ঈশ্বরকল্প সিদ্ধ জীবগণ প্রাপ্ত হইয়া "আদিবিদ্বান্" নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। পরনাদরূপে চৈতন্য হইতে বিন্দুক্ষোভের পর আহতনাদের অভিব্যক্তি হইলে পঞ্চস্রোতোময় শাস্ত্র বা উপদেশাত্মক জ্ঞান আদিদৃষ্টিতে আবির্ভূত অধিকারী পুরুষগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে—এই মহাজ্ঞানের উপদেশ কাহার জন্য—সৃষ্টিধারায় আবর্তনশীল প্রবৃত্তিপ্রধান জীবের জন্য, অথবা সংহারধারায় উত্থানশীল নিবৃত্তিপ্রধান জীবের জন্য? ইহার উত্তর এই যে উহা উভয়েরই উপযোগী। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"স পূর্বেষামপি গুরু।" 'পূর্বেষাং' শব্দে সৃষ্টির আদিকালের ঋষি, সিদ্ধ, কার্য-ঈশ্বর প্রভৃতি সকলকে বুঝাইতে পারে। ইঁহারা সকলে সেই পরমস্থান হইতেই, জ্ঞানের সেই পরমভাণ্ডার

হইতেই, আপন আপন যোগ্যতা অনুরূপে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই-জন্যই ঋগ্বেদে অগ্নিকে "পূর্বেভিঃ ঋষিভিঃ ঈড্যঃ" বলা হইয়াছে। 'পূর্ব' বা 'প্রত্ন' ঋষি হইলেন তাঁহারা, যাঁহারা সৃষ্টির আদিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'নূত্ন' হইলেন তাঁহারা, যাঁহারা সৃষ্টির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন বা হইতেছেন। পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদশিক্ষা দিয়াছেন। তারপর ব্রহ্মা স্বয়ং বেদার্থ গ্রহণপূর্বক সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার গূঢ়ার্থ অনুধাবন করা আবশ্যক।

মনে রাখিতে হইবে মহামায়ারূপ বিন্দুতে দুইপ্রকার জীব সুপ্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে একশ্রেণী নিবৃত্ত্যভিমুখ এবং অপর শ্রেণী প্রবৃত্ত্যভিমুখ হইয়া বিন্দুক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়। যে সকল জীবাণু মায়ারাজ্যে পতিত হইয়া সংসার-জীবন যাপনপূর্বক উহার অবসানে পুনর্বার স্বস্থানে ফিরিবার জন্য নিবৃত্তিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, যুগপৎ বা ক্রমশঃ সকল তত্ত্বভেদপূর্বক মায়াতত্ত্বকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা মহামায়াতে সুপ্তভাবে বিলীন থাকে। মায়াভেদ যে প্রকারেই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এইসকল জীব নিবৃত্তিমুখী। ইহাদের মধ্যে যাহাদের আণবমল প্রলয়ের মধ্যকালেই পরিপক্ব হয় তাহারা ঐখান হইতেই ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করে। তাহাদিগকে আর নূতন সৃষ্টিতে অধিকারী প্রভৃতি রূপে আসিতে হয় না। কিন্তু যাহাদের অধিকারাদির বাসনা আছে তাহারা ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া বৈন্দবদেহ ধারণপূর্বক কার্য ঈশ্বরাদিরূপে অধিকারাদি প্রাপ্ত হন। বাসনা একেবারে না থাকিলে অধিকারলাভ ঘটে না। বাসনাও মল বটে, কিন্তু ইহা অনাদি মল নহে; ইহা সাদিমল। এই সকল জীব বা অণু পরনাদের প্রভাবে নিজ স্বরূপ চিনিতে পারে এবং বিন্দুক্ষোভজন্য শুদ্ধদেহ প্রভৃতি লাভ করিয়া ঈশ্বর, দেবতা প্রভৃতি পদে বৃত হয়। পঞ্চ-স্রোতোময় মহাজ্ঞানের উপদেশ ইহারাই প্রাপ্ত হয়। এই উপদেশবশতঃ ইহারা সকলেই বিভুত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়া থাকে। সর্বজ্ঞত্ব না থাকিলে ইহাদের দ্বারা ভগবানের সৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চকৃত্যের সম্পাদন সম্ভবপর হইত না। ইহাদের সকলের মধ্যে ভগবানের কর্তৃত্বশক্তি ও করণশক্তি সমরূপে প্রতিফলিত না হইলেও তাঁহার সর্বজ্ঞানশক্তি সমরূপেই বিকাশপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীন বৈদিক ঋষির ভাষায় বলিতে পারা যায়—ইহারা সকলেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের নিকট বেদজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

যে সকল জীব অনাদি সুষুপ্তি হইতে সর্বপ্রথম জাগিয়া উঠে, তাহারা পরনাদের প্রভাবেই জাগে; কারণ পরনাদরূপিনী চৈতন্যশক্তির আঘাত ব্যতিরেকে মহামায়া হইতে সুপ্তজীবের আবির্ভাব হয় না। ইহারা প্রবৃত্তিমুখী জীব।

ইহাদের লক্ষ্য এখনও বহির্মুখ। ইহারা জাগিয়া উঠিয়াই আত্মবিস্মৃত ভাবে চলিতে থাকে। বস্তুতঃ এই জাগরণ অর্ধজাগরণ। দ্বিতীয় জাগরণের ফলে অন্তর্মুখে গতি হয়। প্রথম জাগরণের পূর্বাবস্থা অনাদি সুষুপ্তি। প্রথম জাগরণ হইতেই স্বপ্ন সুরু হয়, ইহারই নাম অর্ধজাগরণ, দ্বিতীয় জাগরণ হইতে স্বপ্ন সমাপ্ত হইয়া প্রকৃত বা পূর্ণ জাগরণ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় জাগরণের পরে অন্তর্মুখী গতি যেখানে শেষ হয় তাহাই পূর্ণতম জাগরণ। কিন্তু তাহাকে আর জাগরণ বলা চলে না। বস্তুতঃ তাহাই তুরীয়। সাধারণ লোকে যাহাকে তুরীয় বলে ইহা তাহা নহে। ইহাকে সচেতনভাবে প্রাপ্ত হইলেই সুষুপ্তিতে প্রবেশ সম্ভবপর হয়। সুষুপ্তিতে প্রবেশ ব্যতিরেকে ভগবত্তালাভের কথা অলীক কল্পনামাত্র। যেখান হইতে স্বপ্নরূপে সৃষ্টির প্রারম্ভ, পুনর্বার সেইখানেই স্বপ্নান্তে মহাজাগ্রৎকালে পুনঃপ্রবেশ। এইজন্য নিবৃত্তিপথের যাত্রাটিও ঠিক জাগরণ নহে। প্রথম জাগরণের ফলে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া, দ্বিতীয় জাগরণের ফলে নিজস্থানে ফিরিয়া আসা—তাহার পর আবর্তন পূর্ণ হইলে সম্মুখ-পশ্চাতে যাওয়া আসা, ভিতর-বাহির কিছুই থাকে না। সেখানেই সুষুপ্তি ও জাগরণের সমন্বয় হয়। তখন সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, সগুণ ও নির্গুণ, সকল ও নিষ্কল, এক ও অনন্ত, এইসকল ভেদ চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়।

আত্মবিস্মৃত হইয়াই জীব বহির্মুখে ধাবিত হয়। ইহার মূলে চৈতন্য আছে, তাহা না থাকিলে কোনপ্রকার গতি হইতে পারিত না। অনাদি সুষুপ্তিতেও আত্মবিস্মৃতি থাকে বটে, কিন্তু চৈতন্যের প্রেরণার অভাববশতঃ বহির্গতি থাকে না। তদ্রূপ আত্মস্মৃতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবের গতি অন্তর্মুখী হইয়া থাকে। ইহার মূলেও চৈতন্যের প্রেরণা থাকে। যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলে আত্মস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানকৈবল্যরূপী সুষুপ্তি অবস্থার উদয় হইত। বৈন্দবদেহ লাভ করিয়া অন্তর্মুখী গতি হইত না। বহির্গতির সমমাত্রায় অন্তর্গতি সম্পন্ন হয় বলিয়া, বহির্গতির সংস্কারটি দগ্ধ হইয়া যায়। তখন আর উত্থানের সম্ভাবনা থাকে না।

সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তি, বহু হওয়ায়, খেলিতে থাকে। যতক্ষণ বহুভাবের সম্যক্ বিকাশ না হয় ততক্ষণ এই ইচ্ছা কার্য করিতে থাকে। ইহা কালের ঈক্ষণরূপে বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া মহামায়ার গর্ভে সুপ্ত থাকে। ইহাই সুপ্ত জীবসমষ্টি। এই সমষ্টিতে অনন্ত জীবাণু আছে বা পর পর সঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু এই সকল জীব সুপ্ত বলিয়া একপ্রকার জড় পদার্থের ন্যায় অস্তিত্বহীন না হইয়াও অস্তিত্বহীনের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই

সকল অণু-অনন্তসংখ্যক হইলেও ইহাদের পরস্পর পার্থক্য এখন পর্যন্ত বিকশিত হয় নাই।

এইগুলি সমষ্টিরূপে একাকারে সুপ্তভাবে বিলীন থাকে। যে মহা ইচ্ছা হইতে ইহাদের আবির্ভাব তাহার পূর্ণতা এখনও বহুদূরে। কারণ, সেই পরমপুরুষ বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াই এইভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। যতক্ষণ বহুপুরুষের আবির্ভাব না হইবে ততক্ষণ পরমপুরুষের বহু হইবার ইচ্ছা সার্থক হইবে না। সত্য সত্যই বহু হওয়ার জন্য জীবকে স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিতে হইবে। পরমেশ্বরের ইচ্ছা মাতৃশক্তিতে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। সুতরাং একদিকে যেমন মহামায়াতে অণুসমষ্টি সঞ্চিত হয়, অপরদিকে তেমন মায়াতেও হয়। কারণ, মহামায়ার ন্যায় মায়াও মাতৃশক্তি। স্বাতন্ত্র্যপ্রভাবে কালের দিক হইতে নিরন্তর অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গনির্গমের ন্যায় জীবসৃষ্টি হইতেছে। সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহামায়াতে অথবা মায়াতে অথবা মহামায়া হইয়া মায়াতে ঐ সকল অণু সুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। মহামায়ার আদি নাই, মায়ারও আদি নাই। তাই ঐ সকল জীবের সুষুপ্তিও অনাদি নিদ্রা বলিয়া অভিহিত হয়। সাক্ষাৎভাবে অথবা পরম্পরাতে এই নিদ্রা হইতে জীবকে জাগায় পূর্বর্বর্ণিত পরনাদ বা চৈতন্য। অর্থাৎ চৈতন্যের প্রভাবেই সুপ্ত জীব সুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিতেছে।

পূর্ববর্ণিত সুষুপ্তি বস্তুতঃ অণুসকলের রোধ অবস্থা। ঐ অবস্থায় পরমেশ্বরের অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও ক্রিয়া অর্থাৎ চৈতন্য বা ভগবত্তা প্রতি অণুর মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত থাকে, মল অথবা আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করে। যে কারণে জীবের অনাদি নিদ্রার কথা বলা হয় ঠিক সেই কারণে তাহার অনাদি মলসম্বন্ধও স্বীকার করিতে হয়। ইহাকে আপাততঃ পরমেশ্বরের নিগ্রহরূপে গ্রহণ করিলেও বাস্তবিক ইহাও অনুগ্রহেরই প্রকারভেদ। যেখানে মূল সত্তাই মঙ্গলময় সেখানে নিগ্রহের উদ্দেশ্যও মঙ্গলময় না হইয়া পারে না।

ভগবানের স্বাতন্ত্র্য কালরূপে খেলিতেছে, ইহা বলা হইল। উহা তেমনিই চৈতন্যরূপেও খেলিতেছে। একদিকে কালরূপে জীবাণুসকল সঞ্চয় করা হইতেছে, অপরদিকে চৈতন্যরূপে উহাদিগকে অনাদি নিদ্রা হইতে জাগান হইতেছে। কালের খেলার সঙ্গে যেমন চৈতন্যের যোগ আছে, তেমনি চৈতন্যের খেলার সঙ্গেও কালের যোগ আছে। কালের খেলা নিগ্রহ, চৈতন্যের খেলা অনুগ্রহ। চৈতন্যের প্রভাবে অনাদি সুষুপ্তি হইতে জীব জাগিয়া উঠে সত্য, কিন্তু একসঙ্গে সব জীব জাগে না, ক্রমশঃ জাগে। ইহাই চৈতন্যের উপর কালের প্রভাব।

এই জাগরণটি যে দুইপ্রকার তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অভিনব জীবসকল যখন জাগিয়া উঠে তখন তাহারা বহির্মুখভাবেই জাগে, কারণ সৃষ্টিকর্তার বহু হইবার ইচ্ছা এখনও সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হয় নাই। বহির্মুখ না হইলে বহু হওয়া যায় না এবং নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশও হয় না। এই সকল জীব বা অণু জাগিয়া উঠিয়াই নিজের এবং নিজধামের জ্যোতির্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকে। জীব যখন সুপ্ত ছিল, তখন তাহার বোধ ছিল না, সে অচেতন ছিল, তাহাতে আমিত্বভাব ছিল না। কিন্তু যখন সে জাগে তখন আমিভাব লইয়াই জাগে। ইহাই আমিত্বের প্রথম আবির্ভাব। এই 'আমি' বা 'বোধ' পরিদৃশ্যমান অনন্ত জ্যোতির সঙ্গে নিজের অভেদ উপলব্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু যেটি তার নিজের প্রকৃত স্বরূপ, যাহা এই জ্যোতিরও অতীত, তাহা সে ধারণা করিতে পারে না, কারণ জীব এখন বহির্মুখ। এখন নিজ স্বরূপের উপলব্ধির সম্ভাবনা তাহার নাই। কারণ, বহির্মুখ গতি পরিসমাপ্ত করিয়া অন্তর্মুখ গতি প্রাপ্ত না হইলে স্বরূপদর্শন হইতে পারে না।

এই যে জ্যোতিঃস্বরূপে নিজের উপলব্ধি ইহা স্থায়ী হয় না। জীব জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়াও বহির্মুখ বলিয়া উহাতে স্থিত থাকিতে পারে না। সে বাহিরে তাকাইয়া একটি ছায়ার মত জিনিস দেখিতে পায় এবং নিজেকে উহার সহিত অভিন্ন মনে করিতে থাকে। এইপ্রকারে ব্রহ্মভাব হইতে ক্রমশঃ মহাকারণ, কারণ এবং সূক্ষ্মভাব ভেদ করিয়া স্থূলে পর্যন্ত সে অবতীর্ণ হয়। অবতরণের ইহাই চরম সীমা। ইহার পর ভোগ। তাহার পর নিবৃত্তির মুখে সদ্‌গুরুর কৃপায় ঊর্ধ্ব আরোহণ।

এই আরোহণই পূর্ববর্ণিত দ্বিতীয় জাগরণের তত্ত্ব। ইহার প্রভাবে চরম অবস্থায় নিজের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারা যায়। তখন আর বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ কোন ভাবের সহিতই সম্বন্ধ থাকে না।

সৃষ্টিমুখে জীবকে প্রেরণ করা চৈতন্য বা গুরুশক্তির কার্য। তিনি জীবকে জাগাইয়া বাহিরে পাঠান, বাহিরে যাইতে যাইতে যেখানে যাহা কিছু গ্রহণ করিবার আছে তাহা গ্রহণ করাইয়া তাহাকে পুষ্ট করেন। এইভাবে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ফুটিয়া উঠে। তখন পুরুষ-আকার প্রাপ্তির ফলে পরমপুরুষের প্রতিবিম্বধারণের যোগ্যতা জন্মে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় জাগরণের আবশ্যকতা হয়। দ্বিতীয় জাগরণের পর পুরুষরূপে তাহার দিব্যভাবে বিকাশ পূর্ণ হইয়া থাকে। এইপ্রকারে ক্রমশঃ সে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ ও কৈবল্যদেহ ভেদ করিয়া নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবরোহণের মূলে যেমন চৈতন্যের ক্রিয়া অর্থাৎ প্রথম জাগরণ, তেমনই আরোহণের মূলেও চৈতন্যের ক্রিয়া বা দ্বিতীয় জাগরণ রহিয়াছে।

প্রথম জাগরণ হইতে অর্থাৎ অন্নময় কোষের প্রথম গঠন হইতে মনোময় কোষের বিকাশ পর্যন্ত জীবের গতি বহির্মুখী। মনোময় কোষে থাকিতেই বিজ্ঞানের সঞ্চারবশতঃ দ্বিতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। তাহার ফলে অন্তর্মুখী গতি চলিতে থাকে। ব্রহ্ম অবস্থা হইতে যখন মহাকারণ শরীরে অবতরণ হয় তখনই সর্বপ্রথম নরলোকের সাক্ষাৎকার হয়। মহাকারণটি বিশ্ব। ইহাই নর। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে নর হইলেও ইহা একপ্রকার প্রতিবিম্ব, প্রকৃত নরস্বরূপ এখনও বহুদূরে। এই আকার কারণ-অবস্থায় অবতীর্ণ হইয়া লিঙ্গাত্মক ভাবরূপে ব্যক্ত স্থূলসত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। বীজ যেমন ক্ষেত্রে পতিত হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। ইহার পর ক্রমশঃ যোনিভেদে স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হইতে থাকে। স্থাবর হইতে মনুষ্যযোনির পূর্বপর্যন্ত চুরাশি লক্ষ যোনির কথা প্রসিদ্ধ আছে। উদ্ভিদ্, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি অগণিত বৈচিত্র্য আছে। প্রকৃতির ক্রমবিকাশের অন্তর্গত যে কোন দেহে শুদ্ধদৃষ্টির সঞ্চার করা যায় সেখানে অন্তরের অন্তস্তলে মনুষ্যের আকার দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য আকারটি ক্রমবিকাশের ফলে ধীরে ধীরে অন্তঃস্থিত আদর্শরূপে মনুষ্য আকারের সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে। তখন প্রকৃতির বিকাশ আপাততঃ স্থগিত হয়। মনুষ্যদেহ লাভ করা ও অন্নময় কোষ হইতে মনোময় কোষ পর্যন্ত বিকাশ হওয়া একই কথা। চুরাশি লক্ষ যোনি পর্যন্ত প্রথমে অন্নময় ও পরে প্রাণময় কোষের বিকাশ হইয়া থাকে। শেষদিকে মনোময় কোষের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যথার্থ মনোময় কোষের বিকাশ মনুষ্যদেহেই সম্ভবপর হয়। মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইলেই কর্মে অধিকার জন্মে। সৎ ও অসৎ এর বিচার, পাপ-পুণ্যের বোধ, কর্তব্যনিশ্চয়, আভাসমাত্র হইলেও বিবেকজ্ঞানের উদয়, কর্তৃত্ব অভিমান প্রভৃতি মনুষ্যদেহের ধর্ম। মনুষ্য নিজে কর্তা সাজে বলিয়া প্রকৃতি তাহার গৃহরচনার ভার নিজ হাত হইতে প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করেন। মনোময় কোষ বিকশিত হইবার পর জীবের সংসারদশা চলিতে থাকে। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম করা ও তাহার ফলভোগ করা ইহাই এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য। যে পরিণামপ্রবাহে মনোময় কোষ পর্যন্ত বিকাশ হইয়াছে তাহা তখন নিরুদ্ধ থাকে। মানুষ তখন স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করে। এই স্বপ্নভ্রমণের নামই সংসার। বিচিত্রবাসনা অনুসারে বিচিত্র ভোগ সম্পন্ন হয়। যেমন চাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায়। কর্তা সাজার ফলে প্রকৃতির সরল সৃষ্টি হইতে সরিয়া আসিয়া জটিল বিকারময় জালে জড়িত হইতে হয়। এইভাবে দীর্ঘকাল স্বপ্নরাজ্য ভোগ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অতৃপ্তি ও অবসাদে চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। তখন ভোগ্য পদার্থের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। জ্ঞান ও আনন্দময় একটি নিত্যবস্তুর জন্য প্রাণ কাঁদিতে থাকে। স্বপ্নের মোহ আর

তখন ভালো লাগে না। নিজে আর তখন কর্তা সাজিয়া থাকার ইচ্ছা হয় না। নিজের অজ্ঞান ও অক্ষমতা মুহুর্মুহু চিত্তকে ক্লিষ্ট করে। তখন মিথ্যা কর্তৃত্বভার ত্যাগ করিয়া পুনরায় শিশু হইয়া প্রকৃতি-জননীর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হয়।

ইহার পর দ্বিতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। গুরুরূপা প্রকৃতি তখন তাহাকে জাগাইয়া নিজের কোলে টানিয়া লন। তাহার এতদিনকার স্বপ্নের খেলাঘর ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। সে তখন শিশু হইয়া মাতৃকোলে উপবেশনপূর্বক দ্রষ্টারূপে মায়ের সকল খেলা দেখিতে থাকে। প্রকৃতিমাতা তখন আবার গৃহরচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গৃহটি বিজ্ঞানময় কোষ। ইহা রচনা করিতে অত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিতে হয়। জীব তখন আর জীব নহে, মুক্তপুরুষ, কেননা সে সাক্ষী হইয়া প্রকৃতির খেলা নিরীক্ষণ করিতেছে। প্রকৃতি স্বকার্যে আর বাধা প্রাপ্ত হন না বলিয়া নির্বিঘ্নে রচনাকার্যে অগ্রসর হন। দ্বিতীয় জাগরণ হইতে অন্তর্জগতে বিন্দু পর্যন্ত প্রবেশ লাভ করাই বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের বিকাশ। আনন্দময় কোষের বিকাশই ভগবত্তালাভ। মহাকারণ দশায় যে আকারের প্রথম সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয় জাগরণের পর অন্তর্মুখী গতির শেষে জীব তখন সেই আকারে স্থিত হয়। প্রথম জাগরণের পর বহির্মুখী গতি, দ্বিতীয় জাগরণের পর অন্তর্মুখী গতি—দুইটি গতি সমান সমান হইয়া গেলে ভিতর ও বাহির এক হইয়া যায়। ইহাই পরম স্বরূপে অবস্থান।

অনাদি নিদ্রার পর প্রথম জাগরণের পর বহুবার নিদ্রা আক্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু উহা সাদিনিদ্রা। দ্বিতীয় জাগরণের পর সাদিনিদ্রাও থাকে না, যাহা থাকে তাহা নিদ্রার আভাসমাত্র। অন্তর্মুখী গতি শেষ হইয়া গেলে আভাসও থাকে না। সুতরাং সেই মহাজাগরণকে বস্তুতঃ জাগরণ বলাও চলে না।

শাস্ত্রের আদেশ এই যে, পূর্ণত্ব লাভের জন্য ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত যোগীকে সর্বদাই প্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকিতে হইবে।

প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব নিজ শিষ্য-বর্গকে অপ্রমত্ত থাকিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন,—প্রমাদ মৃত্যুপদ, এবং অপ্রমাদ অমৃতের পদ। অপ্রমত্ত থাকার তাৎপর্য এই যে, যোগীকে সর্বদাই নিজের লক্ষ্যের প্রতি সাবধান অথবা নিবিষ্ট-চিত্ত থাকিতে হয়। স্পন্দবাদী শাক্ত যোগিগণ এই বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছেন। উহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারিলে অন্তর্মুখী যোগীমাত্রের পরম কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

শাক্ত অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে আত্মা এক ও অভিন্ন। আত্মাই শিব এবং আত্মাই পরমশিব। যাহাকে ভগবৎতত্ত্ব (অথবা পরমেশ্বর) বলা হয় তাহাও বাস্তবিকপক্ষে আত্মা ভিন্ন অপর কিছু নহে। আত্মার দুইটি স্থিতি আছে। তদনুসারে একদিকে ইহা স্বাতন্ত্র্যশক্তিসম্পন্ন। ইহাই পরমশিবরূপ। অপর দিকে ইহা স্বাতন্ত্র্যহীন চিদাত্মক প্রকাশমাত্র। ইহাই শিবরূপ। স্বাতন্ত্র্যশক্তি পরাবাক্, পূর্ণাহন্তা, পরম ঐশ্বর্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। আত্মা কখনও পরম স্থিতিতে শক্তিশূন্য হয় না। এই শক্তি, যাহার অপর নাম স্পন্দ, সামান্য ও বিশেষ ভেদে দুই প্রকার। সামান্য শক্তি সামান্যস্পন্দ নামে অভিহিত হয় এবং বিশেষ শক্তি বিশেষ স্পন্দ নামে পরিচিত। সামান্যশক্তি হইতেই বিশেষ শক্তির আবির্ভাব হয়। ইহার কারণ আত্মার স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস। যখন আমরা বিশ্বসৃষ্টির দিক হইতে আত্মার স্বরূপের আলোচনা করি তখন আমরা এই বিশেষ শক্তির উদ্ভব ও ক্রিয়ার অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার পশ্চাতে সৃষ্টির ইচ্ছারূপ স্বাতন্ত্র্যশক্তির বিলাস বিদ্যমান রহিয়াছে। এই অবস্থায় আত্মার সামান্য স্পন্দ অক্ষুণ্নই থাকে, কিন্তু তাহাকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত বিশেষ স্পন্দের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। আমরা জগতে বাহিরে ও ভিতরে বাহ্যপদার্থ ও ভাবরূপে যাহা কিছু অনুভব করিয়া থাকি তাহা পূর্ববর্ণিত সামান্য স্পন্দ হইতে আবির্ভূত বিশেষ স্পন্দের ফল। সামান্য স্পন্দ বিশুদ্ধ অহংরূপে স্ফুরিত হয় কিন্তু বিশেষ স্পন্দ 'অহং'রূপে স্ফুরিত না হইয়া 'ইদং'রূপে স্ফুরিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, এই স্ফুরণ কাহার নিকট হয়? ইহা যে সামান্য স্পন্দাত্মক পূর্ণ অহং-এর নিকটে হয় না তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ ঐ অহং-এর সঙ্গে 'ইদং' ভাবের সম্বন্ধ নাই। উহা পূর্ণ 'অহং'-রূপী ও অপরিচ্ছিন্ন। উহার প্রতিযোগিরূপে 'ইদং' থাকিতে পারে না। "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" ইহাই উহার প্রকাশ, উহা অদ্বৈত। ঐ স্থিতিতে দ্বিতীয়ের কোনও স্থান নাই। ঐ বিরাট্ 'অহং'এর নিকট পৃথক্‌ভাবে বিশ্ব বা জগৎরূপে কিছু থাকিতে পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত 'ইদং'রূপী অর্থ ও ভাব পূর্ণ 'অহং'এর নিকট প্রকাশিত হয় না। পরন্তু পরিচ্ছিন্ন 'অহং'এর নিকটই প্রকাশিত। এই পরিচ্ছিন্ন 'অহং'ই ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব, পশু প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যদিও অপরিচ্ছিন্ন 'অহং' বা পরমাত্মা এবং পরিচ্ছিন্ন 'অহং' বা জীবাত্মা মূলতঃ একই আত্মা, তথাপি উভয়ে পার্থক্য আছে। পরমাত্মাতে সংকোচ নাই, কিন্তু তিনি লীলাচ্ছলে সৃষ্টিকালে সংকোচ গ্রহণ করিয়া জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন দেহাদি উপাধি অবলম্বনে তাঁহার 'অহং' ভাবের প্রকাশ হয় বলিয়া তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন প্রমাতা বা জীব বলিয়া গ্রহণ করা হয়। শূন্য হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমগ্র

সৃষ্টির প্রকাশ অবস্থাভেদে এই জীবের নিকটেই হইয়া থাকে। জীবমাত্রেরই সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা থাকে ঃ (১) জাগ্রৎ (২) স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি। এই তিনটি অবস্থার পরস্পর পার্থক্য কি তাহা বলা যাইতেছে। কিন্তু ইহার পূর্বে যে বিষয়টি জানিয়া রাখা আবশ্যক তাহা বেদ্য ও বেদকের সম্বন্ধ। বেদ্য বলিতে বুঝায় জ্ঞেয় এবং বেদকের অর্থ জ্ঞাতা। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় স্বীকার করিলেই উভয়ের সংযোজকরূপে জ্ঞানও স্বীকার করিতে হয়।

সুতরাং এইভাবে আমরা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীর সন্ধান লাভ করিলাম। বলা বাহুল্য, এই জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা স্বয়ং। পূর্বে বলা হইয়াছে পরমাত্মাই স্বাতন্ত্র্যবশতঃ নিজেকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া জীবাত্মার রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জীবাত্মা দেহাদিতে অভিমানশীল। জ্ঞান ও জ্ঞেয়, পরমাত্মারই পরাশক্তির দুইটি রূপে। একটি জ্ঞানশক্তি ও অপরটি ক্রিয়াশক্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মা পরিচ্ছিন্ন 'অহং'রূপে বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কিন্তু জীবাত্মার দেহাদিতে অভিমান বিগলিত হইয়া গেলে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি একাকার হইয়া পরাশক্তিতে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা জ্ঞানের বা যোগের উন্মেষ অবস্থা, সাধারণ অবস্থা নহে।

সাধারণতঃ জ্ঞাতা জীবাত্মার নিকটে যে জ্ঞেয় অর্থের ভান হয়, তাহা স্থির ও অস্থিরভেদে দুই প্রকার। যে অর্থ পরমেশ্বরের পরিকল্পিত তাহা স্থির এবং যাহা জীবাত্মার স্বয়ং পরিকল্পিত তাহা অস্থির। জ্ঞানের সম্বন্ধ জ্ঞেয়রূপ স্থির ও অস্থির উভয়ের সঙ্গেই রহিয়াছে। প্রথমটি জাগ্রৎ অবস্থা ও দ্বিতীয়টি স্বপ্নাবস্থা। প্রথম অবস্থায় যে সত্তা প্রকট হয় তাহার নাম ব্যবহারিক সত্তা। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় প্রকাশমান সত্তা প্রাতিভাসিক। স্বপ্নাবস্থা শব্দে এখানে স্বপ্নজাতীয় সকল অনুভূতিই বুঝিতে হইবে। এই হইল একদিকের কথা। অপরদিকে, জীবাত্মার এমন অবস্থাও আছে যেখানে বেদ্য (জ্ঞেয়) পৃথক্‌ভাবে প্রতিভাসিতই হয় না। ইহাকে সাধারণতঃ লোকে সুষুপ্তি বলিয়া থাকে। মূর্চ্ছা প্রভৃতি ইহারই অন্তর্গত—ইহা মোহের অবস্থা। এই অবস্থায় জ্ঞেয়ের ভান থাকে না বলিয়াই জ্ঞাতা অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তাহার ভান হয় না। জ্ঞাতার ভান হইলে স্বয়ংপ্রকাশ 'অহং' রূপেই হওয়ার কথা। কিন্তু সাধারণ সুষুপ্তিতে তাহা হয় না। এইজন্য অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ অবস্থায় জ্ঞানরূপী আত্মা আদৌ থাকে না। ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'নাস্তিক' বলা হয়। এই মতে 'আমি'-বোধের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রদাদিতে আত্মারও উদয় হয় এবং উহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও তিরোধান হয়। এই দৃষ্টিতে আত্মাও অন্যান্য জাগতিক সত্তার ন্যায় আগম ও

অপায় ধর্মবিশিষ্ট প্রতীত হয়। সুতরাং তাহা নশ্বর পদার্থ,—প্রকৃত আত্মা নহে। সুষুপ্তিতে 'অহং' রূপে জ্ঞাতার ভান না হওয়ার একমাত্র কারণ পূর্বোক্ত মোহের আবরণ। পরমেশ্বরের কৃপায় যখন এই মোহ কাটিয়া যায় তখন এই তথাকথিত সুষুপ্তিই যেন অবস্থান্তররূপে প্রকাশিত হয়। তখন সে অবস্থার নাম তুরীয়। বস্তুতঃ সুষুপ্তি ও তুরীয় এক নহে।

তুরীয় একটি স্বতন্ত্র অবস্থা এবং তাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি হইতে বিলক্ষণ। তুরীয়াবস্থার উদয় হয় পরমেশ্বরের চিদ্‌ভাবের প্রকাশে। কিন্তু পরা চিৎশক্তির উন্মেষ হইলে যে অবস্থা আবির্ভূত হয় তাহাই প্রবুদ্ধতা বা প্রবোধ অর্থাৎ কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ। সুষুপ্তি ও তুরীয় উভয়াবস্থাতেই আত্মা বা চিদাত্মতত্ত্ব বেদ্যবিরহিতভাবে, বিশুদ্ধ বেদকরূপে অবস্থান করে ইহা সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মোহবশতঃ বেদক-আত্মা যখন নিজেকে বেদক বলিয়া চিনিতে পারে না তখন সেই অবস্থার নাম হয় সুষুপ্তি। কিন্তু যখন ভগবৎকৃপায় ঐ মোহ অপসারিত হয় এবং বেদক-আত্মা নিজে বেদক-স্বরূপে স্থিত হয় তখন তাহার নাম হয় তুরীয়। ইহা প্রকাশাত্মক শিবরূপ পারমার্থিক সত্তার অবস্থা। তান্ত্রিক মতে ইহার পরিবর্তে আমরা পাই শুদ্ধবিদ্যার উদয় ও অহন্তার উন্মেষ, যাহার ক্রমবিকাশে পরম শিবরূপ পূর্ণতম পরমার্থিক স্থিতির উদয় হয়।

এই যে শুদ্ধ অহন্তার উন্মেষ ইহাই বাস্তবিকপক্ষে সামান্য স্পন্দের স্ফুরণ। একবার স্ফুরণ হইলে আর কখনও ইহার নিবৃত্তি হয় না। সুষুপ্তি অবস্থা আত্মার স্পন্দহীন অবস্থা। উহা যতই চাঞ্চল্যহীন হউক না কেন, জড়ত্বেরই প্রকারভেদ মাত্র। তুরীয় অবস্থাই বাস্তবিক চৈতন্য অবস্থা। শক্তিপাত হইলে যে কোন স্থান হইতেই বাস্তবিক পক্ষে স্পন্দসাধনার আরম্ভ হইতে পারে।

শুদ্ধ অহন্তার উদয় অর্থাৎ সামান্য স্পন্দের সন্ধান পাইলেও অনেক সময় যোগী ইহা ধরিয়া রাখিতে পারে না। মন যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে লগ্ন না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মনের বহির্মুখ ক্রিয়া চলিতেই থাকে। এইজন্য পুনঃ পুনঃ সামান্য স্পন্দে মনকে লাগাইয়া রাখিতে হয়। মন ঐ স্পন্দে লগ্ন হইলেও একটি ক্ষণের অধিক কাল স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারে না, কারণ ঐ সামান্য স্পন্দ অশুদ্ধ মনকে স্বভাবতঃই বিকর্ষণ করে, যেন ঠেলিয়া দেয়। বিশ্বসৃষ্টি প্রসঙ্গে পূর্বেই যে বিশেষ স্পন্দের কথা বলা হইয়াছে, সেই বিশেষ স্পন্দের দিকেই মন স্বতঃ আকৃষ্ট হয়, এজন্য মন বহির্মুখ হয়। বহির্মুখ হইলেও যোগীর কর্তব্য পুনঃ পুনঃ উহাকে ইদন্তার দিক্ হইতে প্রত্যাহার করিয়া শুদ্ধ অহন্তারূপে সামান্য স্পন্দের দিকে উন্মুখ করা। ইহাই উন্মেষতত্ত্বের রহস্য। তখন মন পূর্ববৎ সামান্য স্পন্দে লগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু উহা পূর্বের ন্যায়

একটি ক্ষণের জন্য স্থিত হইয়া পুনর্বার বহির্মুখ হইয়া পড়ে। এইভাবে পুনঃ পুনঃ চলিতে চলিতে মনও চিদাত্মক হইয়া যায় এবং আত্যন্তিকী বিশুদ্ধি লাভ করে। তখন মন থাকিয়াও না থাকার মত হইয়া পড়ে—সামান্য স্পন্দের সহিত লগ্ন হইয়া সামান্য স্পন্দই হইয়া যায়। ইহাই উন্মনী অবস্থার স্বরূপ।

মন তখন আর বহির্মুখ থাকে না, বিশেষ স্পন্দকে 'ইদং'রূপে ভানও করিতে পারে না। একই সঙ্গে মনের নিবৃত্তি এবং বিষয়ের চিন্ময়তাপ্রাপ্তি সাধিত হয়। তখন এক বিরাট্ 'অহং'-প্রতীতিই অখিল বিশ্বকে গ্রাস করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহারই নাম পূর্ণাহন্তা অর্থাৎ ভগবানের আত্মপ্রকাশ। এই অবস্থাই সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা। প্রবুদ্ধ হইতে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থার প্রাপ্তিই শাক্তের সাধনার লক্ষ্য। শ্রীভগবানের মহাকৃপার প্রথম উন্মেষের ফল প্রবুদ্ধ দশা লাভ এবং তাঁহার চরম অনুগ্রহের ফল সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তি। ইহাই পরমশিবত্ব প্রাপ্তি বা শাক্তমতে জীবন্মুক্তি (যাহা দেহে অবস্থান কালেই হইতে পারে)। মধ্যে যোগীর শুদ্ধমার্গ বিস্তৃত রহিয়াছে, যেখানে অবস্থিত হইয়া চিদণু যেমন শক্তিরূপে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়, তেমনই শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে শিবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। চরম অবস্থায় পূর্ণত্ব লাভ হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মা যেমন শিবরূপী অর্থাৎ বিশ্বাতীত পরমপ্রকাশ, তেমনই উহার সঙ্গে পরাশক্তি অভিন্ন হইয়া গেলে আত্মা বিশ্বাতীত হইয়াও পরিপূর্ণ বিশ্বাত্মক প্রকাশ। কারণ, পূর্ণাবস্থায় শিব ও শক্তি ভিন্ন থাকে না, সামরস্য প্রাপ্ত হয়।

প্রবুদ্ধ হইতে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থায় আসিতে হইলে সর্বদা অবহিত হইয়া যথাসম্ভব প্রতিক্ষণই প্রবুদ্ধ ভাবটিকে রক্ষা করিতে হয়—"প্রবুদ্ধঃ সর্বথা তিষ্ঠেৎ"। প্রবুদ্ধ থাকিতে পারিলে, মহাশক্তির কৃপায় সুপ্রবুদ্ধ স্থিতি অবশ্যম্ভাবী। প্রবুদ্ধ অবস্থার মূলে যে সমাধি কার্য করিয়া থাকে, তাহার নাম 'নিমীলন সমাধি'। 'উন্মীলন সমাধি'র ফলে প্রবুদ্ধ হইতে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত অখণ্ড স্থিতিলাভ ঘটে।

গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরু রহস্য

পূর্বালোচিত জীবের জাগরণ বা প্রবুদ্ধ, সুপ্রবুদ্ধাদি অবস্থা যাঁহার মাধ্যমে ঘটিয়া থাকে, এখন সেই গুরু বা সদ্‌গুরুর তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

গুরুপ্রণামের মন্ত্রে এই শ্লোকটি নিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

—এর সঙ্গে এই শ্লোকটিও পাওয়া যায় এবং উহাও এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

আপাততঃ এই দুইটি শ্লোকের তাৎপর্য এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে—

যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর বিশ্বের ব্যাপক পরমপদকে প্রদর্শন করেন তিনিই গুরু এবং যিনি অজ্ঞানতিমির প্রভাবে অন্ধীভূত শিষ্যের নেত্রকে জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দেন তিনিই গুরু।

এই যে জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের কথা বলা হইল ইহাই অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচরের ব্যাপক পরমপদ দর্শনের একমাত্র উপায়। বস্তুতঃ এই জ্ঞানচক্ষু ও পরমপদ উপায় ও উপেয়রূপে পরিগণিত হইলেও স্বরূপদৃষ্টিতে একই বস্তু। প্রকারান্তরে ঋগ্বেদে একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্রে এই ভাবটি অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

—এই স্থানে বিষ্ণুর পরম পদকে অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরিপূর্ণতম স্থিতিকে ব্যাপক দিব্য চক্ষুর সহিত তুলনা করায় স্বরূপদৃষ্টিতে দিব্যচক্ষু বা জ্ঞানচক্ষু এবং পরমপদের অভিন্নতাই সিদ্ধ হয়।

অনেকে এ প্রশ্নও করিতে পারেন—জ্ঞানচক্ষুটি কি প্রকার? এবং ইহার নিমীলন ও উন্মীলন ব্যাপারের রহস্যই বা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু ইহাই বলা যাইতে পারে যে—যেমন অজ্ঞানচক্ষু আছে, তেমনই জ্ঞানচক্ষুও আছে। অজ্ঞানচক্ষুর দ্বারা যেমন অজ্ঞানের জগৎ ও জগতের যাবতীয় পদার্থ

ভিন্নরূপে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তেমনই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জ্ঞানজগতের সব কিছু অভিন্নরূপে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষু এবং অজ্ঞানচক্ষু উভয়ই বিশ্বপ্রকৃতির দান। যে দুইটির সহিত আমরা পরিচিত তাহাদের নাম অজ্ঞানচক্ষু। অজ্ঞান অবস্থায় এই দুইটি চক্ষু ক্রিয়া করে এবং জ্ঞানচক্ষু নিমীলিত থাকে। জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হইলে সেই-প্রকার জ্ঞানচক্ষু ক্রিয়া করিতে থাকে এবং আমাদের পরিচিত অজ্ঞান চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হইয়া যায়। জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ের অতীত হইয়া উভয়ের অধিকারী হইলে মানুষ 'ত্রিনেত্র' পদে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য হয়।

সাধারণ অবস্থায় অজ্ঞান-চক্ষুর ক্রিয়াশীলতাবশতঃ মানুষ দ্বিনেত্র। নির্বিকল্প সমাধিকালে অথবা যে কোন উপায়ে সম্ভূত জ্ঞানের উন্মেষকালে মানুষ ক্রিয়াশীল জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন এবং একনেত্র বলিয়া অভিহিত হয়। উক্ত অবস্থার তিরোভাব হইলে পুনর্বার অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয় এবং মানুষ দ্বিনেত্র-রূপে ব্যবহার-ভূমিতে সঞ্চরণ করে। জ্ঞানের অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত থাকে বলিয়া শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রাচীন কালে প্রজ্ঞাচক্ষু শব্দে অন্ধকে বুঝাইত। অবস্থার পূর্ণতা সিদ্ধ হইলে জ্ঞানশক্তি ও অজ্ঞানশক্তি উভয়ই নিজের আয়ত্তে থাকে। তখন মনুষ্য ইচ্ছা অথবা প্রয়োজন অনুসারে উভয় শক্তি সমুচ্চিত ভাবে বা বিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারে।

এই জ্ঞানচক্ষুই মহাজন-সমাজে তৃতীয় নেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা খুলিয়া দেওয়া ও জ্ঞান দান করা একই কথা। ইহাই গুরুর কাজ।

মনুষ্য সাধারণ অবস্থায় বিরুদ্ধ শক্তির অধীন থাকে। প্রতি স্তরেই তাহাকে ঐ স্তরের অনুরূপ বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ সহ্য করিতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া, সুখ-দুঃখ বোধ, মান-অপমান বা আপন-পর জ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় দ্বন্দ্বভাব মৌলিক বিরুদ্ধ শক্তি হইতে উদ্ভূত। মানুষের দুইটি চক্ষু বস্তুতঃ বাম ও দক্ষিণ রূপে দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির প্রতীক। চক্ষুর ন্যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও বিরুদ্ধ শক্তির আস্পদ। এই বাম শক্তি ও দক্ষিণ শক্তি পর্যায়ক্রমে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। কালের আবর্তনে ও গুণের আবর্তনেও কখনও বাম প্রধান হয় দক্ষিণ অভিভূত থাকে, আবার কখনও দক্ষিণ প্রধান হয় বাম অভিভূত থাকে। মনুষ্যের দেহে তাহার প্রাণময় ও মনোময় কোষে বিশ্বের যাবতীয় ভুবনাবলীতে এমন কি অণু-পরমাণুর মধ্যেও এই দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির খেলা চলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিরুদ্ধ শক্তি অতিক্রম করিতে না পারিলে শান্তি, প্রেম, সমন্বয়, মৈত্রী প্রভৃতি কোন সদ্‌গুণের বিকাশেরই সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য সর্বত্রই মানুষের বিশেষতঃ যাঁহারা পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য, যে কোন

উপায়েই হউক্ এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করা ও দ্বন্দ্বাতীত হওয়া। এইজন্য দেহকে আশ্রয় করিয়া কর্মপথে প্রবৃত্ত হইলে সর্বপ্রথম এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষ নিবারণই কর্মের উদ্দেশ্যরূপে পরিণত হয়।

ক্রিয়াকৌশলে যখন এই সংঘর্ষের সমন্বয় সম্পন্ন হয় তখন বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয় মধ্য-বিন্দুতে আসিয়া সাম্য অবস্থা লাভ করে। এই যে মধ্য-বিন্দু, ইহা অব্যক্ত। কিন্তু অব্যক্ত হইলেও ইহা যে মধ্যমার্গের মূল আধার তাহাতে সন্দেহ নাই। বিরোধ থাকে না বলিয়াই এই অব্যক্ত ভূমিকেও মধ্য বলিয়া নির্দেশ করা চলে।

যোগিগণ এই মধ্যভূমিতে উভয় শক্তির সাম্যলাভের ফলে এক অচিন্ত্য তেজের উদ্দীপন অনুভব করিয়া থাকেন। কুণ্ডলিনীর জাগরণ বস্তুতঃ এই উদ্দীপনেরই পারিভাষিক নাম মাত্র। ইহাকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ না বলিয়া যদি মধ্যশক্তির বিকাশ বলা হয় তাহা হইলেও কোন প্রকার ক্ষতি হয় না।

বুদ্ধদেব বহুদিন পর্যন্ত গুরূপদেশের অধীন হইয়া এবং তাহার পর স্বয়ং, বাহ্যতঃ অনুপদিষ্ট ভাবে, এই মধ্যশক্তির সাধনাই করিয়াছিলেন। অন্তে ইহার প্রাপ্তি ঘটিলে তাহাকে মধ্যমার্গ (মধ্যমা প্রতিপদা) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই মধ্যমার্গের আবিষ্কার বস্তুতঃ চিদাগ্নির প্রজ্বলন মাত্র। প্রজ্বলিত হইয়া এই অগ্নিশিখা ক্রমশঃ মধ্যপথ অবলম্বনে ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হইতে থাকে। যদিও বাম ও দক্ষিণ এই দুইটি পার্শ্বগত শক্তি অভিভূত হইয়াছে এবং ব্রহ্মপথগামিনী সরল শক্তির ঊর্ধ্বগতি সিদ্ধ হইয়াছে তথাপি সংস্কাররূপে দক্ষিণ ও বামের প্রভাব একেবারে তিরোহিত হয় নাই, এইজন্য মধ্যপথের সরল গতিরও আবর্তভাব তিরোহিত হয় নাই। কারণ, সরল গতিতে বামদিকে অথবা দক্ষিণদিকে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্রিয়া থাকিলে আবর্ত-রচনা অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু প্রজ্বলিত অগ্নির এমনই মহিমা যে যতই ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বেগ বর্দ্ধিত হয় ততই বাম ও দক্ষিণে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ন্যূন হইয়া আসে। চরম অবস্থায় এই বাম ও দক্ষিণের বিরুদ্ধ সংস্কার, সংস্কাররূপেও আর থাকে না, এবং যখন এই সংস্কার ক্ষীণ হইয়া যায় তখন এক হিসাবে অগ্নির ঊর্ধ্বগতিও অবসান প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ ইন্ধন থাকে, ততক্ষণই যেমন আগুন জ্বলে—ইন্ধন না থাকিলে, আগুন যেমন জ্বলিতে পারে না, তেমনি যতক্ষণ বাম ও দক্ষিণের বক্রগতির সংস্কার থাকে ততক্ষণই মধ্যমার্গের ঊর্ধ্বগতির খেলাও চলিতে থাকে। যখন উপশম ঘটে তখন সবগুলি একসঙ্গে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় বিরাট ও বিশাল প্রকাশরূপে ঐ ঊর্ধ্বগতিশীল অগ্নি অর্থাৎ চিদাগ্নি নিজেকে অভিব্যক্ত করে। ইহারই নাম জ্ঞানচক্ষুর বিকাশ এবং ষট্চক্র ভেদের পূর্ণ পরিণতি।

জ্ঞানচক্ষুর অর্থাৎ ব্যাপক জ্ঞানের প্রকাশ হইলে আত্মা স্বভাবতই অনাত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। দেহাত্ম-বোধ তখন থাকে না, শুধু দেহ কেন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি—এমনকি প্রাকৃতিক সত্ত্ব, সর্বত্র হইতে এই আত্ম-বোধ উপসংহৃত হইয়া শান্ত প্রকাশরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই চিদাকাশের প্রকাশ এবং জ্ঞান-নেত্রের উন্মীলন। ইহার পর যে অবস্থার উদয় হয় তাহা ঐ জ্ঞাননেত্রের উপযোগ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে জানিতে হইবে। সদ্‌গুরু নিজশক্তি দ্বারা শিষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য-চৈতন্যকে যাবতীয় প্রাকৃতিক আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই শান্ত স্বরূপে স্থাপন করেন। লৌকিক ভাষাতে যাহাকে কাশী-মৃত্যু বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ এই জ্ঞানের উদয়ে দেহাত্মবোধের উল্লঙ্ঘন মাত্র। ভ্রূমধ্য পর্যন্ত ষট্‌চক্রের বিস্তার। আত্ম-চৈতন্য গুরুকৃপাতে ভ্রূমধ্য ভেদ করিতে পারিলেই, দেহাত্মবোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। ইহার সাক্ষাৎ উপায় পূর্বোক্ত আত্মচৈতন্যরূপ ব্যাপক জ্ঞানের বিকাশ।

এখন প্রশ্ন এই—সদ্‌গুরু ভিন্ন অপর কেহ জীবের আত্ম-চৈতন্যকে এই অখণ্ড প্রকাশরূপ স্থিতিতে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন কি? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্ত না হইলে এই উৎক্রমণ ব্যাপার সম্ভবপর হয় না। সর্বজ্ঞ হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত কর্তৃত্ব লাভ করিয়া ক্রিয়াশক্তিকে আয়ত্ত না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং মুক্ত হইয়াও অন্যের মোচনক্রিয়ার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কথা এই, সদ্‌গুরু দীক্ষা দ্বারা শ্রীভগবানের অনুগ্রহপ্রাপ্ত জীবকে উদ্ধার করিয়া দিলেও জীবন্মুক্তি লাভের জন্য উক্ত জীবের নিজেরও কিছু কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে। কারণ, শ্রীগুরুর কৃপায় দীক্ষারূপ ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে অধিকারিবিশেষে পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও জীবের বুদ্ধিগত অজ্ঞান তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত সে শিবত্ব লাভ করিয়াও নিজেকে শিব বলিয়া চিনিতে পারে না এবং সেইজন্যই জীবন্মুক্তি সাক্ষাৎকাররূপ আনন্দ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। ভোগান্তে দেহপাত হইলে শিবত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ অবশ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলা বাহুল্য, এই ভোগ এই জন্মে পূর্ণ হইতে পারে এবং অবস্থাবিশেষে ঊর্ধ্বলোকে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া এবং সেখানে তদনুরূপ ভোগ প্রাপ্ত হইয়া ঊর্ধ্বদেহের অবসানেও পূর্ণ হইতে পারে।

পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, সদ্‌গুরু তাঁহার অনন্ত করুণার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ণ জ্ঞানশক্তি ও পূর্ণ ক্রিয়াশক্তিপ্রভাবে অনাদিকালের বদ্ধ জীবকে জাগাইয়া দেন এবং তাঁহার জ্ঞানচক্ষুর পটল অপসারণ করিয়া তাহাকে শিবপদে স্থাপিত করেন। অতি উচ্চ অধিকারীর পক্ষে অবশ্য বাহ্য গুরুর প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম।

সুতরাং শিষ্যের পক্ষে নত হইয়া শ্রীগুরুচরণে গুরুর মহিমময় স্বরূপ চিন্তনপূর্বক প্রণতি জ্ঞাপন আবশ্যক এবং এই স্বরূপ-চিন্তনের অন্তর্গতভাবে তাহার পক্ষে ইহাই প্রধানতঃ চিন্তনীয় যে, গুরু নিজ গুণে এবং নিজ শক্তি দ্বারা সংসার-পংক হইতে তাহাকে উদ্ধৃত করিয়া চিদালোকে উদ্ভাসিত মুক্তিপদে স্থাপন করিয়াছেন। অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপক পদ তিনিই প্রদর্শন করেন।

যে গুরু অখণ্ড পদে স্থাপন করিতে পারেন না তিনি গুরুরূপে পরিচিত হইলেও প্রকৃত সদ্‌গুরু নহেন, কারণ, নিরবচ্ছেদ মুক্তিই মুক্তি। অবচ্ছেদবিশিষ্ট গণ্ডীসংযুক্ত মুক্তি পূর্ণ মুক্তি নহে, এবং যিনি পূর্ণ মুক্তি দিতে না পারেন তিনি গুরু হইলেও প্রকৃত গুরু নহেন, কারণ, অবশিষ্ট সূক্ষ্ম বন্ধনের জন্য গুরুর প্রয়োজনীয়তা তখনও থাকিয়া যায়। এইজন্যই অখণ্ডমণ্ডলরূপ পরমপদই গুরুরও প্রদর্শনীয় এবং শিষ্যেরও প্রাপ্য। এই অখণ্ড পদ মায়িক জগৎ, মায়াতীত বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময় এবং অনন্তশক্তিময় মহামায়া জগৎ এবং তাহারও অতীত শক্তিজগৎসমন্বিত অখণ্ডমণ্ডলাকার প্রকাশ। ইহাতে নিষ্কল সত্তা অখণ্ডরূপে ও অনবচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যময় প্রকাশরূপে ভিত্তিস্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে এবং বিভিন্ন কলাময় খণ্ডসত্তা অনন্ত বৈচিত্র্যসম্পন্ন ভুবনরূপে এবং তদন্তর্গত দেহধারী, ইন্দ্রিয়ধারী অন্তঃকরণসম্পন্ন সত্তারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হইলে অখণ্ডরূপে এই অদ্বৈত সত্তা দ্রষ্টার সহিত অভিন্ন-ভাবে খুলিয়া যায়। যিনি নিজ মহিমায় এবং অপার করুণায় এই অখণ্ড সত্তার সহিত অভেদ উপলব্ধির দ্বার খুলিয়াছেন তিনিই গুরু, তিনিই নমস্য।

বলা হইয়াছে, গুরুর কার্য শুধু প্রদর্শন, ইহা খুবই সত্য, কারণ একদিকে যে শক্তি প্রদর্শন করে, অপর দিকে সেই শক্তিই দর্শন করিয়া থাকে, কারণ অদ্বৈত ভূমিতে প্রদর্শন ও দর্শন অর্থাৎ দেখান ও দেখা একই ব্যাপার। গুরু দেখাইয়া দেন, শিষ্য-আত্মা সাক্ষাৎ ভাবে দেখিয়া থাকে। ইহা অভিন্ন এবং অবিভক্ত ব্যাপার। বুদ্ধির নিকট বিশ্লিষ্টরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। শুধু ইহাই নহে—গুরুর দেখান, শিষ্যের দেখা এবং অন্তে হইয়া যাওয়া, একই অখণ্ড স্বপ্রকাশ চিদ্‌উজ্জ্বল মহাসত্তার তিনটি দিক্ মাত্র। কারণ, আত্মা অভেদে যা দেখে নিজেও তাহাই হয়। অথবা সে যাহা হইয়া আছে সে তাহাই দেখিয়া থাকে। দ্বিতীয় বলিয়া কোন পদার্থ নাই।

দুই

'সদ্গুরু' শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে নানাস্থানে নানাপ্রসঙ্গের উপলব্ধ হয়। বহু স্থানে যে 'গুরু' ও 'সদ্গুরু' শব্দের প্রয়োগ অভিন্নার্থে হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন কোন স্থানে 'সৎ' এই পূর্বনিবিষ্ট বিশেষণের দ্বারা অসদ্গুরু হইতে গুরুবিশেষের বৈলক্ষণ্য দ্যোতন করা হয়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এইসব স্থলে সদ্গুরু বলিতে কি বোঝায় এবং প্রসঙ্গতঃ অসদ্গুরু কে—তাহারও আলোচনা আবশ্যক। এই বিষয়ে শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য কি তাহা জানিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা জাগে। কিন্তু এই জিজ্ঞাসানিবৃত্তিও শাস্ত্রাশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায়ে সম্ভবপর নহে। 'মালিনীবিজয়ে' আছে—

* * * স যিযাসুঃ শিবেচ্ছয়া।
ভুক্তিমুক্তিপ্রসিদ্ধ্যর্থং নীয়তে সদ্গুরুং প্রতি ॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সদ্গুরুর আশ্রয় না পাইলে জীব একসঙ্গে অভিন্নভাবে ভোগ ও মোক্ষ উভয় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ পূর্ণত্বলাভ করিতে পারে না।[১] সদ্গুরুপ্রাপ্তির মূলে যে ভগবদিচ্ছাই মুখ্য কারণ এবং জীবের ইচ্ছা ঐ মূল ইচ্ছারই অনুগামিনী, তাহা "যিযাসুঃ শিবেচ্ছয়া" এই

১ ভোগ ও মোক্ষের সাম্যাবস্থাই জীবন্মুক্তি। ভোক্তা যখন ভোগ্যের সহিত একীভূত হয়, তখন সেই একীভাবকে 'ভোগ' বলে, 'মোক্ষ'ও বলে। প্রবোধপঞ্চদশিকাতে আছে—"তস্যা ভোক্তা স্বতন্ত্রায়া ভোগ্যৈকীকার এষ যঃ। স এব ভোগঃ সা মুক্তিঃ স এব পরমং পদম্ ॥" বস্তুতঃ ভোগ ও মোক্ষের অনুভূতির সামরস্যই জীবন্মুক্তি। মহেশ্বরানন্দের মতে (মঃ মঞ্জরী পৃঃ ১০৭) ইহাই ত্রিকদর্শনের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরুদ্রদেবে আছে—'ভুক্তির্বাপ্যথ মুক্তিশ্চ নান্যত্রৈকা পদার্থতঃ। ভুক্তিমুক্তী উভে দেবি বিশেষে পরিকীর্ত্তিতে ॥' এই অবস্থা—আপনার বিশ্বাত্মকতা—'সর্বো মমায়ং বিভবঃ' এইরূপে অনুভূত হয়। এই বিশ্বাত্মকতা আত্মার স্বভাব, আহার্য বা আগন্তুক ধর্ম নহে।

এই যে ভোগ ও মোক্ষের ঐক্য, ইহা বৌদ্ধগণও জানিতেন। সহজিয়াগণ বলেন যে বায়ুর গমনপথ রোধ করিয়া, চন্দ্রসূর্যের মার্গ নিরুদ্ধ করিয়া সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মনঃ বা বোধিচিত্তকে দীপ করিতে পারিলে 'মহাসুখ' প্রকাশমান হয়। তখন সেই জিনরত্ন বা বরগগন নামক অধ-উর্ধ্ব পদ্মকে অবধূতী স্পর্শ করে, যাহার ফলে ভব ও নির্বাণ উভয়ই একসঙ্গে সিদ্ধ হয়। ভবভোগ = পাঁচ প্রকার কামগুণ ; নির্বাণ = মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার ॥

বাক্যাংশ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তবে মনে রাখিতে হইবে অসদ্‌গুরু প্রাপ্তির মূলে যে একই ভগবদিচ্ছা কার্য করিয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। ইহার বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। যিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন নাই, এমন তত্ত্বমাত্রের উপদেষ্ট আচার্যবিশেষকে 'অসদ্‌গুরু' বলে। যে সকল সাধকের চিত্ত এই জাতী আচার্যের প্রতি গাঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন, তাহারা আগমশাস্ত্রোপদিষ্ট পরামুক্তি লাভ করিতে পারে না, এমন কি মায়ারাজ্য অতিক্রম করিতেও সমর্থ হয় না। তাহার যে মুক্তি লাভ করে, তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে—প্রলয়কৈবল্যের ন্যায় একটি অর্ধজড় অবস্থামাত্র। প্রকৃত মুক্তিতে পশুত্বের নিবৃত্তি হইয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় কিন্তু এই সব সাধকদের ঐ অবস্থাতেও পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না।[২] ইহার মায়াপাশ অথবা শ্রীভগবানের বামা নাম্নী শক্তি দ্বারা রঞ্জিত থাকে বলিয়াই ইহাদের 'অসদ্‌গুরু'তে অনুরাগ ও বিশ্বাস গাঢ়ভাবে উদিত হয়।

কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ যে সদ্‌গুরু লাভ করিতে না পারে, এমন কোন কথা নাই। ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্ত শক্তিপাত-পবিত্রিত সাধক যখন আপনা স্বরূপলাভের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন জ্যেষ্ঠা শক্তি নাম্নী ভগবদিচ্ছার প্রেরণা তাহার চিত্তে সদ্‌গুরুপ্রাপ্তির জন্য শুভ ইচ্ছা জাগিয়া উঠে।[৩] এই ইচ্ছ শুদ্ধবিদ্যার বিকাশ এবং 'সৎতর্ক' নামে প্রসিদ্ধ।

অসদ্‌গুরুই হউক্‌ বা সদ্‌গুরুই হউক্‌ উভয়ত্রই প্রবৃত্তির মূলে ভগবদিচ্ছা আসল কথা এই—শক্তিপাতের প্রবৃত্তি ক্রমিক। তাই কেহ কেহ অসদ্‌গুরু অপূর্ণত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রের আশ্রয় করিয়া পরে সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হয়

২ যাহা আগমসম্মত পরামুক্তি তাহাই পূর্ণত্ব। আগমমতে সাংখ্যের কৈবল্য পূর্ণ নহে, বেদান্তের মুক্তিও পূর্ণত্ব নহে। দ্বৈত ও অদ্বৈত দ্বিবিধ আগমেই ইহা সমর্থিত হয় জয়রথ বলেন, (তন্ত্রালোকটীকা ৪।৩১), বেদান্তমুক্তি সবেদ্য প্রলয়াকল অবস্থার ন্যায় তিনি এই মুক্তিকে বিজ্ঞান-কৈবল্যবৎ বলিয়াও স্বীকার করেন না। ইহা হইতে মনে হ তাঁহার মতে এই অবস্থায় (বেদান্তের মোক্ষে) আণবমল সম্পূর্ণই বজায় থাকে ধ্বংসোন্মুখও হয় না। বিজ্ঞানকৈবল্যে কিন্তু আণবমল অন্ততঃ ধ্বংসোন্মুখ হয়ই—অব একেবারে ধ্বস্তও হইতে পারে। বিজ্ঞানকেবলীর কর্ম নাই বলিয়া পুনরাবৃত্তি হয় না- আণবমল ধ্বংসোন্মুখ বলিয়া উহা হইতে কর্মও জন্মাইতে পারে না। কিন্তু কেহ বে বেদান্তমোক্ষ বিজ্ঞানকৈবল্যবৎ মনে করেন। বৈষ্ণবাদির মোক্ষ ঐ মতে প্রলয়াকলের ন্যায় এই অবস্থায় দীর্ঘকাল মোহাদিরূপ ভোগ হয়। পরে জন্ম হয় (নতুন সৃষ্টিতে) ন্যায়াদির অপবর্গ আত্মার সর্ববিশেষগুণোচ্ছেদ বলিয়া অপবেদ্য প্রলয়াকলসদৃশ।

৩ ভগবানের কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হয়—ইহা সর্বত্র স্বীকৃত।

আবার কেহ কেহ প্রথমেই সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়া থাকে। শক্তিপাতের বিচিত্রতাবশতঃই গুরু ও শাস্ত্রগত সদসৎ ভাবের বিচিত্রতা ঘটিয়া থাকে। পূর্ণসত্যের প্রতিপাদক শাস্ত্র ও গুরুই সৎশাস্ত্র ও সদ্‌গুরু। যাহা বাস্তবিক মোক্ষ নহে, তাহাকেও যে মোক্ষ বলিয়া মনে হয় এবং মোক্ষ মনে করিয়া তাহাকেই পাওয়ার যে স্পৃহা জন্মে, মায়াই তাহার একমাত্র কারণ। মায়াপিশাচীই এইপ্রকারে জীবকে নিরন্তর নানাদিকে ঘুরাইয়া কষ্ট দেয়, কিন্তু মায়ার পিছনে ভগবানের করুণাও জাগিয়া থাকে। তাই সাধকের চিত্ত দৃঢ় সংস্কারবশতঃ ঐ জাতীয় শাস্ত্র ও গুরুতে আস্থাসম্পন্ন হইলেও ভগবৎকৃপায় উহাতে 'সৎতর্ক' বা পরামর্শজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে। তখন কোন্‌টি সার, কোন্‌টি অসার তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। এইভাবে শুদ্ধবিদ্যার প্রভাবে—জ্যেষ্ঠাশক্তির অধিষ্ঠানবশতঃ—পবিত্রতা লাভ হয় ও নির্বিঘ্নে সৎপথের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে সামর্থ্য জন্মে।

তিন

'সৎতর্ক' বা শুদ্ধবিদ্যার উদয় কি প্রকারে হয়? কিরণাগমের মতে কাহারও 'সৎতর্ক' গুরুর উপদেশ হইতে জন্মে, কাহারও বা শাস্ত্র হইতে জন্মে। কিন্তু এমন উত্তম সাধকও আছেন, যাঁহার 'সৎতর্ক' গুরুর উপদেশ বা শাস্ত্রাদির অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি (স্বতঃ) উদিত হয়। ইঁহার বস্তুবিষয়ক সুনিশ্চিত জ্ঞান আপনা হইতেই (স্বতঃ) উৎপন্ন হয়—তাহা গুরু প্রভৃতির অধীন নহে।[৪] এই জ্ঞানও যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনিই এই প্রকার তত্ত্বনিষ্ঠ সাধকও স্বভাবসিদ্ধ (সাংসিদ্ধিক)। তবে এই জ্ঞান নিতান্তই যে নিমিত্তহীন তাহাও নহে, কারণ ভগবানের শক্তিপাত প্রভৃতি অদৃষ্ট নিমিত্ত অবশ্যই আছে। তবে লৌকিক নিমিত্ত নাই, ইহা সত্য।

পরামর্শোদয়ের পূর্বনির্দিষ্ট কারণপরম্পরার মধ্যে গুরু হইতে শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, এবং শাস্ত্র হইতে স্বভাব শ্রেষ্ঠ। কারণ, গুরু যেমন শাস্ত্রাধিগমের উপায়স্বরূপ,

৪ ত্রিপুরারহস্যে আছে :

'উত্তমানাং তু বিজ্ঞানং গুরুশাস্ত্রানপেক্ষণম্'। বামদেব, কর্কটিকা এবং অন্যান্য অকৃতশ্রবণ ব্যক্তির জ্ঞান এইপ্রকার সাংসিদ্ধিক ছিল বলিয়া জানা যায়। আত্মার স্বরূপে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই ভেদ নাই, ইহা পরমুক্ত রূপ, সংকল্প-বিকল্পহীন, মোহহীন। ইহা নিত্যসিদ্ধ হইলেও জীব ইহা জানে না। ইহার উপলক্ষণ বা পরিচয় নাই। গুরু ও শাস্ত্র পরিচয় করাইয়া দেন। কাহারও কাহারও পরিচয় আপনিই হইয়া যায়।

তদ্রূপ শাস্ত্র স্বভাবপ্রাপ্তির দ্বারভূত। সেইজন্য গুরু ও শাস্ত্রের কারণতা গৌণ, মুখ্য নহে। স্বভাবই মুখ্য কারণ।[৫]

চার

যাহার 'সৎতর্ক' স্বভাবতঃ (স্বতঃ) উদিত হয়, তাহার অধিকারে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি নাই। তাহার বাহ্যদীক্ষা ও বাহ্য অভিষেকের আবশ্যকতা থাকে না। সে নিজের সংবিত্তিদেবীগণের দ্বারাই দীক্ষিত হয় ও অভিষিক্ত হয়। তাহার স্বীয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইয়া প্রমাতার সঙ্গে —তাহার স্বাত্মার সঙ্গে—ঐক্য ফুটাইয়া তোলে। ইহারাই দ্যোতনকারিণী সংবিদ্ দেবী। ইহারা তাহার জ্ঞানক্রিয়াখ্য প্রসুপ্ত চৈতন্যকে উত্তেজিত করে। ইহাই 'দীক্ষা'। যে ক্রিয়ার ফলে সে সর্বত্র স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, তাহা 'অভিষেক'। বহির্মুখ চিত্তের বৃত্তিসকলই অন্তর্মুখাবস্থায় শক্তি নামে কীর্তিত হয়।

এইরূপ সাধক সকল আচার্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সে বিদ্যমান থাকিতে অন্য কেহ পরানুগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে অধিকারী হয় না। সাধারণ সাধক গুরু হইতে শাস্ত্ররহস্য অবগত হয়। কিন্তু যাহার জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ, সে 'সৎতর্ক' হইতে সমস্ত শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারে, বাহ্য গুরুর সাহায্য লওয়া তাহার পক্ষে আবশ্যক হয় না। এমন কোন সত্যই নাই এবং থাকিতে পারে না—যাহা শুদ্ধবিদ্যার আলোকে প্রকাশিত হইতে পারে না। এইজন্য এইপ্রকার সাধক লৌকিক কোন নিমিত্ত অবলম্বন না করিয়া সমস্ত শাস্ত্রেই নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই প্রাতিভ মহাজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

এই যে স্বভাবজাত মহাজ্ঞানের কথা বলা হইল, ইহা বস্তুতঃ এক হইলেও উপাধিভেদে অর্থাৎ ভিত্তি ও তদংশের ভেদবশতঃ নানাপ্রকার হইতে পারে। যাহাকে আশ্রয় করিয়া (উপজীব্য) জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকে ঐ জ্ঞানের ভিত্তি বলে। ইহা নিজের বিমর্শ ও পরকৃত তত্তৎ কর্মের অভিধায়ক শাস্ত্র ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে। স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান কাহাকেও আশ্রয় করিয়া উদিত হয় না

৫ যোগবাশিষ্ঠে আছে ঃ

'শিষ্যপ্রজ্ঞৈব বোধস্য কারণম্ গুরুবাক্যতঃ'। (নির্বাণপ্রকরণ ১।১২৮।১৬৩)

অর্থাৎ গুরুবাক্য হইতে যে বোধ জন্মে, শিষ্যের প্রজ্ঞাই তাহার কারণ। সুতরাং স্বপরামর্শই যে গুরু শাস্ত্রজ জ্ঞানস্থলেও প্রধান, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলিয়া যে ভিত্তিহীন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু ইহা কোন কোন স্থলে ভিত্তিবিশিষ্টও হইতে পারে। কি ভাবে ইহা হয় তাহা বলা যাইতেছে।

যাঁহার স্বতঃই সৎতর্কের উদয় হয়, তাঁহার সকল বন্ধন শিথিল হইয়া পূর্ণ শিবভাবের আবির্ভাব হয়। তাঁহাকে সাংসিদ্ধিক গুরু বলিয়া বর্ণনা করা চলে। তাঁহার নিজের বিষয়ে কিছু করণীয় থাকে না, কারণ, তিনি স্বাত্মাতে কৃতকৃত্য ; তাই পরের অনুগ্রহই তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন।

"স্বং কর্তব্যং কিমপি কলয়ঁল্লোক এষ প্রযত্নাৎ
নো পারক্যং প্রতি ঘটয়তে কাঞ্চন স্বাত্মবৃত্তিম্।
যস্তু ধ্বস্তাখিলভবমলো ভৈরবীভাবপূর্ণঃ
কৃত্যং তস্য স্ফুটমিদমিয়ল্লোককর্তব্যমাত্রম্ ॥"

যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এইপ্রকার সাংসিদ্ধিক গুরু সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই বলা চলে—"তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনম্।" এই পরানুগ্রহ অনুগ্রাহ্যজনের যোগ্যতার তারতম্যবশতঃ বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। যে শিষ্য নির্মল সংবিদ্‌বিশিষ্ট বা শুদ্ধচিত্ত, তাহাকে অনুগ্রহ করিবার সময় ইঁহাকে কোন উপকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। শুধু নিষ্কাম বা অনুসন্ধানহীন দৃষ্টি দ্বারাই ইনি ঐ প্রকার অনুগ্রহার্থী যোগ্য শিষ্যকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। নিজ বোধরূপ স্ব-শক্তির সঞ্চার দ্বারা শিষ্যকে নিজের সহিত সমভাবাপন্ন করাই অনুগ্রহের লক্ষণ।

'তং যে পশ্যন্তি তাদ্রূপ্যক্রমেণামলসংবিদঃ।
তেঽপি তদ্রূপিণস্তাবত্যেবাস্যানুগ্রহাত্মতা ॥'

এইপ্রকার নিষ্কাম শিষ্যের অনুগ্রহব্যাপারে কোন উপকরণের আবশ্যকতা হয় না। ইহা নির্ভিত্তিক জ্ঞানের উদাহরণ।

কিন্তু অনুগ্রাহ্য শিষ্য তাদৃশ নির্মলসংবিদ্‌বিশিষ্ট না হইলে উপকরণের আবশ্যকতা হয়। অর্থাৎ ঐস্থলে সাংসিদ্ধিক গুরুতে 'ইহাকে আমি এইপ্রকার অনুগ্রহ করিব, এইপ্রকার অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন জন্মে। কাজেই তখন বাহ্য সকল উপকরণেরই প্রয়োজন থাকে এবং শাস্ত্রীয় মর্যাদার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাই গুরু পরমেশ্বররূপী হইলেও উপায়ভূত শাস্ত্রাদির শ্রবণ ও অধ্যয়ন বিষয়ে আদর প্রদর্শন করেন। অশুদ্ধচিত্ত অনুগ্রাহ্যগণ নানাপ্রকার বলিয়া তাহাদের বিভিন্ন মানসিক প্রকৃতি অনুসারে আবশ্যক উপকরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই স্থলে যে সকল শাস্ত্রে ঐ উপকরণাদির বর্ণনা আছে, তাহাদেরও আবশ্যকতা থাকে। নতুবা পরানুগ্রহ করা যায় না। মনুষ্যের চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া শাস্ত্র বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। যেমন রোগ বিভিন্ন হইলে ঔষধের ভেদ হয়, ইহা তদ্রূপ—

যথৈকং ভেষজং জ্ঞাত্বা ন সর্বত্র ভিষজ্যতি।
তথৈকং হেতুমালম্ব্য ন সর্বত্র গুরুর্ভবেৎ ॥

অর্থাৎ যেমন কোনও ব্যক্তি একটিমাত্র ঔষধের জ্ঞান লাভ করিয়া সকলপ্রকার রোগের চিকিৎসক হইতে পারে না, সেইপ্রকার কোনও একটি বিশিষ্ট হেতু অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। সেইজন্য ভিত্তিকে সর্বগত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কেহ কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্রানুসারে তদুচিত অনুগ্রাহ্যগণকে কৃপা করেন। এইস্থলে ভিত্তি অংশগত, শুধু ইহাই নহে, তত্তৎ শাস্ত্রাত্মক অংশসকলেরও মুখ্য ও অমুখ্যরূপ ভেদ আছে—যেমন বেদ ও আগম অথবা বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ। আবার আগম-মধ্যেও বাম, দক্ষিণ, কৌল, ত্রিক ইত্যাদি। কেহ যেন মনে না করেন যে, এইপ্রকার শাস্ত্রীয় মর্যাদা রক্ষা করা হয় বলিয়া গুরু স্বভাবসিদ্ধ প্রাতিভজ্ঞান-বিশিষ্ট নহেন। বস্তুতঃ গুরুর নিজের জন্য কিছুই কর্তব্য নাই বলিয়া তাঁহার স্বার্থসম্পাদনের জন্য কিছুরই আবশ্যকতা নাই। এইগুলি অন্যের জন্য অপেক্ষিত হয়।

ইহা হইতে প্রতীত হইবে যে, গুরু স্বয়ং স্বতন্ত্র ও সাংসিদ্ধিক পরামর্শ-বিশিষ্ট হইলেও তাঁহার অনুগ্রহ-প্রদর্শন শিষ্যের অধিকার অনুসারে নানাপ্রকার হইয়া থাকে। অনুগ্রাহ্য শিষ্য নির্মলচিত্ত হইলে তাঁহার অনুগ্রহ নিরুপায় হয়, অন্যত্র সোপায়।[৬] এই সাংসিদ্ধিক গুরুই 'অকল্পিত' গুরু। তিনি নিজে অন্য আচার্যসাহায্যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া তাঁহাকে 'অকল্পিত' বলা হয়।[৭] এইপ্রকার গুরু সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এই—

৬ বোধিচিত্তবিবরণে আছে—'দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগা' ইত্যাদি।

বৌদ্ধগণও বলেন যে, গুরুগণের যে পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ তাহা শিষ্যবর্গের যোগ্যতাদি অধিকারভেদ নিবন্ধন। তবে আপাতদৃষ্টিতে উপদেশে পার্থক্য প্রতীত হইলেও সকল সদগুরুরই মূল উপদেশ একই।

৭ প্রাতিভজ্ঞান অকৃত্রিম, অকল্পিত গুরুও অকৃত্রিম। কেহ কেহ গুরু প্রভৃতির আশ্রয় না লইয়াও পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা তন্ত্রসম্মত। ইহা যদি তীব্রতীব্র শক্তিপাতের ফলে হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে শিবত্ব-লাভ হয়—দেহ থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে। থাকিলেও উহা শিব-দেহ। উহার প্রারব্ধ থাকে না। ইহা স্বচ্ছন্দাবস্থা। যদি ইহা মধ্যতীব্র শক্তিপাতের ফলে হয়, তাহা হইলে প্রাতিভজ্ঞানের উদয় হয়—বাহ্যগুরুর প্রয়োজন হয় না। বৌদ্ধ ধর্মেও কতকটা এইভাবের অঙ্গীকার আছে। শ্রাবক হইতে প্রত্যেকবুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি 'অনাচার্যক'—ভিতর হইতে জ্ঞান পান, গুরু-নিরপেক্ষ। শ্রাবক বাহ্যগুরুসাপেক্ষ জ্ঞানশালী। ইহাও কিন্তু অকল্পিত গুরুর ঠিক

অদৃষ্টমণ্ডলোঽপ্যেবং যঃ কশ্চিৎ বেত্তি তত্ত্বতঃ।
স সিদ্ধিভাগ্ ভবেন্নিত্যং স যোগী স চ দীক্ষিতঃ॥
এবং যো বেত্তি তত্ত্বেন তস্য নির্বাণগামিনী।
দীক্ষা ভবেদিতি প্রোক্তং তচ্ছ্রীত্রিংশকশাসনে॥

পাঁচ

আমরা অকল্পিত গুরুর কথা বলিয়াছি। যিনি সাংসিদ্ধিক হইয়াও স্বয়মুদ্ভূত জ্ঞানের পূর্ণতার অভাববশতঃ গুরু প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া 'আমিই পরমহংস' ইত্যাদি প্রকারে শুধু নিজের ভাবনাবলে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন, তিনি 'অকল্পিতকল্পক'। তাঁহার জ্ঞান সাংসিদ্ধিক বলিয়া অকল্পিত এবং আত্মভাবনাবলে শাস্ত্রবেদনক্রমে কল্পিত—তাই এইপ্রকার নাম। শক্তিপাতরূপ উপায়ের তীব্রতাদিভেদবশতঃ এই গুরু নানাপ্রকার হইয়া থাকে।

ইঁহার স্বয়ং-প্রবৃত্ত জ্ঞানের পূর্ণতা শুধু যে আত্মভাবনারূপ নিমিত্ত দ্বারাই হয়, এমন নহে, ধ্যান, জপ, স্বপ্ন, ব্রত হোম প্রভৃতি অন্যান্য নিমিত্ত দ্বারাও হইতে পারে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের প্রভাবে এই মহাজ্ঞানী অকৃত্রিম (অকল্পিত) মহান্ অভিষেক প্রাপ্ত হয়—শাস্ত্রজ্ঞানাদিতে অধিকার লাভ করে। এই অভিষেক গুরু প্রভৃতির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না।

ইহা ব্যতীত 'কল্পিত' ও 'কল্পিতাকল্পিত' গুরুও আছেন। যাঁহার সৎতর্ক আপনা-আপনি উদিত হয় না, তাঁহার পক্ষে অকল্পিত অথবা অন্য কোন গুরুকে যথাবিধি ও ভক্তিসহকারে শুশ্রূষাদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া শাস্ত্রসম্মত ক্রম অনুসরণপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষাযোগে শাস্ত্রার্থ জ্ঞান লাভ করার ব্যবস্থা আছে। এইভাবে গুর্বারাধনক্রমে তাঁহার শুদ্ধবিদ্যা উদিত হইতে পারে। তিনি পরে অভিষেকপ্রাপ্ত হইয়া পরানুগ্রহাদিব্যাপারে অধিকার লাভ করেন। তাঁহাকে কল্পিত গুরু বলে। কিন্তু কল্পিত অর্থাৎ আচার্যশক্তির দ্বারা নিষ্পাদিত হইলেও ইনি সকল পাশকে নিঃশেষে নষ্ট করিতে সমর্থ হন।

কেহ কেহ কল্পিত হইলেও গুরু প্রভৃতিকে অপেক্ষা না করিয়াই স্বীয় প্রতিভাবলে লোকোত্তর শাস্ত্রীয় তত্ত্বসম্বন্ধে আকস্মিকভাবে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন ও সকল রহস্য বুঝিতে পারেন। ইনি কল্পিত হইলেও ইঁহার বোধ

ঠিক সাদৃশ নহে। কারণ, প্রত্যেকবুদ্ধ হেতুপ্রত্যয় বিচারের দ্বারা নিজের পরিনির্বাণ চান। অকল্পিত গুরু অনেক উচ্চ। তবে মহাযান সাধক কতকটা অকল্পিতবৎ। ঐ সাধক সর্বজ্ঞ ও সর্বসামর্থ্য চায় সর্বজীবের মুক্তিসাধনের জন্য।

স্বতঃপ্রবৃত্ত বলিয়া ইনি অকল্পিত। এই গুরুকে 'কল্পিতাকল্পিত' নামে অভিহিত করা যায়। ইঁহার কল্পিতাংশ অপেক্ষা অকল্পিতভাগই শ্রেষ্ঠ।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, চারিপ্রকার গুরুই মূলে কল্পিত ও অকল্পিত এই দুইপ্রকার ভেদের পরস্পর মিশ্রণজন্য অবান্তর বিভাগ-মাত্র। ফলতঃ কল্পিত ও অকল্পিত গুরুতেও কোন প্রভেদ নাই—কল্পিত গুরুও শিষ্যের পাশচ্ছেদনপূর্বক শিবত্বের অভিব্যক্তি করিতে সমর্থ। কারণ, স্বয়ং পরমেশ্বরই আচার্যদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবের বন্ধনমোচন করিয়া থাকেন—নতুবা এক জীব অন্য জীবকে উদ্ধার করিতে পারে না। শাস্ত্রে আছে—

যস্মান্ মহেশ্বরঃ সাক্ষাৎ কৃত্বা মানুষবিগ্রহম্।
কৃপয়া গুরুরূপেন মগ্নাঃ প্রোদ্ধরতি প্রজাঃ॥

অর্থাৎ স্বয়ং পরমেশ্বর মানবমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কৃপাপূর্বক গুরুরূপে (মায়া) মগ্ন জীবসকলকে উদ্ধার করেন।

এখানে আমরা মনুষ্যগুরুর কথা বলিতেছি। বস্তুতঃ সিদ্ধগুরু ও দিব্যগুরুও আছেন। মূলে কিন্তু সর্বত্র পরমেশ্বরই একমাত্র অনুগ্রাহক। তিনি ভিন্ন আর কেহ অনুগ্রহ করিতে পারেন না। তবে যে গুরুর প্রকারভেদ করা হইয়াছে তাহার কারণ আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির প্রণালী-ভেদমূলক যে কোন উপায়ে হউক্ অথবা বিনা উপায়েই হউক্—জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই তাহার কার্য হইবেই। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করাও যাহা, জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করাও তাহাই—যেভাবেই অগ্নি জ্বলুক, দাহিকাশক্তি উভয়ে সমানই থাকে। অবশ্য দুই অগ্নিতে কিছু পার্থক্যও থাকে। সেইজন্য ফল ও সামর্থ্যগত অভেদসত্ত্বেও অকল্পিত গুরুকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। নিত্যসিদ্ধ পরমশিব ও যিনি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শিবত্বলাভ করেন, এই উভয়ের মধ্যে সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম সমান থাকিলেও যেমন পরমশিবের উৎকর্ষ অধিক মানিতে হয়, অকল্পিত গুরুর মহিমাও তদ্রূপ অধিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ অকল্পিত গুরুর সম্মুখে কল্পিতাদি গুরু হয় চুপ করিয়া নিষ্ক্রিয় থাকেন, নতুবা তাঁহার অনুবর্তন করেন।

অতএব সদ্‌গুরু বলিতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর অথবা তাঁহার অনুগ্রহপ্রাপ্ত তৎসাধর্ম্যাপন্ন জীবন্মুক্ত অধিকারী পুরুষ বুঝিতে হইবে। এই অধিকারী দেবতা, সিদ্ধ ও মনুষ্য—তিনই হইতে পারেন।

প্রশ্ন হইতে পারেঃ অসদ্‌গুরুতে গুরুত্ব কোথায়? গুরু শব্দের বাস্তবিক অর্থ গ্রহণ করিলে এইপ্রকার শংকা হইতে পারে। 'গুরু' শব্দের অর্থ

সংকুচিত ভাবে লইলে বলা যায় যে মায়া হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলেও যিনি ঊর্ধ্বলোকের ভোগৈশ্চর্য ও অজরত্ব, অমরত্ব প্রভৃতি পরিমিত সিদ্ধি দিতে পারেন তাঁহাকেও ব্যবহারদৃষ্টিতে 'গুরু' বলা যাইতে পারে। মায়িক জগতেও ভিন্ন ভিন্ন ঊর্ধ্বস্তরসমূহে আনন্দ ও ভোগ্যের ন্যূনতা নাই। পৃথিবীতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কলাতত্ত্ব পর্যন্ত প্রতি তত্ত্বেই ভোগ্যবিষয় ও ভোগোপকরণ-সমন্বিত নানা ভুবন আছে। ঐ সকল ভুবনেও গুরু আছেন। তাহা ছাড়া ভুবনেশ্বরগণও জ্ঞানসম্পন্ন অধিকারী পুরুষ। যোগী সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবার পূর্বে এমন সামর্থ্য লাভ করেন, যাহা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে, যে তত্ত্বে সে আছে, সেখান হইতে উঠাইয়া অন্য অভিলষিত তত্ত্বে এবং ঐ তত্ত্বস্থ ভুবন-বিশেষে ঐ স্থানের ঐশ্বর্যভোগের জন্য নিয়োজিত করিতে পারেন। ইহার জন্য দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। তত্তদ্ ভুবনেশ্বরের আরাধনা দ্বারাও অবশ্য ঐ সকল ভুবনে যাওয়া ও থাকা যায়।[৮] ঐসব ভোগলোক। ঐস্থান হইতে ভোগান্তে পতন অবশ্যম্ভাবী, তবে ওখানে যদি সদ্‌গুরু লাভ করিয়া পথ পাওয়া যায় তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। এইসব গুরু শুধু ভোগপ্রদ। ইঁহারা দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন না। তাই মায়া পার করাইতে পারেন না। ইঁহারাই পূর্বোক্ত অসদ্‌গুরু।

আবার এমন গুরু আছেন যিনি জ্ঞান দিতে পারেন, কিন্তু ভোগ বা বিজ্ঞান দিতে পারেন না। জ্ঞান দিয়া তিনি মায়া হইতে মুক্ত করিয়া দেন, কিন্তু বিজ্ঞানের অভাবে জ্ঞানী অধিকার লাভ করিতে পারেন না। তিনি নিজে মুক্ত হন কিন্তু অন্যকে মুক্ত করিতে পারেন না, তাই পরোপকার করিতে সমর্থ হন না। এই গুরু জ্ঞানী গুরু, তিনি যোগী নহেন। প্রকৃত সদ্‌গুরু ইনিও নহেন। যিনি সিদ্ধ যোগী বলিয়া একাধারে যোগী ও জ্ঞানী উভয়াত্মক, তিনিই সদ্‌গুরু। তিনি বিজ্ঞান দান করেন বলিয়া শিষ্যের ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই বিধান করিতে পারেন। পূর্ণত্বলাভ তাঁহার কৃপাতেই হইতে পারে।

'ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং' বলিয়া যে সদ্‌গুরুর নমস্কার করা হয় এবং যাঁহাকে গুরুপ্রণামে 'তৎ' পদের প্রদর্শক বলিয়া ও জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা অজ্ঞান-তিমিরান্ধের জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচক বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাঁহারা উভয়ই এক। সাধারণতঃ গুরুশব্দে সদ্‌গুরুই বুঝায়। কারণ গুরুরূপী ভগবান্ অথবা

৮ তন্ত্রশাস্ত্রে ভোগদীক্ষার কথাও আছে, তবে তাহা আলাদা। তাহা সদ্‌গুরুপ্রদত্ত। শিষ্য ভোগার্থী বলিয়া সদ্‌গুরু তাহাকে দীক্ষার দ্বারা অভিলষিত ভোগের জন্য তদুচিত-লোকে প্রেরণ করেন। ক্রমশঃ ভোগক্ষয় করিয়া উঠিতে উঠিতে সেও অন্তে পূর্ণত্বলাভ করে, তবে দীর্ঘকাল পরে।

গুরুদেহে অধিষ্ঠিত ভগবান্ আপন ক্রিয়াশক্তির দ্বারা (দীক্ষার দ্বারা) পশুর স্বতঃসিদ্ধ দিব্য জ্ঞানরূপ চক্ষুর অবরোধক অনাদি মল অপসারণ করিয়া দেন। ফলে তাহার পশুত্ব ঘুচিয়া গিয়া সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্ব অভিব্যক্ত হয় ও শিবসাধর্ম্যের প্রাপ্তি ঘটে।

এই ক্রিয়াশক্তি দর্শনাদি নানা উপায়েই প্রযুক্ত হইতে পারে এবং তদনুসারে দীক্ষারও প্রকারভেদ হইয়া থাকে। শিষ্যের উদ্ধারসামর্থ্য গুরুর লক্ষণ। যোগবাশিষ্ঠে আছে ঃ

দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে।
জনয়েৎ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ ॥

(নির্বাণ প্রকরণ)

অর্থাৎ যিনি কৃপাপূর্বক দর্শন, স্পর্শন ও শব্দের দ্বারা শিষ্যের দেহে শিবভাবের আবেশ উৎপাদন করিতে পারেন তিনিই 'দেশিক' বা গুরু। কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া ষট্চক্রভেদনপূর্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে পরশিবের সঙ্গে মিলিত হইলে এই আবেশ ঘটে। সত্যসংকল্প গুরু শুধু একবার কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াও এই সুমহৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারেন।

যোগ্য শিষ্যকে উদ্ধার করা এবং অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া উদ্ধার করা, ইহাই গুরুর কার্য। বোধসারে নরহরি বলিয়াছেন ঃ

তৎতদ্বিবেকবৈরাগ্যযুক্তবেদান্তযুক্তিভিঃ।
শ্রীগুরুঃ প্রাপয়ত্যেব অপদন্নমপি পদন্নতাম্ ॥
প্রাপয্য পদন্নতামেনং প্রবোধয়তি তৎক্ষণাৎ ॥

অর্থাৎ শ্রীগুরু বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত বেদান্তযুক্তির দ্বারা অপদন্নকেও পদন্নরূপে পরিণত করেন। পরে তাহাকে মুহূর্তের মধ্যে জাগাইয়া তোলেন। ভাস্কর রায় ললিতাসহস্রনামের ভাষ্যে ইহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন—

"অযোগ্যোপি যোগ্যতামাপাদ্য শ্রীগুরুসূর্যঃ বোধয়তি"—অর্থাৎ শ্রীগুরুরূপী সূর্য আযোগ্যকে যোগ্য করিয়া প্রবুদ্ধ করেন।[৯]

৯ নবচক্রের তন্ত্রে আছে ঃ

"পিণ্ডং পদং তথা রূপং রূপাতীতং চতুষ্টয়ং।
যো বৈ সম্যক্ বিজানাতি স গুরুঃ পরিকীর্তিতঃ ॥"

অর্থাৎ যিনি পিণ্ড, পদ, রূপ ও রূপাতীত—এই চারিটিকে সম্যক্ রূপে অবগত আছেন তিনি গুরু।

গুরুগীতানুসারে—কুণ্ডলিনী শক্তি, হংস, বিন্দু এবং নিরঞ্জন এই চারিটিকে যথাক্রমে পিণ্ড, পদ, রূপ ও রূপাতীত বলা হয়। যথা—

বৈদিক শাস্ত্রের ন্যায় আগমেও শ্রৌত, চিন্তাময় এবং ভাবনাময়—এই তিন প্রকার জ্ঞানের বিবরণ পাওয়া যায়।[১০] ইহার মধ্যে পূর্ব পূর্ব জ্ঞান উত্তরোত্তর জ্ঞানের প্রতি হেতু। বিক্ষিপ্তচিত্তের শাস্ত্রার্থ-পরিজ্ঞানকে শ্রৌতজ্ঞান বলে। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শাস্ত্রার্থ আলোচনাপূর্বক 'ইহাই এই স্থলে উপযোগী' এই প্রকার আনুপূর্বী দ্বারা ব্যবস্থাই চিন্তাময় জ্ঞান। ইহা মন্দাভ্যস্ত ও স্বভ্যস্ত-ভেদে দুই প্রকার। স্বভ্যস্ত চিন্তাময় জ্ঞান হইতে ভাবনাময় জ্ঞান জন্মে, যাহাকে মোক্ষের একমাত্র কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহাই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। ইহা হইতেই যোগ ও যোগফল লাভ হয়। ভাবনাময় জ্ঞানের অভাবে অশুদ্ধ শিষ্যকে মায়িক তত্ত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া ইচ্ছানুসারে স-কল সদাশিবে অথবা নিষ্কল পরমশিবে যুক্ত করা সম্ভবপর নহে। অর্থাৎ গুরু স্বভ্যস্তজ্ঞানী হইলেও ভাবনাবিশেষের অভাবে ঐ তত্ত্ববিশেষের সাক্ষাৎকার না করিয়া অশুদ্ধ থাকিলে পূর্বোক্ত-প্রকার উদ্ধার ও যোজন-কার্য করিতে সমর্থ হন না। আবার সিদ্ধযোগী ঐ মায়িক তত্ত্বের সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াও সদাশিবাদি উত্তম

"পিণ্ডং কুণ্ডলিনীশক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥"

স্বচ্ছন্দসংগ্রহেও এই শ্লোকটি আছে। তবে সেখানে শেষ পদে আছে—"রূপাতীতং হি চিন্ময়ম্।" যোগিনীহৃদয়তন্ত্রে এই ক্রমেই চারিটির উল্লেখ আছে। কিন্তু দাদু-দয়ালজীর শিষ্য সুন্দরদাস তাঁহার "জ্ঞানসমুদ্র" নামক গ্রন্থে ধ্যানের বর্ণনা প্রসঙ্গে—পিণ্ডস্থ, পদস্থ, রূপস্থ ও রূপাতীত, এই পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন, (শ্লোক—৭৮-৮৪)। জৈন-গ্রন্থেও এই চারিপ্রকার ধ্যানের কথা পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা বুঝা যায়—পূর্ণ ও শুদ্ধতম জ্ঞানই গুরুর লক্ষণ।

১০ বৌদ্ধগ্রন্থেও শ্রুতচিন্তাভাবনাময়ী প্রজ্ঞার কথা আছে। শান্তিদেবের বোধি-চর্য্যাবতারের প্রজ্ঞাকরকৃত পঞ্জিকানাম্নী টীকাতে এই প্রজ্ঞাকে ভূমিপ্রবিষ্ট প্রজ্ঞা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। অভিধর্ম্মকোশেও শ্রৌত জ্ঞানাদির বিবরণ আছে। বৈভাষিক মতে শ্রুতময়ী প্রজ্ঞার বিষয় নাম ও অর্থ এবং ভাবনাময়ী প্রজ্ঞার বিষয় অর্থ। সৌত্রান্তিক মতে শ্রুতপ্রজ্ঞা=আপ্তপ্রমাণজ নিশ্চয়; চিন্তাপ্রজ্ঞা=যুক্তি-নির্ধ্যানজ নিশ্চয়; ভাবনাপ্রজ্ঞা=সমাধিজ নিশ্চয়। যে শীলবান্ ও শ্রুতচিন্তাপ্রজ্ঞাবান্, সে ভাবনার অধিকারী। (দ্রষ্টব্য—অভিধর্ম্ম কোশ [৬])।

পদে স্বভ্যস্ত জ্ঞানী বলিয়াই যোজনা করিতে পারেন। যদি যোগী যোগবলে তত্তৎ তত্ত্বের সিদ্ধি লাভ করেন, তথাপি যোগবলে তত্তৎ তত্ত্বে শিষ্যের যোজনা করিতে পারেন না। কারণ, নিম্নবর্তী তত্ত্বে যে যোগজ সিদ্ধি হয়, তাহা বিমোচনের উপায় নহে।

প্রশ্ন এই : যোগীর সদাশিবাদি ঊর্ধ্বর্বতী তত্ত্বে যোগজ সিদ্ধি হয় না কেন, যাহার প্রভাবে যোগী সকল জগতের উন্মোচক হইতে পারে? ইহার সমাধান এই যে, যদিও যোগীর ন্যায় জ্ঞানীও অভ্যাসহীন বটে, তথাপি জ্ঞানী সর্বথা স্বভ্যস্তভাবনাময় বিজ্ঞান-প্রসঙ্গে শিবভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া দীক্ষাদিক্রমে যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে যোগীর প্রকারভেদ সম্বন্ধেও একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আগম-মতে সংপ্রাপ্ত, ঘটমান, সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ-ভেদে যোগী চারি প্রকার। যে সাধক যোগের উপদেশ মাত্র পাইয়াছে, তাহাকে 'সংপ্রাপ্ত' এবং যোগাভ্যাসে নিরত সাধককে 'ঘটমান' বলে। এই দুই জাতীয় সাধক স্বয়ংই যোগ অথবা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠ নহে বলিয়া অন্যের কোন উপকার সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। তবে যাঁহার যোগ সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার স্বভ্যস্ত জ্ঞানও অবশ্যই আছে। এই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি অন্যকে মুক্ত করিতে পারেন—অন্য প্রকারে অর্থাৎ সিদ্ধিপ্রভাবে নহে। যোগী ও জ্ঞানীর মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, যোগী হইয়াও ইনি জ্ঞানী। যিনি 'সুসিদ্ধ' যোগী, তিনি ব্যবহার-ভূমির অতীত। তিনি কোন সময়েই আপন স্বরূপ হইতে স্খলিত হন না। তিনি যে-কোন স্থানে অবস্থান করিয়া যে-কোন প্রকারে ফলভোগ করিয়াও হীন হন না, নির্বিকার থাকেন। তিনি নররূপী বিরূপাক্ষ। একমাত্র তাঁহারই সকলাধ্বার সিদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তিনি গুরু-ভাব অবলম্বন করিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে অমর্ত্যগণকে মোচন করেন না—বিদ্যেশ্বরগণের ভিতর দিয়া করেন।

অতএব জ্ঞান ও যোগের বিচার করিয়া মালিনীতন্ত্র বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষুর পক্ষে স্বভ্যস্তজ্ঞানবান্ গুরুই শ্রেষ্ঠ। তাই স্বভ্যস্তবিজ্ঞানতাই গুরুর একমাত্র লক্ষণ—যোগিত্ব গুরু-লক্ষণ নহে।

তবে যোগী গুরুও আছেন। ইহা সত্য যে, জ্ঞানী যোগী অপেক্ষা বিশিষ্ট। কোন্ স্থলে জ্ঞানী গুরু কর্তব্য, কোন্ স্থলে যোগীগুরু কর্তব্য বা ত্যাজ্য, তাহা আচার্য অভিনবের গুরু শম্ভুনাথ স্ব-মুখে এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে মোক্ষজ্ঞানার্থী, তাহার গুরু স্বভ্যস্তজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। অন্যবিধ গুরু প্রাপ্ত হইলেও তাহার পক্ষে ঐ গুরু পরিহার্য। কারণ—

'আমোদার্থী যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
বিজ্ঞানার্থী তথা শিষ্যো গুরোগুর্বন্তরং ব্রজেৎ।'

অর্থাৎ যে গুরু বিজ্ঞান দানে অসমর্থ, তিনি শক্তিহীন। যিনি স্বয়ং অজ্ঞ, তিনি অন্যের উপকার কি প্রকারে করিতে পারেন? প্রশ্ন হইতে পারে—ভাবনাই ত' মুখ্য, অজ্ঞ গুরুতেও শিষ্যের ভাবনাবশতঃ সুফল হইতে পারে। সুতরাং অজ্ঞ গুরুর ত্যাগে প্রয়োজন কি? যে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ দেখিয়াও অধম পদে স্থিত থাকে, সে দুর্ভাগ্য। যে ভোগ, মোক্ষ ও বিজ্ঞানপ্রার্থী, তাহার গুরু স্বভ্যস্তজ্ঞানী যোগসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ইনিই তৃতীয় প্রকার যোগী। যে মোক্ষ ও বিজ্ঞানার্থী, তাহার গুরু জ্ঞানী। এই গুরু হইতে ভোগসিদ্ধি হয় না। আর যিনি মিত যোগী, অর্থাৎ যে যোগী ঘটমান ও সিদ্ধাবস্থার মধ্যবর্তী, তিনি গুরু হইলেও শুধু ভোগাংশ দানে সমর্থ—তিনি মোক্ষ ও বিজ্ঞান দান করিতে পারেন না। আর যে যোগী শুধু সংপ্রাপ্ত ও ঘটমান অবস্থায় বর্তমান, তিনি শিষ্যের মোক্ষ ও বিজ্ঞান বিধানের কথা দূরে থাকুক, তাহাকে ভোগ মাত্র দানেও সমর্থ নহেন—তিনি শুধু উপদেশে কুশল। যিনি মিত যোগীও নহেন, এমন যোগাভ্যাসী অপেক্ষা বরং মিতজ্ঞানীও গুরু হিসাবে শ্রেষ্ঠ; কারণ, তিনি জ্ঞানের উপায় উপদেশ দ্বারা ক্রমশঃ মুক্ত করিতে সমর্থ।

এইপ্রকার মিতজ্ঞানী যদি গুরু হন, তাহা হইলে শিষ্যের কর্তব্য কি? একজন পূর্ণ জ্ঞানশালী গুরু অর্থাৎ 'সদগুরু' না পাইলে ভিন্ন ভিন্ন পরিমিত-জ্ঞান গুরু হইতে অংশাংশিকা ক্রমে জ্ঞান আহরণ করিয়া স্বাত্মায় অখণ্ডমণ্ডল পূর্ণ-জ্ঞান সম্পাদন করিবে। একজন মিত-জ্ঞানী হইতে পূর্ণজ্ঞান লাভ হইতে পারে না বলিয়া স্বকীয় জ্ঞান পূরণ করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন সহকারে অসংখ্য গুরুকরণের আবশ্যকতা হয়। তাহাতে প্রত্যবায় নাই।

সদ্‌গুরুপ্রাপ্তি ভগবদনুগ্রহ ভিন্ন হয় না। তীব্রশক্তিপাতস্থলে পূর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন গুরু পাওয়া যায়—যাঁহার কৃপাতে অনায়াসে স্বাত্মবিজ্ঞান পূর্ণভাবে উদিত হয়। তখন আর পুনঃ পুনঃ গুরুকরণের আবশ্যকতা থাকে না।

সাত

আমরা প্রাতিভজ্ঞানের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহা অনুত্তর মহাজ্ঞান-স্বরূপ। ইহা স্বয়মুদ্ভূত বলিয়া সাংসিদ্ধিক।[১১] কিরণাগমে আছে—দীক্ষার

১১ পাতঞ্জল-দর্শনে ও তাহার ব্যাসভাষ্যেও প্রাতিভের কথা আছে। ইহাকে 'বিবেকজ জ্ঞান' বলা হইয়াছে এবং অনৌপদেশিক, সর্ববিষয়ক, সর্বথাবিষয়ক, ও অক্রম বলিয়া

দ্বারা যেমন মুক্তি হয়, তেমনি প্রাতিভ দ্বারাও মুক্তি হয়। তবে দীক্ষা গুরুর অধীন, প্রাতিভ স্ব-স্বভাব মাত্র। ইহাই বৈলক্ষণ্য। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে—যে সকল পুরুষ কেবলমাত্র স্ব-প্রতিভা দ্বারা মোক্ষানুভব নিষ্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও অন্ততঃ কিঞ্চিন্মাত্রায় গুরুর অনুগ্রহ লাভ করিতেই হয়। কারণ, এই অখিল জগতের সমস্ত ভাবের বিজৃম্ভণের মূলেই পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যের খেলা রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার আজ্ঞা ব্যতিরেকে ঐ সকল পুরুষের তাদৃশ প্রতিভা সম্পন্নই হইতে পারে না।

প্রাতিভ জ্ঞান দুই প্রকার—(ক) গুরু ও আম্নায়গত এবং (খ) স্বাভাবিক (শুদ্ধ)। (ক) শিব, শক্তি ও নর বা জীব—এই তিনের সমষ্টিই বিশ্ব। তন্মধ্যে শিব কর্তা, শক্তি কারণ (কারণ ইহাতে কর্ম ও কর্তার আবেশ এবং কর্তৃত্বস্পর্শ আছে) এবং জীব কর্ম (বা বন্ধনের বিষয়)। এইজন্য বদ্ধ জীব গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ্য—তাহাতে বধ্য, বন্ধ ও বন্ধকত্ব-বিভাগ অবভাস-পূর্বক মহাজ্ঞানের উদয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গুরু ও শাস্ত্রের মাহাত্ম্যে শিবাদি তত্ত্বত্রয়ই প্রাতিভ-জ্ঞানরূপে আবির্ভূত হয়। যখন সাধকের পাশ গুরু কর্তৃক দীক্ষারূপ অসি দ্বারা ছিন্ন হয়, যখন সাধক আগম হইতে ভাবনাভাবিত হয়, তখন তাহার বাস্তবিক প্রাতিভ-তত্ত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হয়।[১২] যেমন ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি মুখবায়ু প্রভৃতির প্রভাবে পরিস্ফুট হয়, যেমন সময়ে উপ্ত ও সংসিক্ত বীজ অংকুর-পল্লবাদিরূপে অভিব্যক্ত হয়, তদ্রূপ প্রাতিভজ্ঞানও গুরূপদিষ্ট যাগ-যোগাদির দ্বারা ব্যক্ত হয়। এই প্রাতিভজ্ঞান অন্তকরণ সম্পাদ্য বলিয়া সেন্দ্রিয়।

(খ) স্বাভাবিক প্রাতিভ=বিবেকজ জ্ঞান। ইহা অন্তঃকরণসম্পাদ্য নহে বলিয়া অতীন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় এবং অপ্রমেয় সংবিৎ-তত্ত্ব বিচার[১৩] অবস্থা প্রাপ্ত

বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই তারক জ্ঞান। আগমেও ঠিক এই কথাই আছে। 'অনৌপদেশিক' শব্দে যাহা বুঝায়, তন্ত্রের 'গুরুশাস্ত্রানপেক্ষ' শব্দেও ফলতঃ তাই বুঝায়।

১২ 'তদাগমবশাৎ সাধ্যং গুরুবক্ত্রান্মহাধিপে।
শিবশক্তিকরাবেশাদ্ গুরু শিষ্যপ্রবোধকঃ॥
অধরোত্তরগৈর্বাক্যৈঃ প্রভুশক্ত্যুপবৃংহিতঃ।
তচ্ছক্ত্যা সুপ্রবুদ্ধস্য ধ্বস্তমায়ামলস্য চ॥
দীক্ষাসংছিন্নপাশস্য ভাবনাভাবিতস্য চ।
বিকাশং তত্ত্বমায়াতি যত্তজ-জ্ঞানমিদং শিবে॥
প্রাতিভং তৎ সমাখ্যাতং তত্ত্বজ্ঞানস্য ভাবনাৎ॥'

১৩ ত্রিপুরারহস্যে আছে—
'রাধিতা পরমা দেবী সম্যক্ তুষ্টা সতী তদা।
বিচাররূপতাং যাতি চিত্তাকাশে রবির্যথা॥' (২।৭০)

হইয়া যখন স্ব-পরামর্শরূপে পরিণত হয়, তখন উহাকে 'বিবেক' বলা হয়। তখন পতি, পশু ও পাশজ্ঞান স্বয়ংই উদিত হয়—কিছুরই অপেক্ষা থাকে না। ইহাই বিবেকজ প্রাতিভজ্ঞান। ইহা সম্যগ্‌জ্ঞান। তখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়গম্য ও অন্তঃকরণগম্য সংকুচিত জ্ঞান অন্যাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ঐ মহাপ্রকাশে বিশ্রান্ত হয়। প্রদীপের ক্ষীণ প্রভা যেমন সূর্যকিরণে নিষ্প্রভ হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। বিবেক জন্মিলে শব্দাদি ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুতে দেশ, কাল ও আকারগত বিপ্রকৃষ্ট প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। বিবেক গাঢ় হইলে সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য ভাল লাগে না, তখন শিবময় পরম সত্যে বিশ্রাম ঘটে, সমস্ত ভাব হইতে বিবেক হয় বলিয়া সমস্ত বিষয়েই বৈরাগ্য জন্মে, দর্পণে যেমন নিজেকে প্রতিবিম্বরূপে দেখা যায়, তেমনি সর্বত্র ভিতরে ও বাহিরে শিবকেই দেখিতে পাওয়া যায়—অর্থাৎ শিবৈকঘন রূপে বিশ্বের সাক্ষাৎকার হয়, একই সময়ে ভিতরে ও বাহিরে শিব-দর্শন হয়,—প্রাতিভের ইহাই মাহাত্ম্য।

এই প্রকারে তাহার হেয় বা উপাদেয় কিছুই থাকে না বলিয়া অকিঞ্চিৎকর পরিমিত সিদ্ধিতে নিবন্ধনভূত প্রতিনিয়ত ধ্যানাদি ত্যাগ হয় ও একমাত্র পরা সংবিৎ-এরই পরামর্শন হয়। তখন যাবতীয় সিদ্ধিসম্পৎ স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রতীত হয়। প্রাতিভের এই লক্ষণ দেখিলেই সাধক হেয়োপাদেয়তত্ত্বজ্ঞ হইয়া সর্বদা বিভু শিবকেই ধ্যান করে। সিদ্ধি শুধু পরপ্রত্যয়নিমিত্ত—নতুবা দেহান্তে মুক্তির ভরসা কি? কিন্তু যে পর-সত্ত্বেই দৃঢ় ভাবনাবিশিষ্ট, সে জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত হয়।

আর এক কথাঃ বিবেকের বিকাশ হইলে অভ্যাসবশতঃ শাপ ও অনুগ্রহ-কার্যে সামর্থ্য জন্মে। তখন সাধক বালক্রীড়াপ্রায় সিদ্ধিসকলে অনাসক্ত হইয়া মধ্যস্থ ভাব অবলম্বনপূর্বক পরতত্ত্বেই বিশ্রান্ত থাকে। সেইজন্য নিজে মুক্ত হইয়া অন্যকেও মুক্ত করিতে সমর্থ হয়।

বদ্ধ অণু ভূতেন্দ্রিয়াদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া সংসার-মার্গে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি অণু প্রাতিভাযুক্ত হয়, যদি তাহাতে বিবেকোদয়

অর্থাৎ হৃদয়স্থা সকলের আত্মস্বরূপা অন্তর্যামিনী চিন্ময়ী মহেশ্বরীকে আরাধনা দ্বারা প্রসন্ন করিলে তিনিই সাধকের চিত্তে বিচাররূপে উদিত হন। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, দীর্ঘকাল 'সদ্‌গুরু' দ্বারা ক্রম অনুসারে অকপটে অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া এই হৃদয়বাসিনী আত্মদেবতাকে আরাধনা করিলে তাঁহার কৃপা উপাসকের চিত্তে বিচারাকারে স্ফুরিত হয় (২।২৯-৮২)। অন্যত্র আছে যে এই বিচার হইতেই ক্রমশঃ সকল আধ্যাত্মিক অবস্থার বিকাশ হয় ও অন্তে আত্মপ্রত্যভিজ্ঞার উদয় হইয়া নির্বিকল্পক আত্মস্বরূপে স্থিতি হয় (ঐ ১৭।৬৩-৬৮)।

হইয়া থাকে, তাহা হইলে শক্তিতত্ত্বরূপে বর্ণিত হয়। সে তখন শুদ্ধ বিদ্যাদশাতে অধিষ্ঠিত থাকে। তাই অনুগ্রহ-নিগ্রহাদি কার্যে তাহার প্রবণতা জন্মে। এই বিবেকের বিকাশবশতঃ জীব ভবসাগর হইতে মুক্ত হইয়া কারণষট্ক ত্যাগপূর্বক শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

অতএব শিব, শক্তি ও জীব—এই তত্ত্বত্রয়ই যে প্রাতিভ বিজ্ঞানরূপে আবিভূর্ত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ।

আট

সদ্‌গুরু বস্তুতঃ স্বয়ং পরমেশ্বর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তন্ত্রমতে তিনিই পরমশিব। তিনি স্বাতন্ত্র্য শক্তিময়—পঞ্চকৃত্যকারিত্ব তাঁহারই অসাধারণ ধর্ম। এই পঞ্চকৃত্যের মধ্যে জীবের অনুগ্রহ অন্যতম। অন্যতম কেন, ইহাই প্রধান। বলিতে কি, তাঁহার অন্যান্য কৃত্য ইহার অঙ্গীভূতও বলা চলে।

তিনি সাক্ষাৎ অনুগ্রহ করেন, অথবা কোন গুরুদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া অনুগ্রহ করেন। তাঁহার সাক্ষাৎ অনুগ্রহ নিরধিকরণ এবং দ্বিতীয়টি সাধিকরণ। শাস্ত্র বলেন যে, যখন তমঃ ও অনাদিপ্রবৃত্ত মলের ও বামাখ্য ভগবৎ-শক্তির আবরণাত্মক অধিকার নিবৃত্ত হয়, তখন জীবের কৈবল্যাভিমুখ ভাব উদিত হয়। এই ভাবের উদয় হইলে জগদুদ্ধার-প্রবণ পরমেশ্বর অণু আত্মার অনন্ত দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, অর্থাৎ চৈতন্য, প্রকট করিয়া দেন। দৃক্‌ক্রিয়ার আনন্ত্য পশুরও আছে, তবে মলের অবচ্ছেদবশতঃ উহা আবৃত্ত থাকে। পরিণামের ফলে আবরণ অপগত হওয়াতে উহা অভিব্যক্ত হয়।

পরমেশ্বর সব সময়েই অনুগ্রহ করিতে পারেন ও করেন। জগতের স্বাপ, সংহার সৃষ্টি ও স্থিতি—সকল অবস্থাতেই তাঁহার অনুগ্রহ আত্মপ্রকাশ করে। তবে অনুগ্রহের ফলে কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটে। অবশ্য অনুগ্রহের মুখ্য ফল—মুক্তি, তাহা ত' হয়ই। তবে উহা নিরধিকার হইতে পারে, সাধিকারও হইতে পারে। নিরধিকার মুক্তিই শিবত্ব, সাধিকার মুক্তি বিদ্যেশ্বরাদি অধিকারীর পদবিশেষ। স্বাপাবস্থায় অনুগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই শিবত্ব হয়—অধিকারপ্রাপ্তি হয় না। কারণ, ঐ সময়ে জগৎ নাই বলিয়া অধিকারীর প্রয়োজন হয় না। সংহার ও সৃষ্টিকালে অনুগ্রহের ফলে শিবত্বলাভ, অথবা মলপাকের বৈচিত্র্যানুসারে ঐশ্বর্যপ্রাপ্তিরূপ সাধিকার-মুক্তি হয়। যাহারা সংহার-কালে সাধিকার অনুগ্রহ পায়, তাহারা সৃষ্টিতে অধিকারী হয়। আর যাহারা সৃষ্টিকালে সাধিকার অনুগ্রহলাভ করে, তাহারা পর-বিদ্যেশ্বর প্রভৃতি অবস্থা লাভ করে।

কাহারও কাহারও শিবত্বলাভও যে না হইতে পারে, তাহা নহে। কারণ, মলপাক এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহ—কোনটিরই কালনিয়ম নাই। অদ্বৈতদৃষ্টিতেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য পর্যনুযোগের অযোগ্য,—তাহা বলাই বাহুল্য। এই যে তিন কালের অনুগ্রহ, ইহা নিরধিকার ভগবানের অনুগ্রহ। কিন্তু জগতের স্থিতি-কালে সাধারণতঃ[১৪] তাঁহার অনুগ্রহ ঐ প্রকার সাক্ষাৎ বা নিরধিকরণ হয় না—গুরু বা আচার্যরূপ অধিকরণে আবেশপূর্বক হয়। স্থিতিকালে পরমেশ্বর প্রশান্তি লাভের যোগ্য চিদ্‌যুক্ত অণুসকলকে যোগ্যতানুসারে অনুগ্রহ করেন এবং কাহাকেও মন্ত্র-পদ, কাহাকেও পতি-পদ ও কাহাকেও সর্বোচ্চ ঈশান-পদ দান করেন।[১৫] এই সকল পদ সালোক্যাদি বলিয়া বুঝিতে হইবে। এ সবই অ-পরমুক্তি। অবশ্য অতি উন্নত যোগ্যতাবিশিষ্ট কেহ কেহ পরা মুক্তি বা শিবত্বও প্রাপ্ত হন। সাধিকার মুক্তির মধ্যে (অনন্তাদি) মন্ত্রমহেশ্বরের পদ শ্রেষ্ঠ—উহার উপরে আর পদ নাই এবং ঐখান হইতে চ্যুতিরও সম্ভাবনা নাই।[১৬] ইহার পরেই অপবর্গ লাভ হয়, শুধু অধিকার সমাপ্তির অপেক্ষা থাকে। মহেশ্বর-পদ মধ্যম ও রুদ্রগণের পদ নিকৃষ্ট। এই দুই পদ হইতে চ্যুতি হইতে পারে—কারণ, তত্তদ্ ভুবনপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ মহাপ্রলয় পর্যন্ত অবস্থান করে। পুনর্বার সর্গারম্ভে অবশিষ্ট কর্মবশতঃ অধোগতির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এই দুইটি পদ লাভ ঠিক মুক্তি নহে—মুক্ত্যাভাস মাত্র। তবে এই দুই পদ হইতেও মুক্তি যে হইতে পারে না, তাহা নহে। মল-পরিপাক বশতঃ দীক্ষা দ্বারা ঐ পদদ্বয়েও মোক্ষ অসম্ভব নহে; কারণ প্রত্যেক ভুবনেই গুরু আছেন।

পরমেশ্বর জগতের স্বাপাবস্থাতে যে কৃপা করেন, তাহাতে অনুগ্রাহ্য জীবের যোগ্যতার বিচার করেন না। কারণ, ঐ সময়ে অধিকারের উপযোগ থাকে না বলিয়া তন্মূলক বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা-পরীক্ষার আবশ্যকতা হয় না। যোগ্যতাবৈচিত্র্যমূলক অনুগ্রহ স্থিতিকালের জন্য—স্বাপকালের জন্য নহে।

---

১৪ স্থিতিকালেও অত্যন্ত মলপাকবশতঃ নিরধিকরণ অনুগ্রহ হইতে পারে—তবে অতি বিরল। (মৃগেন্দ্রাগম, সটীক—পৃঃ ১৬৫)

১৫ পঞ্চাষ্টকাদি রুদ্রগণের পদ = রুদ্র-পদ; সপ্তকোটি মন্ত্রগণের পদ = মন্ত্রপদ; অ-পর মন্ত্রেশ্বরগণের পদ = পতিপদ; ঈশ্বর (অনন্ত), সদাশিব ও শান্তলক্ষণ ঈশানের পদ = ঈশান-পদ।

১৬ মায়োত্তীর্ণ হওয়ার দরুণ কর্মাভাববশতঃ চ্যুতির ভয় নাই। রৌরবে আছে—

'ভুক্ত্বা ভোগান্ সুচিরমমরস্ত্রীনিকায়ৈরুপেতাঃ।
সুস্তোৎকণ্ঠাঃ শিবপদপরৈশ্বর্যভাজো ভবন্তি॥'

তবে অত্যন্ত মলপাকস্থলে তীব্রতম বৈরাগ্যাবস্থায় স্থিতিকালেও স্বাপকালের ন্যায় অবস্থা কাহারও কাহারও হইতে পারে। তবে ইহা অতি কম দেখা যায়।

তমঃপাতি বা দৃক্‌ক্রিয়ানিরোধক বামদেবনাথের রোধকতা কিঞ্চিৎ শিথিল হইলে ও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে শরীরীদের নানা প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। অর্থাৎ পরমেশ্বরের তিরোধান-শক্তির অধিকার বিরত হইলেই অনুগ্রহ বা শক্তিপাতের লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয়। শক্তিপাতই অপুনরাবৃত্তির কারণ। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া শক্তিপাত হইয়াছে বুঝিয়া গুরুগণ দীক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু অশরীরীদের শক্তিপাত গুরুগণও লক্ষ্য করিতে পারেন না। এই সকল লক্ষণের মধ্যে তীব্র মুমুক্ষা, সংসারবৈরাগ্য এবং পরমেশ্বরভক্তি-পরায়ণে ভক্তি ও তৎশাসক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা—এইগুলি প্রধান। পাশের শিথিলতা যত বেশী হয়, ততই এই সকল লক্ষণ অধিক প্রকাশ পায়।

কেহ কেহ মনে করেন যে, স্বয়ং ভগবান্ যাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ অনুগ্রহ করেন, তাঁহারা সকলেই জগতের আদিগুরু। এ কথা সত্য নহে। কারণ, গুরুপদও বিশুদ্ধ বাসনাময় অধিকার-পদ। জীবোদ্ধার ও লোককল্যাণের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে না থাকিলে কেহ গুরুপদ লাভ করিতে পারেন না। যে সকল আত্মার মলপাক অত্যন্ত অধিক বলিয়া পরমবৈরাগ্যের উদয় হয়, তাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবদনুগ্রহ-প্রাপ্তির ফলে একেবারে পূর্ণত্ব লাভ করেন,—তাঁহারা জগতের অতীত হন। আগম-মতে তাঁহারা পরমেশ্বরের অধিকারাবস্থা ও ভোগাবস্থা ভেদ করিয়া একেবারে লয়াবস্থা প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় বিন্দুক্ষোভ থাকে না বলিয়া ইহা সৃষ্টির অতীত অবস্থা। দ্বৈতদৃষ্টিতে বিচার করিলে ইঁহাদিগের জগদ্ব্যাপারে সম্বন্ধ থাকে না। ইঁহারা মুক্ত-শিব। ইঁহারাও মলহীন বলিয়া পরমশিবের ন্যায় সর্বশক্তিযুক্ত ও স্বতন্ত্র, তাহা সত্য; এবং ঐ স্বাতন্ত্র্য তখন অনাবৃত, তাহাও সত্য। তথাপি ইঁহারা বাসনামুক্ত বলিয়া জগতের অধিকারাদি হইতে উপরত ও স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। নির্মল মুক্ত পুরুষের শক্তি অর্থাৎ অব্যয়া স্বয়ংবেদ্যা সংবিৎ সর্ববস্তুকে যথাবস্থিতরূপে গ্রহণ করে। ইঁহারা সমর্থ। কিন্তু সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্ব সত্ত্বেও ইঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, নিত্যমুক্ত পরমেশ্বরই বিশ্বকার্যের নির্বাহক। ইঁহারা রাগদ্বেষহীন। অদ্বৈত দৃষ্টিতে ইঁহারা সকলেই এক পরমেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। তাই পৃথগ্‌ভাবে এতৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই।

কিন্তু যাঁহাদিগের হৃদয়ে পরানন্দভোগের আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল, তাঁহারা ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাদেহে দিব্যভোগ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। সদাশিব-পদে ভোগ-সম্পত্তি ঘটিয়া থাকে। আর যাঁহারা পরোপকার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাঁহারা মলপাকবশতঃ ভগবদনুগ্রহ লাভ করিলে এমন অবস্থা লাভ

করেন যাহাতে তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে। তাঁহারা অধিকার-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে এক অংশ মন্ত্রপদ লাভ করেন। বাকি অংশ জগতের আদিগুরু-পদ প্রাপ্ত হন। এই আদিগুরুর মধ্যে সকলেই, অর্থাৎ আটজন, মায়ার উপরে ঈশ্বরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকেন। এই আটজন—অনন্ত হইতে শিখণ্ডী পর্যন্ত—জগদ্গুরুরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। ইঁহাদের অমায়িক বিশুদ্ধসত্ত্বময় বৈন্দব দেহ আছে, যাহা ইঁহারা সৃষ্টির আদিতে ভগবদনুগ্রহের সমকালে বিন্দুক্ষোভ হইতে প্রাপ্ত হন। বৈন্দব দেহ সত্ত্বেও ইঁহারা (অ-পর) শিব পদবাচ্য ও সর্বজ্ঞত্বাদিসম্পন্ন। ইঁহাদের মায়িক দেহ নাই। পূর্বেই ইঁহারা যোগ-বিজ্ঞানাদির দ্বারা কর্মক্ষয় সম্পাদন-পূর্বক মায়ার বাহিরে বিজ্ঞানকৈবল্য অবস্থায় মলমাত্র যুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।[১৭] তখনও মল-পাকের সম্যক্ পূর্ণতা না হওয়ার দরুণ ইঁহারা ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হন না। ঐটি বিদেহকৈবল্যের দশা, যাহা মায়া ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান হইতে উদ্ভূত। ঐ অবস্থায় কর্ম, পুর্যষ্টক, স্থূলদেহ—কিছুই থাকে না; তবে শুদ্ধ বাসনা থাকে—তাহা সত্য। আণব মল থাকে। সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা জ্যোতির্ময় বৈন্দব দেহ লাভ করেন এবং আপন অধিকারোচিত পদে স্থিত হন। এটা পূর্ণত্বের অবস্থা না হইলেও ঐশ্বর্যের অবস্থা বটে। ভগবানের পঞ্চকৃত্যকারিতা ইঁহারা প্রাপ্ত হন। ইঁহারা পরমেশ্বরের প্রের্য বা নিদেশবর্তী হইলেও এক হিসাবে জগতের প্রভু। মায়িক জগতের সৃষ্টি, রক্ষা প্রভৃতির ভার মূলতঃ ইঁহাদেরই উপর। অনুগ্রহও ইহার অন্তর্গত। তাই ইঁহারা গুরু-পদবাচ্য। ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই পরমেশ্বর কারুণ্যবশতঃ অবচ্ছিন্ন প্রমাতা শিষ্যকে উদ্ধার করেন। অবশ্য এই গুরুশক্তি ক্রম আশ্রয় করিয়াও ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়।

এই আটজনের ন্যায় আরও গুরু আছেন। তবে তাঁহারা আদিগুরু নহেন এবং মায়ার অতীত নহেন। তাঁহারা মায়াগর্ভের অধিকারী। স্বাভাবিক নিয়মে যে সকল জীবের কলাদি উপসংহৃত হয় ও যাহারা এই নিমিত্ত ঐ সময়ে জড়কৈবল্যের ন্যায় অবস্থায় মায়ামধ্যে বর্তমান থাকে, তাহাদিগকে প্রলয়াকল বলে। তাহাদের মল ত' থাকেই—কর্মও থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহাদের মল পরিপক্ব হইয়া ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্তি ঘটে, তাহারা সৃষ্টির সময় দ্বিবিধ দেহ প্রাপ্ত

১৭ ভগবান্ বামাখ্য ক্রিয়াশক্তি দ্বারা অনাদিমলযুক্ত পশুসকলকে নিরুদ্ধ করেন ও তাদৃশ নিয়মিত পশুকে কর্মবিপাকানুসারে মায়িক দেহ ধারণের জন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু বিজ্ঞানকেবলীদিগকে করেন না।

হইয়া জাগিয়া উঠে। অভুক্ত কর্মের দরুণ তাহাদিগকে আতিবাহিক মায়িক দেহ ধারণ করিতে হয়—এই দেহ কর্ম অনুসারে বিভিন্ন স্তরে কার্য করিতে পারে; অথচ ভগবদনুগ্রহের ফলে বিন্দুক্ষোভ বশতঃ বৈন্দব দেহপ্রাপ্তিও সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। এই উভয় দেহ পরস্পর মিলিতভাবেই বর্তমান থাকে। ইঁহাদের কার্যক্ষেত্র মায়িক জগতের মধ্যেই কলাতত্ত্ব হইতে পৃথিবীতত্ত্ব পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে হইয়া থাকে। বৈন্দব দেহ প্রাপ্ত হন বলিয়া ইঁহারাও গুরুকার্য করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারাও এক হিসাবে আদিগুরু মধ্যে গণনীয়। কারণ, মায়োত্তীর্ণ অনন্তাদি হইতে ইঁহারা পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হন না—সাক্ষাৎ পরশিব হইতেই পান। অর্থাৎ পরমেশ্বর অনন্তাদি বিদ্যেশ্বর বা আদিগুরু-বর্গের অধিষ্ঠান দ্বারা মায়া হইতে কলাদি তত্ত্ব, ভুবন, পিণ্ড ও ভাব সৃষ্টি করিয়া কলাসকলের সহিত পুদ্গল ও জীবসকলকে কর্মানুসারে যোজনা করিয়া তাহাদিগের মধ্য হইতে পরিণতমল অণুসকলকে মায়াগর্ভাধিকারী বিদ্যেশ্বর-পদে সাক্ষাৎ অনুগ্রহ করেন।

ইঁহারা—

(ক) মণ্ডলাধিপতি—আট (কলামস্তকে)[১৮]
(খ) ক্রোধেশ প্রভৃতি—আট (প্রকৃতি তত্ত্বে)।
(গ) বীরভদ্র—এক (গুণের উপরে ও প্রধানের নীচে)।
(ঘ) শতরুদ্র—একশত।
(ঙ) শ্রীকণ্ঠ (অষ্টকপতি)—এক (গুণতত্ত্বে)।

মোট ১১৮

ইঁহারাও কিন্তু মন্ত্রেশ্বর, কিন্তু ইঁহারা সাত কোটি মন্ত্র ও ঈশ্বরতত্ত্বস্থ আটজন বিদ্যেশ্বর অপেক্ষা পরে উৎপন্ন এবং মায়াগর্ভের অধিকারী বলিয়া অধোভূত। আচার্যাদির ন্যায় পশুর অনুগ্রহের জন্য ইঁহারা মন্ত্রের প্রয়োজক বলিয়া মন্ত্রেশ্বর। ইঁহারাও এক হিসাবে জগদ্গুরু। তবে মন্ত্রসকল অগ্রজ ও নিষ্কল, আর এই সকল মন্ত্রেশ্বর মন্ত্রের প্রয়োজক হইলেও অবরজ ও স-কল। তাই ইঁহাদের শক্তি ন্যূনতর ও ইঁহাদের অধিকার নিম্নে মায়াগর্ভে সীমাবদ্ধ।

বিজ্ঞানাকল ও প্রলয়াকল জীব হইতে সৃষ্টির প্রারম্ভে এই সকল গুরু ও অধিকারিবর্গ ভগবানের সাক্ষাৎ (নিরধিকরণ) অনুগ্রহের ফলে আবির্ভূত

১৮ কলাভুবনে অর্থাৎ রাগাদি কলান্ত অধ্বাতে ৬৪টি মহাপুর আছে, নাম মণ্ডল। যথা ভুবনেশাষ্টক, মহাদেবাষ্টক, বামদেবাষ্টক, ভবাষ্টক, উদ্ভবাষ্টক, একাপাঙ্গেক্ষণাষ্টক, ঈশানাষ্টক ও অঙ্গুষ্ঠমাত্রাষ্টক (৮ × ৮ = ৬৪)। সকল মণ্ডলেশ্বরই—ভাস্বর ও সুকান্তি।

হন। স্থিতিকালে স-কলাবস্থায় যে সকল জীব মলপাক বশতঃ ভগবানের অনুগ্রহযোগ্য হয়, তাহারা সকলেই অনন্ত প্রভৃতি কোন না কোন দেহে আবিষ্ট ভগবানের দ্বারাই অনুগৃহীত হইয়া থাকে। শ্রীকণ্ঠাদি অসংখ্য রুদ্র এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি-পদে স্থাপিত হন।

এই সকল রুদ্রগণের নিকট হইতে কয়েকটি দেবতা অনুগ্রহ লাভ করেন। ঐ সকল দেবতা হইতে কয়েকজন মনুষ্য অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। এই সকল রুদ্রাদি অধিকারী—স-কলাবস্থাতে চারিপ্রকার শক্তিপাত অনুসারে অনুগ্রহ-প্রাপ্ত। ইঁহাদের মলপাকের উদয় স্থিতিকালেই হয়। এই অবস্থায় যাহারা মুক্তিবীজ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের ক্রমমুক্তি সম্ভবপর। স্থিতির অবসানে প্রলয়ে যাহারা অনুগৃহীত, তাহাদের মধ্যে অধিকারী নাই। কারণ, যাহাদের মলপাক পূর্ণ হয়, তাহারা সদ্যঃ পর-মোক্ষ লাভ করে।

নয়

পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, গুরুবর্গ ছয় প্রকার। অনাদি-সিদ্ধ পঞ্চকৃত্যকারী বলিয়া পঞ্চমন্ত্রতনু পরমেশ্বরই সর্বানুগ্রাহক ও স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যময় বলিয়া নিত্যসিদ্ধ অনৌপাধিক গুরু। অন্যান্য গুরু ক্রমশঃ তাঁহারই নিয়োজ্য। গুরুবর্গের নাম, যথা—

(ক) পরমশিব, (খ) পর-মন্ত্রেশ্বর ও অপর মন্ত্রেশ্বর, (গ) রুদ্র, (ঘ) দেব, (ঙ) মুনি ও (চ) মনুষ্য। পরমশিব নিয়োজক, মন্ত্রেশ্বর তাঁহার নিয়োজ্য। আবার মন্ত্রেশ্বর যখন নিয়োজক, রুদ্র তখন নিয়োজ্য। এইপ্রকার সম্বন্ধ মনুষ্যগুরু পর্যন্ত বুঝিতে হইবে। ইহা সত্ত্বেও মনুষ্যাচার্যই শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাঁহাতে পূর্ববর্তী সকলেরই সান্নিধ্য আছে।

মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। কারণ, অন্যের বেদান্তজ্ঞানের অভাববশতঃ সিদ্ধান্ত শ্রবণের যোগ্যতা নাই। অন্যান্য বর্ণের মলপাক পূর্ণ হইলে তাঁহারা নিরধিকার দীক্ষার দ্বারা পর-মোক্ষ প্রাপ্ত হন, অথবা বিশ্বামিত্রের ন্যায় বিশিষ্ট তপস্যার দ্বারা বর্ণান্তরসংক্রান্তি লাভ করিয়া অধিকার প্রাপ্ত হন। কারণ, অধিকারিগণ লোকসংগ্রহের জন্য শ্রুতিবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম লঙ্ঘন করেন না। আর এক কথা: চারিবর্ণের সাধকগণ পূর্বজাতি হইতে উদ্ধৃত হইয়াও তত্তৎ জাত্যুচিত আচার ফলাভিসন্ধি বর্জন করিয়া অবশ্য অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইলে আর লোক-সাঙ্কর্য উৎপন্ন হইতে পারে না। অধিকার উদিত না হওয়া পর্যন্ত সাধক প্রভৃতির স্বাচারন্যূনতা বর্জনীয়। যদি অধিকার উদয় হওয়ার পূর্বে প্রারব্ধ দেহ ত্যাগ হয়, তাহা হইলে সাধকাদি তিনজনের ক্রমশঃ শিবত্ব,

মন্ত্রেশ্বরত্ব ও রুদ্রত্ব লাভ হয়। সাধক ও পুত্রকের সমপদ লাভ হয় না। শিবপদেও তাহাদের মধ্যে ভোগলয়াবস্থাদি ক্রমে লাভ হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণই সামান্য-বিশেষ শাস্ত্রে অধীতী, সমর্থ ও সমস্ত সম্পৎসম্পন্ন বলিয়া সর্বপদার্থ বিনিয়োগের জন্য পরমেশ্বরের অধিকরণরূপ আচার্য হইতে পারেন।

সাধকগণ বিনিয়োগ সহিত পতি, পশু ও পাশ—এই তিন বস্তুর জ্ঞানের দ্বারা আচার্যাধিকার প্রাপ্ত হন। আচার্যত্ব বন্ধন নহে—ইহা অ-পর মোক্ষ। সর্বপাশের ছেদ না হইলে আচার্যত্ব হয় না। আচার্যের শুধু অধিকার-মল মাত্র অবশিষ্ট থাকে, যাহা সর্বজ্ঞত্বের অবিরোধী। আচার্যের দেহ পশুদেহের ন্যায় নহে। ঐ দেহ বিন্দু হইতে উদ্ভূত বলিয়া বোধক, পশুদের দেহ মায়া হইতে উৎপন্ন বলিয়া মোহক। আচার্য পরমেশ্বরের সমান। তাঁহাকে পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা মূর্তি বলিয়া বর্ণনা করা যায়। স্ব-শক্তিই পরমেশ্বরের অন্তরঙ্গা মূর্তি —যাহাকে শাক্ত-দেহ বলা হয়। কিন্তু বৈন্দব দেহবিশিষ্ট আচার্য পরমেশ্বরের বাহ্য দেহ—ইহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি পশুর অনুগ্রহ-ব্যাপার সম্পাদন করেন। অর্থাৎ পরমেশ্বরের অন্তরঙ্গা মূর্তি সত্ত্বেও জগতের স্থিতিকালে জীবানুগ্রহের জন্য তাঁহার বহিরঙ্গা বৈন্দব-মূর্তির প্রয়োজন আছে। এই মূর্তি কর্মরহিত বলিয়া ময়োত্তীর্ণ বিশুদ্ধ ভোগী কোন জীবের সহিত সম্বন্ধ। ইনিই আচার্য। অতএব পরমেশ্বর ও আচার্য একই শরীর অবলম্বন করিয়া একই ব্যাপারের ব্যাপারক। তাই উভয়ে পরস্পর সাধর্ম্য আছে। সেইজন্য উভয়ে অভেদ ব্যবহার হয়; যথা—'গুরুরেব শিবঃ শিব এব গুরুঃ।' আচার্য বা গুরুও পরমেশ্বরের প্রের্য, তবে পুদ্গলের ন্যায় কণ্টকর ভোগ-সাধন কর্মে প্রেরিত হন না। আচার্য পরমেশ্বরের তীব্রতর শক্তিপাতানুযায়িনী তুরীয় দীক্ষা দ্বারা অনুগৃহীত ও আত্মকল্প। কাজেই, তাঁহাকে তিনি স্বোচিত শুদ্ধভোগের অবিরুদ্ধ পরার্থব্যাপার মাত্রেই প্রবর্তন করেন। আচার্যের এই প্রয়োজ্যত্ব পরমমুক্তির বাধক নহে। অধিকার সমাপ্ত হইলে দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণত্ব লাভ হয়। তাই আচার্যত্ব অ-পর মোক্ষ।

সাধকের দীক্ষার ফলে সকল পাশ ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না। তাহার জন্য কালান্তরভাবী অভিষেক আবশ্যক। তাহাই অ-পর নির্বাণ, যাহা সাধকের সাধনীয় ও পর-নির্বাণের দ্বারস্বরূপ। পরমেশ্বরের অর্চনাদির অবিনাভূত শাস্ত্রচর্চার দ্বারা অভিষেক সম্পন্ন হয়। ইহা আরোগ্য-স্নানের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

সাধক মাত্রেরই নির্বাণ-দীক্ষা পূর্বেই হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞানসাধন সাধকত্বের সম্পাদক তাহাতে পশুত্বের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি হইতে পারে না। শিবত্ব—সর্বজ্ঞত্বাদি ষাড্‌গুণ্য—সকল আধারে ফুটিতে পারে

না। যেখানে কলাদি ছয় অধ্বার শুদ্ধিপূর্বক পাশত্রয়ের ছেদ না হইয়াছে, সেখানে শিবত্বের অভিব্যক্তি অসম্ভব। কারণ, পূর্ণজ্ঞানের সাধনা ঐ ক্ষেত্রে কি প্রকারে হইবে? তৃতীয় বা নির্বাণ-দীক্ষার প্রয়োজক অধিক মলপাকনিবন্ধন তীব্র শক্তিপাত।

যাঁহাদের শক্তিপাত মন্দ—কারণ, অধ্ব-মল সামান্যতঃ পক্ক—তাঁহাদের ভাগ্যে নির্বাণ-দীক্ষাই ঘটে না; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে তুরীয় দীক্ষা ও আচার্যত্ব-লাভ অসম্ভব। তাঁহারা পুত্রক-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহাই দ্বিতীয় জন্ম, অর্থাৎ পূর্বজাতি নিবৃত্তিপূর্বক বাগীশ্বরী-গর্ভে জন্মলাভ। ইহার বিশেষ বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। এই দীক্ষার ফলে ভক্ত্যাদি সদ্‌বৃত্তির উদয় হয়, কর্মাদি পাশ ক্ষয়োন্মুখ হয় ও মন্ত্র-গ্রহণের যোগ্যতা লাভ হয়। যিনি এই দীক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে 'পুত্রক' বলে। ইহাই দ্বিতীয় দীক্ষা।

ইহার চেয়েও নিম্নস্তরের যে দীক্ষা, তাহাতে অধিকার-বিচার নাই—কাল বা আশ্রমের বিচার নাই। যে কোন আত্মা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহাকে সময়ী দীক্ষা বলে। তবে বহু জন্মার্জিত পুণ্যবল না থাকিলে তাহাও হয় না। তাহার জন্যও অনির্বচনীয় ভাগ্যোদয় চাই। ইহা অনাদি-মলের কিঞ্চিৎ পাক হইলে মন্দতর শক্তিপাতের অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন হয়। ইহা শিষ্যের মস্তকে শিবহস্তার্পণরূপ। ইহা যে প্রাপ্ত হয় তাহাকে 'সময়ী' বলে। এই দীক্ষার ফলে ভগবানে ভক্তি জন্মে ও প্রাক্তন কর্মসকলের পরিপাক দ্রুততর হইতে থাকে। এই দীক্ষা পাইয়া গুরুশুশ্রূষা ও সাধারণ দেবতাদির অর্চনায় অধিকার জন্মে।

আমরা এখানে যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে—মনুষ্যযোনিতে আচার্যপদ লাভ করা কত কঠিন ব্যাপার। পুত্রকদীক্ষাতে বাগীশ্বরী-গর্ভসম্ভূত যে দেহ লাভ হয়, তাহার পরেও দেহ আছে—তাহা বৈন্দব দেহ। তাহাই আচার্যদেহ। নির্বাণভূমি ভেদ না করিলে বৈন্দব দেহ লাভ হয় না। বৈন্দব দেহেরও নিবৃত্তি হয় অধিকারাদি সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে। তখন বিন্দুক্ষোভ আর থাকে না—শুদ্ধ অধ্বাও অতিক্রান্ত হয়। তখন শিবত্ব লাভ হয়—ঐ অবস্থায় শাক্ত দেহ লাভ হয়। ইহা নিরাকার অবস্থা। শক্তি চিদ্‌রূপা, শিবও চিদ্‌রূপ—উভয়ই অভিন্ন। ইহা পরামুক্তির অবস্থা। এই অবস্থাতে প্রের্যত্ব থাকে না। তাই ইহা স্বাতন্ত্র্য।

এই অবস্থায় পরমেশ্বরের সঙ্গে অভেদ হয়—অথবা নামমাত্র কিঞ্চিৎ ভেদ থাকে, তাহা প্রস্থান-ভেদে পৃথগ্‌ভাবে আলোচ্য। এখানে তাহা অপ্রাসঙ্গিক।

মন্ত্র বা দেবতা-রহস্য

গুরুতত্ত্বের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ মন্ত্র বা দেবতাতত্ত্ব। এখন তাহার সামান্য আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রের স্বরূপ কি, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ইহার স্থান কোথায়, মন্ত্র-সাধনের তাৎপর্য কি—এই সকল প্রশ্ন সাধারণতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্নও যে উদিত না হয়—এমন নহে। এ বিষয়ের প্রকৃত সমাধান জানিতে হইলে মন্ত্র-রহস্য অবগত হওয়া আবশ্যক।

পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে নিজের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া বা বিন্দুর উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টিক্ষেপই চৈতন্যশক্তির সঞ্চার। দৃষ্টিপাতের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মহামায়া সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। বিশুদ্ধ জড়শক্তির নাম মহামায়া। যে সকল অণুরূপী জীব পূর্বকল্পের সাধনা, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, বিবেকজ্ঞান প্রভৃতির ফলে অশুদ্ধ জড়শক্তিরূপা মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে, পরমেশ্বরের নিজ স্বরূপে উপনীত হইতে পারে নাই, তাহারা মহামায়ার গর্ভে বিদ্যমান থাকে। এই সকল জীবের অবস্থা সুষুপ্তিবৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। মায়া হইতে মুক্ত হওয়ার ফলে এই সকল জীবের যেমন অশুদ্ধ মায়িক দেহ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ থাকে না, তেমনি কোন উচ্চতর বিশুদ্ধ দেহও থাকে না। ইহারা মায়ার ঊর্ধ্বে, মহামায়ার গর্ভে লীন থাকে। মায়াগর্ভে অবস্থান যে প্রকার, মহামায়ার গর্ভে অবস্থানও অনেকটা সেই প্রকার—উভয়ের মধ্যে শুধু আবরণগত পার্থক্য আছে। অপ্রাকৃত দিব্য-অবস্থা বা ভাগবত অবস্থা অত্যন্ত দুর্লভ। চৈতন্যের বিকাশ ব্যতীত তাহার আবির্ভাব ঘটে না। উহাই পশুত্বের অতীত অবস্থা। মায়ার নিদ্রা এবং মহামায়ার নিদ্রা, উভয় স্থলেই পশুভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। পশুত্ব থাকা পর্যন্ত প্রকৃত জাগরণ কোথায়?

মহামায়ার বিশ্রান্তিকালে তদ্‌গর্ভনিহিত জীবসকল সুষুপ্ত থাকে। উহাদের জীবত্ব পশুত্বমূলক। চৈতন্যের উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা তিরোহিত হয় না। ঐ সকল বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে ভগবত্তা লাভের দুইটি অন্তরায় আছে। একটি আত্মার স্বরূপগত অণুত্ব বা পশুত্ব; ইহা অভিন্ন-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক চৈতন্যের স্বরূপের আচ্ছাদন। আর একটি মহামায়ার সম্বন্ধ। এই দুইটি আবরণ নিবৃত্ত হইলে শুদ্ধ ভগবত্তার অভিব্যক্তির পথ খুলিয়া যায়।

যখন সৃষ্টির আদিতে মহামায়াতে চৈতন্যশক্তির আধান হয়, তখন ঐ শক্তির ক্রিয়াবশতঃ মহামায়া ক্ষুব্ধ হইয়া কার্যোন্মুখ হয় এবং তাহাতে সুপ্তবৎ নিহিত অণুরূপী জীবসকলও জাগিয়া উঠে। নিদ্রাকালে ঐ সকল জীব বিদেহ অবস্থায় মহামায়াতে লীন থাকে, কিন্তু মহামায়া ক্ষুব্ধ হওয়ামাত্রই উহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। দেহসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন অণু কখনও জাগিতে পারে না। তাই মহামায়ার ক্ষোভের ফলে ক্ষুব্ধ মহামায়া হইতে ঐ সকল অণুর প্রয়োজনানুরূপ দেহ প্রভৃতি উৎপন্ন ও বিকশিত হয়। সুতরাং যখন তাহারা জাগিয়া উঠে, তখন আর তাহারা কেহই বিদেহ থাকে না—তাহারা মহামায়াজাত দেহ লইয়াই প্রকাশিত হয়।

মহামায়াতে চৈতন্যশক্তির আবেশ এবং ঐ সকল অণুতে চৈতন্যশক্তির সঞ্চার একই কথা, কারণ অণুসকল সুপ্ত অবস্থায় মহামায়ার সহিত অভিন্ন হইয়াই বিদ্যমান থাকে।

মহামায়ার গর্ভে অসংখ্য অণু বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাপ্রলয়ের অবস্থায় ইহারা সকলেই সমভাবে লীন থাকিলেও চৈতন্যশক্তির সম্পাতে সকলে সমভাবে প্রবুদ্ধ হয় না এবং হইতেও পারে না। কোন কোন অণুরই জাগরণ হইয়া থাকে—সকলের নহে। যদিও সকল অণুই মলবিশিষ্ট এবং চৈতন্য বা ভগবদনুগ্রহের আবশ্যকতা যদিও সকলেরই সমভাবে আছে তথাপি মলের পরিপক্বতা সকলের সমান নহে। যাহার মল যত বেশি পরিপক্ক তাহার মল তত বেশি পরিমাণে চৈতন্যশক্তির দিকে উন্মুখ হয়। মল অনাদি কাল হইতে আত্মাকে অণুরূপে পরিণত করিয়াছে। অণুত্বই পশুত্ব—ইহা আত্মার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম নহে। আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম শিবত্ব বা পূর্ণচৈতন্য। ইহা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির অভিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ। মল অনাদি হইলেও আগন্তুক। ইহা দ্বারা ঐ স্বরূপ আচ্ছন্ন থাকে। তখন শিবরূপী আত্মা জীব বা পশুরূপে পরিণত হয়। এই মল কালশক্তি দ্বারা নিরন্তর পরিপক্ব হইতেছে। সৃষ্টিকালে পরিপাকের অন্য উপায়ও যে না আছে তাহা নহে, তবে প্রলয়কালে ঐ উপায় কার্য করে না। পরিপক্বতার এমন একটি মাত্রা আছে যাহা প্রাপ্ত হইলে ঐ সকল অণু আপনা হইতেই চৈতন্যশক্তির অভিমুখে উন্মুখ হয়। আকাশস্থ সূর্যের কিরণ সমুদ্রের উপরে এবং কতকটা তলদেশ পর্যন্ত পতিত হয়, কিন্তু যে সকল জীব ঐ কিরণের সীমারেখা পর্যন্ত উপস্থিত হইতে না পারে, তাহারা আপাততঃ ঐ কিরণের ক্রিয়া হইতে মুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে যাহারা ঐ কিরণের স্পর্শ প্রাপ্ত হয়, তাহারা উহার প্রভাবে জাগিয়া উঠে এবং আপন মলপাকের মাত্রানুরূপ বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিয়া শুদ্ধ জগতে

সঞ্চরণ করিতে থাকে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অপকমল জীবসকলের সুষুপ্তি ভঙ্গ হয় না। সাধারণতঃ কল্পান্তরে তাহাও হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বলা বাহুল্য, এইস্থলে আমরা পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তির খেলার দিক্‌টার উল্লেখ করিলাম না। স্বাতন্ত্র্যশক্তির দিক্‌ হইতে বিচার করিলে মলের পরিপকতার উপরে চৈতন্যশক্তির সঞ্চার নির্ভর করে, একথা সর্বত্র সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এই স্থলে সাধারণ নীতির দিক্‌ই অনুসরণ করা হইয়াছে। যে সকল জীবের আলোকস্পর্শ হয় বলিয়া বলা হইল, তাহারা সকলেই পুরাতন জীব। তাহারা সংসারে পতিত হইয়াছিল এবং প্রত্যাবর্তন মুখে মায়া পর্যন্ত তত্ত্বভেদ করিয়া দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া মহামায়ার মধ্যে 'কেবলী' রূপে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মায়ারাজ্য ভেদ হইয়া থাকিলেও সম্পূর্ণরূপে বাসনামুক্তি হয় নাই, কারণ মায়াতীত বাসনা এখনও রহিয়াছে। মায়িক বাসনা ক্ষীণ করিবার জন্য মায়িক দেহ গ্রহণ করিয়া মায়িক জগতে কর্ম করিতে হয়। দেহ-গ্রহণ না করিলে বাসনা ক্ষয় হয় না। মায়াতীত বাসনা ক্ষয় করিতে হইলে তদনুরূপ দেহ গ্রহণ করিয়া তাদৃশ কর্ম সম্পাদন আবশ্যক। মায়িক বাসনা মলিন, কিন্তু মায়াতীত বাসনা বিশুদ্ধ। কর্তৃত্ব-অভিমানবশতঃ মায়িক জগতে কর্ম হয় এবং ভোক্তৃত্ব-অভিমানবশতঃ মায়িক জগতে ভোগ হয়। কর্মানুষ্ঠান ও কর্মফলভোগকেই মিলিতভাবে সংসার বলে। কিন্তু মায়াতীত বাসনার স্থলে কর্মের মূলেও অহংকার নাই এবং ভোগের মূলেও অহংকার নাই। এইজন্য উহাকে প্রকৃত সংসার বলা চলে না। সংসার বলিলে উহাকে শুদ্ধ সংসার বলা যাইতে পারে। এই মায়াতীত কর্মই 'অধিকার' এবং মায়াতীত ভোগই প্রকৃত ভোগ বা 'সম্ভোগ'। এই অধিকার ও ভোগের অতীত অবস্থা 'লয়'।

এখন প্রশ্ন ঃ এই মায়াতীত বাসনা বিদেহ অণুতে কি প্রকারে চরিতার্থ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, মায়াতীত বাসনা মায়াতীত দেহ দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। মায়িক বাসনার তৃপ্তি মায়িক উপাদান হইতে হয়, কিন্তু মায়াতীত বাসনার তৃপ্তি মায়িক উপাদান হইতে কি প্রকারে হইবে? এইজন্য যে মায়াতীত উপাদান আবশ্যক হয়, তাহার নাম মহামায়া। যখন চৈতন্যশক্তি মহামায়াকে স্পর্শ করে তখন পূর্ববর্ণিত পকমল জীবসকল জাগিয়া উঠে এবং ক্ষুব্ধ মহামায়া হইতে রচিত দেহ অধিষ্ঠান করিয়া আপন-আপন কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। মহামায়ার নামান্তর কুণ্ডলিনী শক্তি। পূর্বোক্ত পকমল সকল জীবের দেহাদি কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে রচিত। ঐ সকল জীব তখন আর জীবপদবাচ্য নহে। তাহারা জীব হইয়াও ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন।

পরমেশ্বরের করুণাদৃষ্টিরূপ চৈতন্যশক্তির সঞ্চারের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহা বস্তুতঃ চিৎশক্তিরই ক্রিয়াশক্তি-রূপে উন্মেষ। চিৎশক্তির সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুইটি অবস্থা আছে। বস্তুতঃ অবস্থা দুইটি না হইলেও কার্যগত ভেদের জন্য কৃত্রিমভাবে দুইটি বলা হয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে ক্রিয়ার অভাববশতঃ শক্তির সঞ্চার হয় না, সুতরাং এই শক্তিসঞ্চার বস্তুতঃ চিৎশক্তির ব্যাপার। ইহারই নামান্তর দীক্ষা। পরমেশ্বর স্বয়ং ক্রিয়াশক্তির প্রবর্তকরূপে চৈতন্যদাতা গুরু। পূর্বোক্ত পরিপক্ব-মল জীব সৃষ্টির আদিতে ঐ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মহামায়া হইতে উদ্ভূত বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিলে পরমেশ্বরের আদি শিষ্যরূপে শুদ্ধজগৎ বা মহামায়িক জগতে স্থিতি লাভ করে। আমরা যে মায়িক জগতের সহিত পরিচিত তাহার সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারের চরম ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত হয়। ইহারা জীব হইয়াও ঈশ্বরকল্প, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বর হইতে ন্যূন। কারণ ইহাদের শুদ্ধ বাসনা আছে, পরমেশ্বরের বাসনা নাই। সমষ্টিভাবে সমগ্র জগতের কল্যাণ কামনা—ইহাই শুদ্ধবাসনার স্বরূপ। আপাততঃ মনে হইতে পারে, বিশুদ্ধ বাসনার অতীত হইতে পারিলেই বিশুদ্ধ ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ঐটি বিশুদ্ধ কৈবল্য অবস্থা, ভগবদবস্থা নহে।

সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বরের চৈতন্যময়ী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে সকল জীব বিশুদ্ধ দেহ লাভ করে তাহারা সকলেই সমভাবাপন্ন নহে। তাহাদের মধ্যেও অবান্তর ভেদ আছে। এক হিসাবে সকলকেই এক স্তরের বলা অবশ্যই চলে; কারণ সকলের মধ্যেই চিৎশক্তির উন্মেষ রহিয়াছে। সকলেই শুদ্ধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ রাজ্যের অধিবাসী হইয়াছেন এবং ন্যূনাধিক ভাবে হইলেও সকলের মধ্যেই ক্রিয়াশক্তি জাগ্রৎ হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়াশক্তির বিকাশে তারতম্য আছে বলিয়া ইহাদের মধ্যে তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে শুদ্ধ-জগতের চেতনবর্গের মধ্যে যে বৈষম্য লক্ষিত হয়, তাহার মূল ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য। এই তারতম্য কেন হয়, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, অণুসকলের মল সমানরূপে পরিপক্ব থাকে না বলিয়াই, ভগবৎশক্তি অর্থাৎ পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তি সকলে সমানরূপে ধারণ করিতে পারে না। মল যে পরিমাণে পক্ব না হইলে চিৎশক্তির স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তাহা শুদ্ধ রাজ্যের সকলেরই আয়ত্ত বা অধিগত হইয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু এই পরিপক্বতার তারতম্য আছে। তদনুসারে যেখানে পরিপক্বতা অধিক সেখানে ক্রিয়াশক্তির আবেশ অধিক মাত্রায় হয়। মল পরিপক্ব না হইলে ক্রিয়াশক্তি ধারণ করা যায় না। এইজন্য অপক্বমল অবস্থায়, ক্রিয়াশক্তির সঞ্চার মোটেই হয় না। তাই মলপাক না হইলে শ্রীগুরু কখনই জীবকে অনুগ্রহ করেন না।

পক্বমল অণুসকলের মধ্যে যাহাদের মল সর্বাপেক্ষা অধিক পরিপক্ব, ক্রিয়াশক্তির আবেশ হইলে তাহাদের মধ্যে কর্তৃভাবের উদয় হয়। বলা বাহুল্য, ইহা শুদ্ধ কর্তৃত্ব। ইহাতে অহংকারের সম্বন্ধ থাকে না। ইহাদের নীচে বহুসংখ্যক পক্বমল অণু পূর্বোক্ত প্রণালীতে ভগবৎশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা চৈতন্য লাভ করে। ইহাদের ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি অপেক্ষাকৃত ন্যূন বলিয়া ইহাদের মধ্যে কর্তৃভাবের উন্মেষ না হইয়া করণভাবের উন্মেষ হয়। যে কয়েকজনের মধ্যে কর্তৃভাবের উন্মেষ হয় তাঁহারা একহিসাবে সজাতীয় হইলেও তন্মধ্যেও পরস্পর ন্যূনাধিক্য রহিয়াছে। তদ্রূপ কারণশক্তিময় সমষ্টিতেও পরস্পরের মধ্যে উক্তপ্রকার ন্যূনাধিক্য রহিয়াছে। যাঁহারা কর্তৃভাবাপন্ন তাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা করণ-ভাবাপন্ন তাঁহাদের অবলম্বন শুদ্ধ বিদ্যাতত্ত্ব। এই বিদ্যা মায়াতীত জ্ঞানস্বরূপ। যে কয়েকজন ঈশ্বরতত্ত্বে অবস্থান করেন তাঁহারা ঈশ্বর অথবা গুরু; যাঁহারা বিদ্যাতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহারা মন্ত্র অথবা দেবতা। এই সকল মন্ত্র ঈশ্বর অথবা গুরুর অধীন। ইঁহারা গুরুর দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া মায়িক জীবের উদ্ধারকার্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা স্বতঃপ্রেরিত হইয়া পূর্বোক্ত জীবোদ্ধারে ব্যাপৃত হইতে পারেন না, কারণ ইঁহারা করণ, কর্তা নহেন।

গুরু এবং দেবতা উভয়েই শুদ্ধদেহসম্পন্ন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহলাভে উভয়ের মধ্যে নিজ স্বরূপ-জ্ঞান জাগিয়া উঠিয়াছে। নিজের শিবত্ববোধরূপ জ্ঞানের উদয় উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে হইয়াছে। তবে গুরু কর্তৃভাব লইয়া এবং দেবতা করণভাব লইয়া কার্য করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া অন্য দিক্ হইতেও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য রহিয়াছে। যদিও পরমেশ্বরের অনুগ্রহশক্তি উভয়ের মধ্যেই পতিত হইয়াছে, তথাপি ব্যক্তিগত বিকাশের দিক্ দিয়া তারতম্য থাকিতে পারে। যে সকল আত্মা তত্ত্বভেদক্রমে ঊর্ধ্বগতির ফলে মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা মলপাকের দরুণ ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইলে দেবতা পদে আরূঢ় হয়। ইহাদের নাম মন্ত্র। আত্মিক বিকাশ এতটা না হইলে প্রকৃত দেবত্বলাভ হয় না। মায়ার অন্তর্গত দেবতার কথা আমরা বলিতেছি না। মায়াতীত দেবতার একমাত্র শুদ্ধ দেহই থাকে; অশুদ্ধ দেহ থাকে না। কিন্তু গুরুর অবস্থা অন্যপ্রকার। মল যদি অত্যন্ত পরিপক্ব হয় তাহা হইলে চৈতন্যশক্তির অবতরণ তাহাতে অবশ্যম্ভাবী এবং মলপাকের তীব্রতাবশতঃ কর্তৃভাবের আবেশ স্বাভাবিক। এই সকল অণু দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আচার্য অধিকার লাভ করিয়া থাকে। তত্ত্বভেদক্রমে আত্মিক বিকাশ ইহাদের যতটাই হউক, তাহাই যথেষ্ট। তিনি যে তত্ত্বে অবস্থিত, গুরুপদে অধিরূঢ় হইলে তাঁহার মায়িক দেহ সেই তত্ত্বেরই হইয়া থাকে। কিন্তু

ভগবদনুগ্রহের ফলে যে বিশুদ্ধ দেহ বা বৈন্দবদেহ প্রাপ্ত হয় তাহা গুরুপদবাচ্য সকল আত্মারই একপ্রকার। মায়াতত্ত্ব ভেদ না করা পর্যন্ত গুরুমাত্রেরই দুইটি দেহ থাকে। তন্মধ্যে একটি গুরুদত্ত শুদ্ধ দেহ, যাহা মহামায়া বা কুণ্ডলিনীর উপাদানে গঠিত এবং অপরটি নিজ নিজ মায়িক দেহ। এই দ্বিতীয় দেহ জীবের ক্রমবিকাশের মাত্রা অনুসারে কোন-না-কোন তত্ত্বে আশ্রিত থাকে; অর্থাৎ কাহারও মায়িক স্থূল দেহ পার্থিব, কাহারও জলীয়, কাহারও তৈজস, ইত্যাদি। দেহের বিকাশ বলিতে দেহের উপাদানকে নিম্নবর্তী তত্ত্ব হইতে ঊর্ধ্বতত্ত্বে পরিণত করা বুঝায়। কার্যের গতি কারণের দিকে এবং কারণের গতি তাহার স্বকারণের দিকে। এইপ্রকার পার্থিব দেহ জলীয়ে এবং জলীয় দেহ তৈজসে পরিণত হইতে পারে। ইহাই দেহের উপাদানগত উৎকর্ষ। ভগবানের অনুগ্রহ-লাভ এই তত্ত্বভেদরূপী উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে না। এই উৎকর্ষ প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের ফল। চৈতন্যশক্তির অবতরণ একমাত্র মলের পরিপক্বতার উপর নির্ভর করে। এইজন্য কেহ পৃথ্বীতত্ত্ব ভেদ না করিয়াও ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আবার কেহ মায়াতত্ত্ব অতিক্রম করিয়াও উহা প্রাপ্ত হন না। তত্ত্বভেদের উপর শক্তির অবতরণ নির্ভর করে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, অণু মায়াতত্ত্ব ভেদ করিলেও যতদিন মলপাক করণভাবের অভিব্যক্তির উপযোগী না হয়, ততদিন উহার উপর ভগবানের অনুগ্রহশক্তি সঞ্চারিত হয় না। ঐ সকল অণুকে কল্পান্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। কারণ, দেবদেহের রচনা সৃষ্টি-সময়ে হয় না, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে হইয়া থাকে। যদি মায়াভেদ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তো কোন প্রশ্নই নাই। কারণ, মায়াভেদ না করা পর্যন্ত কোন আত্মাতে মলপাকবশতঃ ভগবানের শক্তিলাভ হইলেও দেবত্বের আবির্ভাব সম্ভবপর হয় না। মায়াভেদের পর যে সকল আত্মা মলপাকের ফলে ভগবদনুগ্রহ লাভের যোগ্যতা লাভ করে, তাহাদের উপর কল্পান্তরে শক্তির অবতরণ হইয়া থাকে। বর্তমান কল্পে ঐ সকল আত্মা মহামায়াতে লীন থাকে।

সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, কোন বিশিষ্ট কল্পের আত্মা অনুরূপ মলপাক সত্ত্বেও সেই কল্পে দেবত্বলাভ করিতে পারে না। এমন কি, মায়াভেদ হইয়া গেলেও তাহা সম্ভবপর হয় না। তাহাকে মহামায়াতে কল্পান্তরের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিশ্রাম করিতে হয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গুরু সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। গুরুতে শক্তির অবতরণই প্রধান; অর্থাৎ যতটা মলপাক হইলে কর্তৃভাবের আবেশ দীক্ষাকালে সম্ভবপর হয়, তাহা হইবেই। মায়াভেদ না করিলেও ক্ষতি নাই। এমন কি কোন নিম্নবর্তী তত্ত্বে অবস্থান করিলেও ক্ষতি নাই। কারণ, গুরুভাবের অভিব্যক্তিতে জীবের স্বকৃত ঊর্ধ্বগতির মাত্রানির্দেশ আবশ্যক হয় না। ঠিক ঠিক মল পরিপক্ব থাকিলে স্বীয় বিকাশের

ফলে যে যেখানে আছে, সেখান হইতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়া শুদ্ধদেহ এবং আচার্যের অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে। তবে যদি তাহার মায়াতত্ত্ব ভেদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নূতন জন্মের প্রারম্ভ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়।

সর্বত্রই ইহা সত্য যে, দেবতা গুরুর অধীন। দেবতা স্বভাবতঃ মহামায়ার রাজ্যের অধিবাসী। কিন্তু গুরু মহামায়ার রাজ্যের অধিবাসী হইয়াও যুগপৎ মায়া রাজ্যের অধিবাসী হইতে পারেন। অবশ্য এই স্থলে সৃষ্টিকালীন গুরুর কথা বলা হইতেছে, যাঁহাদের মায়াদেহ এবং শুদ্ধদেহ দুইই আছে। সৃষ্টির অতীত গুরুদের কথা এখানে বলা হইতেছে না—তাঁহারা মায়াদেহ-বর্জিত এবং বিশুদ্ধ বৈন্দব দেহসম্পন্ন।

পূর্বোক্ত বিবরণে তত্ত্বভেদপূর্বক ঊর্ধ্বগতির কথা বলা হইয়াছে। ইহা একটু পরিষ্কার করিয়া আলোচনা না করিলে কাহারও বোধগম্য হইবে না। এইজন্য সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলিতেছি। সৃষ্টির মূল উপাদানস্বরূপ একটি বস্তু থাকে। আপাততঃ ইহাকে জড় বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। ইহার এক দিক্ (ভিতরের) শুদ্ধ এবং অপর দিক্ (বাহিরের) অশুদ্ধ। যতদিন সৃষ্টির উদয় না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই ভিতর-বাহির বিভাগটি বুঝিতে পারা যায় না। এমন কি, এই অচিৎস্বরূপ মূল উপাদানটি যে আছে, তাহাও জানিতে পারা যায় না। কিন্তু যখন সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বরের দৃষ্টি শুদ্ধাংশের উপর পতিত হয়, তখন উহা জ্যোতিরূপে উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠে, শুদ্ধের বাহিরে অশুদ্ধ অংশটি ছায়া বা অন্ধকাররূপ ঐ জ্যোতি-স্বরূপকে ঘিরিয়া থাকে। এই শুদ্ধাংশ বা জ্যোতিটি মহামায়া, বাহিরের ছায়াটি মায়া। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই উভয়ের মধ্যে একই অচিৎ-সত্তা রহিয়াছে ইহা ক্ষুব্ধ হইয়া স্তরে স্তরে তত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু এই সকল তত্ত্ব অচিতের মূল বিভাগ নহে। অচিতের মূল বিভাগ পাঁচটি কলা। ইহার মধ্যে শুদ্ধাংশে দুইটি এবং অশুদ্ধাংশে তিনটি কলা অবস্থিত। প্রত্যেকটি কলা অবান্তর ভাবে তত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত হয়। তদনুসারে জ্যোতির্ময় রাজ্যে পাঁচটি তত্ত্ব এবং মায়া বা ছায়া রাজ্যে একত্রিশটি তত্ত্ব অভিব্যক্ত আছে। পাঁচটি কলাই পরপর অধিকতর বহির্মুখ। তদ্রূপ উহা হইতে অভিব্যক্ত তত্ত্বগুলিও উহারই ন্যায় পরপর অধিকতর বহির্মুখ। যেখানে বহির্মুখতার পরাকাষ্ঠা তাহার নাম পৃথিবী। তদ্রূপ যেখানে অন্তর্মুখতার চরম সীমা, তাহার নাম শিব বা মহামায়া। বস্তুতঃ ইনিই কুণ্ডলিনীস্বরূপ। এই শিব শিব-নামে পরিচিত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে বিশুদ্ধ জড়বস্তু। ইহারই নাম আদিতত্ত্ব বা বিন্দু। তত্ত্বাতীত শিব বা পরমেশ্বর ইহা হইতে পৃথক্।

এই তত্ত্বগুলি স্তরে স্তরে সাজানো হইয়াছে। বিশ্বের সর্বত্রই এই ক্রমবিন্যাস দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি তত্ত্ব হইতে কতকগুলি ভুবনের আবির্ভাব হয়। ভুবনগুলি তত্ত্বের ন্যায় গুণ, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতির বিকাশের তারতম্য অনুসারে অধঃ-ঊর্ধ্ব ভাবে পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছে। ঊর্ধ্ব প্রদেশ হইতে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম প্রদেশ পর্যন্ত এই সকল ভুবনের সমষ্টি জীবের নিকট বিশ্ব নামে পরিচিত। জীব আপন আপন অধিকার ও যোগ্যতা অনুসারে প্রতি স্তরেই বিদ্যমান আছে। জীব সৃষ্টিকালে অর্থাৎ বিশ্বমধ্যে অবস্থানকালে দেহযুক্ত হইয়াই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু প্রলয় অবস্থায় জীবের দেহ থাকে না। তখন জীব মায়াতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে লীন হইয়া সুষুপ্তবৎ অবস্থান করে, অথবা যদি কোন কৌশলে মায়াভেদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহামায়ার মধ্যে সুষুপ্তবৎ লীন থাকে। মায়ার মধ্যে যে একত্রিশটি তত্ত্ব আছে, তাহার প্রত্যেকটিকে আশ্রয় করিয়া জীব আছে ও থাকিতে পারে। এই সকল তত্ত্বের মধ্যে জন্য-জনক ভাব অথবা অধঃ-ঊর্ধ্ব বিভাগ আছে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। তদনুসারে তত্ত্ববর্তী জীবসমূহেরও শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ শ্রেণীবিভাগ তত্ত্বের আপেক্ষিক উৎকর্ষমূলক। উহা হইতে জীবের স্বকীয় উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রলয় জড়ের ক্রিয়াসাপেক্ষ —উহা জীবের সাধনার অধীন নহে। যখন উপাদানের মধ্যে বহির্মুখ প্রেরণা আসে, তখন সৃষ্টির দিকে প্রবৃত্তি হয়। পক্ষান্তরে যখন উপাদানের মধ্যে সংকোচ ভাব আসে, তখন ঐ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে এবং চরম অবস্থায় মূল উপাদানরূপে কেন্দ্রে স্থিতি হয়।

অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে যে সকল জীব এই মূল উপাদান অতিক্রম করিয়া মহামায়াতে অবস্থান করে তাহাদের মধ্যে মলপাকের তারতম্যে কেহ কেহ নবীন সৃষ্টিতে দেবভাবে আবির্ভূত হয়। ইহাদের দেহ বৈন্দব। অবতরণ মুখেও একপ্রকার দেবভাবের আবির্ভাব হয়। তাহারা স্বভাবতঃই মায়াতীত তাই তাহারা শুদ্ধ হইলেও ক্রমবিকাশের নিয়মের অধীন নহে। তাহারা একপ্রকার অব্যক্তভাবাপন্ন। বলা বাহুল্য, উভয়ই মায়ার অতীত ভূমির কথা।

ঠিক এই প্রকার অশুদ্ধ অথবা মায়িক দেবতাও আছে। ইহার রহস্য বুঝিতে পারিলে শাস্ত্রবর্ণিত আজান দেবতা, কর্মদেবতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দেবতার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শক্তিপাতরহস্য

এক

শ্রীভগবানরূপী শ্রীগুরুর শক্তিপাত বা কৃপা সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা আবশ্যক। আত্মার স্বরূপাবস্থান অথবা মোক্ষপ্রাপ্তিই মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ধারণাশক্তির অভাবে সাধারণ লোক ইহা স্বীকার না করিলেও ইহার সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস না করিবার কারণ নাই। যথাসময়ে এই সত্য সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। যতদিন মানুষ নিজের স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে না পারে, অন্ততঃ স্থিতিলাভের সত্যমার্গে পদার্পণ করিতে না পারে ততদিন তাহাকে তাহার শুভাশুভ কর্মের অধীন থাকিয়া সুখদুঃখরূপ ফলভোগের জন্য অনুরূপ বিবিধ ভোগস্থানে গমন এবং ভোগায়তন দেহ গ্রহণ করিতেই হইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে জন্মমরণের চক্রে নিরন্তর আবর্তন করিতেই হইবে। ইহারই নাম সংসার। স্বরূপে স্থিতিলাভ না করা পর্যন্ত ইহা হইতে মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

তবে কি স্বরূপস্থিতির কোন উপায় নাই? আছে, অবশ্যই আছে এবং জীব উহা প্রাপ্ত হইতেও পারে। যখন জীব উহা প্রাপ্ত হয় তখন ঐ উপায়ের তারতম্য অনুসারে, শীঘ্র অথবা বিলম্বে, ক্রম অবলম্বনপূর্বক অথবা অক্রমে, সে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া নিজের পূর্ণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আত্মার এই পূর্ণস্বরূপই ভগবৎতত্ত্ব অথবা পূর্ণ ব্রহ্মভাব জানিতে হইবে।

তান্ত্রিক আচার্যগণের পরিভাষাতে এই উপায়ের নাম শক্তিপাত। ইহার নামান্তর কৃপা অথবা ভগবদনুগ্রহ। ইহা ব্যতীত কেবলমাত্র পৌরুষপ্রযত্ন হইতে ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। বস্তুতঃ ভগবন্মুখী বৃত্তির মূলে সর্বত্রই ভগবৎকৃপার প্রভাব স্বীকার করিতেই হয়। কারণ, তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার দিকে চিত্তের গতিই হইতে পারে না।

শক্তিপাত অথবা কৃপা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুস্থলে বহু আলোচনা করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় 'নোষ্টিক' (Gnostic) প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থেও এই বিষয়ে বহু বিবরণ দৃষ্ট হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা শুধু তন্ত্রশাস্ত্রের দিক্ হইতে এই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

দুই

শক্তিপাত অথবা কৃপা কখন ও কেন হয় ইহার উত্তর বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্নপ্রকারে প্রদত্ত হয়।

কাহারও কাহারও মতে জ্ঞানের উদয় হইলে শক্তিপাত হয়। অজ্ঞানে সংসারের উদ্ভব হয় এবং জ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া শক্তিপাত ঘটে। জ্ঞানাগ্নি সকলপ্রকার কর্ম ভস্মসাৎ করিয়া শক্তিপাতের ভূমি রচনা করে। ইঁহারা বলেন যে কর্মফলের ভোগ ক্রমশঃ হোক্ অথবা অক্রমে হোক্, উহার দ্বারা কর্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভোগ ক্রমশঃ হয় ইহা স্বীকার করিলে কর্মান্তরের প্রসঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে। সুতরাং নিরন্তর নূতন কর্ম হইতে থাকে বলিয়া কোন সময়েই সমস্ত কর্মের ক্ষয় হইতে পারে না এবং কর্মফলভোগকে ক্রমিক না মানিয়া যুগপৎ মানিলেও এই সন্দেহের নিবৃত্তি হয় না। ক্রমশঃ ফল দেওয়াই কর্মের স্বভাব। একই সময়ে সকল কর্মের ফলভোগ হয়, ইহা স্বীকার করিলে কর্মের স্বভাবই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু স্বভাবের নাশ কখনও সম্ভব নহে। তাই যে কোন প্রকারে হোক্ ভোগদ্বারা কর্মক্ষয় হওয়া সংগত হয় না। সেইজন্য জ্ঞানবাদী আচার্যগণের মতে জ্ঞানকেই কর্মক্ষয়ের কারণ স্বীকার করিয়া উহার সঙ্গে শক্তিপাতের কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়।

কিন্তু এই জ্ঞানের আবির্ভাব কি প্রকারে হয় তাহার ঠিক ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। যদি কর্মকে জ্ঞানের কারণ মানা হয় তাহা হইলে জ্ঞানকে কর্মের ফল স্বীকার করিতে হয়। এই অবস্থায় জ্ঞান ও কর্মফল সমানার্থক হইয়া পড়ে এবং জ্ঞানীকে কর্মফলভোগী বলিয়া মনে করিতে হয়। অতএব জ্ঞানোদয়বশতঃ শক্তিপাত স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে ভোগের মধ্যেও শক্তিপাত মানা আবশ্যক হয়। তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ আসে। কেহ কেহ বলেন যে জ্ঞান কর্মের ফল হইলেও ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ তাহাতে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। স্বর্গাদিরূপ কর্মফল কর্মান্তরকে দগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু জ্ঞান স্বয়ং কর্মফলাত্মক হইলেও কর্মান্তরকে দগ্ধ করে। ইহাই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। এই মতে জ্ঞানোদয়ে অন্যোন্যাশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানোদয় হইতে ঈশ্বরেচ্ছার নিমিত্ততার অনুমান এবং ঈশ্বরেচ্ছার অনুমান হইতে জ্ঞানোদয়—এইপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয় ও ব্যর্থতা দোষ আসে এবং ঈশ্বরে রাগাদিপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ আসে। এইজন্য এই মত গ্রাহ্য নহে।

তিন

কোন কোন আচার্যের মত এই যে শক্তিপাতের প্রকৃত কারণ জ্ঞান নহে কিন্তু কর্মসাম্য। দুইটি সমান বলশালী কর্মের পরস্পর প্রতিবন্ধবশতঃ কর্মের সাম্য হয়, এই সাম্য হইতেই শক্তিপাত হয়। ক্রমিক ভোগের প্রভাবে বহু কর্ম ক্ষীণ হইয়া গেলে কোন অনিশ্চিত সময়ে যদি পরিপক্ব ও সমান বলবিশিষ্ট বিরুদ্ধকর্ম ফলোৎপাদনে রুদ্ধ হয় অর্থাৎ নিজ নিজ ফল প্রদান না করে বা নিয়ত ভোগবিধান না করে এবং তাহার পরবর্তী সকল কর্ম অপরিপক্ব থাকার দরুণ ভোগোন্মুখ না হয় তাহা হইলে এইপ্রকার বিরুদ্ধ কর্মের সাম্যভাব ঘটিয়া থাকে।

এই মতের বিরুদ্ধে ইহাই বক্তব্য যে যদি কর্মকে ক্রমিক মানা হয় তাহা হইলে উহার ফল দানও ক্রমিক মানিতে হইবে। এই অবস্থাতে যে কোন দুইটি কর্মের পরস্পর বিরোধ কি প্রকারে সম্ভব? এক কর্মের স্বরূপে দ্বিতীয় কর্মের স্থিতি তো হইতে পারে না। এইজন্য যে কোনপ্রকার বিরুদ্ধ কর্মের এক সঙ্গে থাকাই সম্ভব নহে। এই আলোচনা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে কর্ম সর্বথা ক্রমের অধীন। দুইটি কর্মের পরস্পর বিরোধ বলিতে ইহাই বুঝা উচিত যে এই দুইটির মধ্যে একটি অপরটির ফলকে বাধা দেয়, যাহার জন্য যে-কোন ক্ষণে ইহাদের যুগপৎ প্রবৃত্তির উদয় হয় না। আরও একটি কথা আছে। বিরোধ স্বীকার করিলেও ইহা স্বীকার্য যে ঐ সময়ে একটি দ্বিতীয় অবিরুদ্ধ কর্ম ভোগাত্মক ফল দিতে থাকে। যদি ঐ অবস্থাতে কোনও অবিরুদ্ধ কর্মের প্রবৃত্তি স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে ঐ ক্ষণেই দেহপাত হওয়ার কথা; কারণ ভোগায়তন দেহ একটি ক্ষণও ভোগ ব্যতীত থাকিতে পারে না। যদি বলা যায় যে জাতি ও আয়ুঃ এই দুইটি ফলদাতা কর্ম প্রতিবন্ধ হয় না, কেবল ভোগপ্রদ কর্মই প্রতিবন্ধ হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে—যদি জাতি ও আয়ুপ্রদ কর্ম থাকা সত্ত্বেও শক্তিপাত হইতে পারে তবে ভোগপ্রদ কর্ম থাকিতে শক্তিপাত হইতে পারে না, ইহার কারণ কি?

চার

দ্বৈতবাদী তান্ত্রিক আচার্যগণের মত এই যে জ্ঞান অথবা কর্মসাম্য শক্তিপাতের কারণ নহে—শক্তিপাতের প্রকৃত কারণ মলপাক। ইঁহারা বলেন—

পরস্পরবিরোধেন নিবারিতবিপাকয়োঃ।
কর্মণোঃ সন্নিপাতেন শৈবী শক্তিঃ পতত্যসৌ ॥১

দুইটি বিরুদ্ধকর্মের মধ্যে দুইটিই ধর্মাত্মক হইতে পারে, যেমন একটি স্বর্গপ্রাপক এবং অপরটি ব্রহ্মলোকপ্রাপক কর্ম ; দুইটিই অধর্মাত্মক হইতে পারে, যেমন একটি অবীচি নরকপ্রাপক এবং অপরটি রৌরব নরকপ্রাপক কর্ম ; অথবা একটি কর্ম ধর্মরূপ এবং অপরটি অধর্মরূপ হইতে পারে, যেমন—অশ্বমেধ ও ব্রহ্মহত্যা। এইপ্রকার দুইটি বিরুদ্ধকর্মের সন্নিপাত হইলেও শিবত্বদায়িনী অনুগ্রহ শক্তির পাত আত্মাতে হয় না। মলপাক না হইলে শক্তিপাত হইতেই পারে না। মতঙ্গাগমে আছে—মলপাকের অবিনাভূত দীক্ষা কর্মক্ষয়দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু হয়। কিরণাগমে আছে—

অনেকভবিকং কর্ম দগ্ধবীজমিবাগ্নিভিঃ।
ভবিষ্যদপি সংরুদ্ধং যেনেদং তদ্ধি ভোগতঃ ॥২

মলপাকবশতঃ অনুগ্রহশক্তির পাত হয়। শক্তিপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মলের আবরণ সরিয়া যায় এবং নিত্যসত্য বিশুদ্ধ সর্বজ্ঞত্বাদিময়৩ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ শান্ত ও নির্মল আত্মার স্বরূপসাক্ষাৎকার ঘটে। একই পরমেশ্বর জীবের বন্ধনও করেন, মোক্ষও করেন। যেমন একই সূর্য আপনার সান্নিধ্য-দ্বারা দ্রবীভূত হওয়ার যোগ্য মোমকে দ্রবীভূত করে ও শুষ্ক হওয়ার যোগ্য মৃত্তিকাকে শুষ্ক করে, সেইপ্রকার একই পরমেশ্বর মোক্ষাধিকারী পক্বমল জীবের জন্য মোক্ষদানের ব্যবস্থা করেন, বন্ধনযোগ্য অপক্বমল জীবের মলপাকের জন্য উহার বন্ধনের ব্যবস্থা করেন। মলপাকবশতঃ উপকার ও অপকাররূপ কর্মে সাম্যবুদ্ধি হয়—তখন মোক্ষ হয়। সকলপ্রকার কর্মের সাম্য হইলে বিজ্ঞান-কৈবল্যমাত্র সিদ্ধ হয়, মোক্ষ হয় না। যথার্থ কর্মসাম্যের কারণ মলপাক। তাই মলপাকবশতঃ দীক্ষাপ্রভাবে মোক্ষলাভ হয়। পরমেশ্বর নিত্যনির্মল সর্বজ্ঞ ও

১ যে সকল কর্মের ফলদান পরস্পর বিরোধবশতঃ রুদ্ধ আছে, উহাদের সন্নিপাত হইলে শৈবীশক্তিপাত হয়।

২ বহুজন্মের সঞ্চিত কর্ম অগ্নিতে ভর্জিত বীজের ন্যায় দগ্ধ হয়। ভাবী কর্মের ফলোৎপাদিকা শক্তি রুদ্ধ হয়, এবং যে কর্ম হইতে এই জন্ম হইয়াছে সেই কর্মের অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের ভোগ দ্বারা ক্ষয় হয়।

৩ সর্বজ্ঞত্ব, সর্বকর্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম শুদ্ধ ও অশুদ্ধভেদে দুই প্রকার। অপরামুক্তিতে অর্থাৎ আধিকারিক শিবাবস্থাতে এইসকল ধর্ম স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেও কিঞ্চিৎ ভিন্নবৎ প্রতীত হয়। কিন্তু পরামুক্তি অথবা পরম শিবাবস্থাতে শিব ও শক্তিতে পূর্ণ সামরস্য হইয়া যায় বলিয়া এইসকল ধর্ম স্বরূপ হইতে সর্বথা অভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।

সর্বকর্তা, কিন্তু পশুআত্মা মল, মায়া ও কর্মরূপ পাশে বদ্ধ। পরমেশ্বর কৃপা করিয়া উহার এইসকল পাশ বা বন্ধন ছিন্ন করিয়া উহাকে নিজের মতন করিয়া লন। ইহারই নাম শিবসাধর্ম্যের অভিব্যক্তি। ইহাই মোক্ষ। কিন্তু যতক্ষণ পশুর চৈতন্যের উপরোধক অনাদি মলের অধিকার নিবৃত্ত না হয় ততদিন অনুগ্রহের প্রবৃত্তিই হয় না।

মৃগেন্দ্র আগমে আছে—

তমঃশক্ত্যধিকারস্য নিবৃত্তেস্তৎপরিচ্যুতৌ।
ব্যনক্তি দৃক্ক্রিয়ানন্ত্যং জগদ্বন্ধুরণোঃ শিবঃ ।।

তমঃশক্তি রোধশক্তি বা তিরোধানের নামান্তর। যতদিন এই শক্তির অধিকার থাকে[৪] ততদিন উদ্ধারের কোন উপায় নাই। অনাদিমল ক্রমশঃ ধীরে ধীরে পক্ব হইতেছে, পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। পরিপক্বতা পূর্ণ হইলে উহার নিবৃত্তির সময় উপস্থিত হয়। চক্ষুতে ছানি পড়িলে অস্ত্রোপচারের দ্বারা উহাকে দূর করিতে হয়। কিন্তু যতদিন উহা ঠিক ঠিক পক্ব না হয় ততদিন অস্ত্রপ্রয়োগ চলে না। অপক্ব মলকে টানিয়া সরাইবার চেষ্টা করিলে জীবের সর্বনাশ ঘটে। এইজন্য মঙ্গলময় ভগবান এইপ্রকারে বলপ্রয়োগ করেন না। তিনি মলপাকের জন্য অবসর প্রতীক্ষা করেন এবং মল পরিপক্ব হইলে দীক্ষার দ্বারা উহা অপসারণ করেন। তাঁহার জীবোদ্ধারের ক্রম ইহাই।

এই মতে মল দ্রব্যাত্মক বলিয়া ক্রিয়ার দ্বারা উহার নিবৃত্তি স্বীকার করা হয়। অবশ্য এই ক্রিয়া জীবের ব্যাপার নহে, ঈশ্বরের ব্যাপার। ইহাই দীক্ষা। কিন্তু মলপাক না হওয়া পর্যন্ত ইহার প্রবৃত্তি হয় না। মলপাকের জন্যই ভগবান্ জীবকে অলক্ষিতভাবে অনাদি কর্মভোগাত্মক সংসারে নিক্ষেপ করেন। ভগবানের এই কৃত্যের নাম তিরোধান বা রোধ। বস্তুতঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার তিনটি ব্যাপারই তিরোধানেরই প্রকারভেদ, তিনটিতেই তিরোধান অনুস্যূত থাকে। মলের ন্যায় মায়া ও কর্মের পাকও আবশ্যক। মায়াপাকের উদ্দেশ্য মায়ার শক্তিসকলকে অভিব্যক্তির যোগ্য করা। এইপ্রকার কর্মও পক্ব হইলে নিজ নিজ ফল দিতে সমর্থ হয়। অপক্ব কর্ম ফলদান করিতে পারে না। সকল পাশেরই পাক বা পরিণাম পরমেশ্বরের সামর্থ্য বা স্বাতন্ত্র্য হইতে হয়। বহু জন্মের বাসনা ও পুণ্যপ্রভাবে যে কোন সময়ে বা যে কোন আশ্রমে অবস্থান-কালে অচিন্ত্য ভাগ্যোদয়বশতঃ কোন কোন আত্মার চৈতন্যশক্তির অনাদি

৪ আবরণশক্তির অধিকার নিবৃত্ত হইলে ঐ শক্তির ক্ষয় হয়। তখন জগদ্বন্ধু পরমেশ্বর পশু বা বদ্ধজীবের প্রতি তাঁহার অনন্ত জ্ঞানক্রিয়া অভিব্যক্ত করেন অর্থাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন।

আবরণভূত মল কিঞ্চিৎ পক্ব হইলে তদনুরূপ শক্তিপাত ঘটিয়া থাকে। ইহাকেই প্রচলিত ভাষাতে ভগবৎ কৃপা বলা হইয়া থাকে। ইহার মাত্রানুসারে ভগবানের প্রতি ভক্তিগ্রন্থাদি উৎপন্ন হয়। তখন ঐ শক্তিপাতের অনুরূপ দীক্ষার অবসর আসে। শক্তিপাতের তারতম্যবশতঃ দীক্ষার ভেদ হয়। এইমতে শক্তিপাতের তারতম্যের মূলে মলপাকের বিভিন্নতা জানিতে হইবে।

বলা বাহুল্য যে মলপাকের সিদ্ধান্ত হইতেই অনুগ্রহতত্ত্বের চরম রহস্য খোলে না। ভেদবাদী আচার্য মলের নাশ স্বীকার করেন না, কারণ মল এক বলিয়া উহার নাশ স্বীকার করিলে এক আত্মা মলহীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকল আত্মারই মলহীন হইবার প্রসঙ্গ উঠে। তাহা হইলে একজনের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুক্তি হইবার কথা। তাই ইঁহারা বলেন যে মলের পাকই হয়, নাশ হয় না। পাক মানে নিজ শক্তির প্রতিবন্ধ। প্রকৃত কথা এই যে এই-প্রকার বিচারেও পূর্বোক্ত দোষ নিবৃত্তি হয় না। অথবা অগ্নির নিজ শক্তি স্তম্ভিত হইলে যেমন উহা সকলের জন্যই সমান হয়, তেমনি মলের পাক মানিলেও মল অভিন্ন বলিয়া সকলের পক্ষে ঐ পাক সমান জানা আবশ্যক। আর এক কথা ঃ পাকের হেতু কি? কর্ম অথবা ঈশ্বরেচ্ছা হইতে পারে না। কারণ কর্ম কেবল ভোগের কারণ হয়, অন্য কোন কার্যের কারণ হয় না। ঈশ্বরেচ্ছা যদি হয় তবে প্রশ্ন এই, উহা স্বতন্ত্র অথবা পরতন্ত্র? পরতন্ত্র হইলে কর্মাদি অন্য কোন নিমিত্তের অপেক্ষা থাকে। তাহা হইলে তো পূর্বোক্ত দোষ থাকিয়াই যায়। পক্ষান্তরে যদি ঈশ্বরেচ্ছা স্বতন্ত্র হয় তাহা হইলে এই স্বতন্ত্রেচ্ছার ফলস্বরূপ মলপাক সকলেরই সমান হইবার কথা। ঈশ্বরে রাগ-দ্বেষ নাই। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ কাহারও মল পক্ব হয়, কাহারও হয় না, অথবা কাহারও শীঘ্র হয়, কাহারও বিলম্বে হয়, এই বৈষম্যের কারণ কি? বৈষম্য বা পক্ষপাত-দোষ ঈশ্বরে হইতে পারে না। অবশ্য এই আলোচনা দ্বৈতদৃষ্টি হইতে করা হইতেছে। অতএব বুঝা যায় যে মলপাকের কোন হেতু নাই, অথচ উহাকে অহেতুকও বলা চলে না। বিনা কারণে কার্যসিদ্ধি মানিলে সংশয় থাকে—এতদিন পর্যন্ত মলপাক হয় নাই কেন? বস্তুতঃ অহেতু পক্ষে মলের স্থিতিই হইতে পারে না। অতএব শক্তিপাত বিষয়ে মলপাককেও চরম সিদ্ধান্ত মানা যাইতে পারে না।

পাঁচ

পূর্বোক্ত কারণে কর্মসাম্যাদি কোন মতই সমীচীন মনে হয় না। অদ্বয় দৃষ্টিই চরম দৃষ্টি। তদনুসারে পরমেশ্বর অদ্বয় ও স্বাতন্ত্র্যময়। এই মতানুসারে শক্তিপাতের বিবরণ এই বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত।

পরমেশ্বর স্বভাবতঃ নিয়তক্রম ও অনিয়তক্রম উভয় কোটি স্পর্শ করিয়া প্রকাশমান হন। তাই শাস্ত্রে তাঁহাকে স্বচ্ছন্দ বলা হয়। তাঁহার নিজ ভাব বা ইচ্ছাই স্বভাবপদবাচ্য। যখন তিনি কর্ম ও ফলের পরস্পর সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়া অবান্তরস্থিতিকালে সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও সংহার ব্যাপার করেন তখন তাহাকে নিয়তক্রম বলা হয় অর্থাৎ ইনি নিয়ম বা কার্যকারণ ভাব আশ্রয় করিয়া কার্য করেন, এইরূপ বলা হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃত্যণ্ড ও মায়াণ্ডের সৃষ্টিতে কর্ম ও ফলের নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু শাক্ত মহাসর্গে অর্থাৎ শাক্তাণ্ডের সৃষ্টিতে তিনি সর্বথা নিরপেক্ষ ও পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র থাকেন। ঐস্থলে কর্মফলাদি কোন নিয়মের অধীন হইয়া তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন না। ইহাই পরমেশ্বরের অনিয়তক্রম প্রকাশ। মহাসর্গে সৃষ্টি ও সংহার অনন্ত। শক্তি পর্যন্ত অধ্বার অর্থাৎ শাক্তাণ্ডের সৃষ্টিতে জগতের অসংখ্য সৃষ্টিসমূহ অন্তর্ভূত থাকে। ইহা শাক্ত মহাসৃষ্টি। ইহা প্রাক্তন কর্মের ফলরূপে প্রাদুর্ভূত হয় না। তাই ইহাতে কর্মের অপেক্ষায় নিয়তির পরিগ্রহ হয় না। মায়ার ঊর্ধ্বে কর্ম থাকিতে পারে না ইহা বলাই বাহুল্য অর্থাৎ অবান্তর সৃষ্টিতেও বা ব্রহ্মাণ্ডাদিতেও পরমেশ্বর নিয়তির অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্র। তাঁহার নিয়তি ত্যাগ ও নিয়তিগ্রহণ এইপ্রকারে হয়ঃ যখন তিনি নিয়তির দ্বারা অর্থাৎ নিজ স্বরূপ আস্বাদন করিয়া ভোক্তারূপে দুঃখমোহাদি ভোগ করেন তখন কর্মফলক্রম অর্থাৎ নিয়তিকে গ্রহণ করেন। আর যখন তিনি অনপেক্ষ বলিয়া কর্মের নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করিয়া তিরোধান কালে দুঃখমোহাদির সম্বন্ধ অবভাসন করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি স্বতন্ত্র ও নিয়মত্যাগী। এই যে তিরোধানের কথা বলা হইল ইহা একপ্রকারে তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত আত্মগোপনমাত্র। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-কালে কুশল নট যেমন করেন ইহা সেইপ্রকার। তিরোধানের কারণ প্রাক্তন কর্মাদি হইতে পারে না। কর্ম হইতে জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ ফল উৎপন্ন হয়, তিরোধান হয় না। পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই ইহার একমাত্র কারণ। অন্য কোন কারণ নাই। মনে রাখিতে হইবে ইহা অদ্বৈত দৃষ্টি হইতে আলোচনা। দ্বৈতসম্মত স্বতন্ত্র ঈশ্বরেচ্ছাতে যে দোষ হয় ইহাতে তাহার প্রসঙ্গ হয় না; কারণ এই মতে মূলতত্ত্ব অদ্বৈত বলিয়া রাগদ্বেষাদি প্রসঙ্গ উঠে না। অর্থাৎ কর্মাদিনিরপেক্ষভাবে কেবল ভগবদিচ্ছা হইতেই অনুগ্রহ জন্মে— ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ শক্তিপাত কর্মসাম্য, মলপাক প্রভৃতির অধীন নহে, কিন্তু নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র। পুরাণাদিতেও এইপ্রকার মত পাওয়া যায়: 'তস্যৈব তু প্রসাদেন ভক্তিরুৎপদ্যতে নৃণাম্'।

মহামাহেশ্বরাচার্য উৎপলদেব ভগবানের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

শক্তিপাতসময়ে বিচারণম্ প্রাপ্তমীশ ন করোষি কর্হিচিৎ।[৫]
অদ্য মাং প্রতি কিমাগতং যতঃ স্বপ্রকাশনবিধৌ বিলম্বসে ॥

অর্থাৎ হে ভগবন্! তুমি শক্তিপাতের সময়ে অর্থাৎ জীবের প্রতি কৃপা করার সময়ে ন্যায়তঃ উচিত হইলেও কখনও পাত্র-অপাত্রের বিচার কর না। তবে আজ আমাতে এমন কি নূতন ব্যাপার ঘটিয়াছে যার ফলে আমার প্রতি আত্মপ্রকাশন বিষয়ে বিলম্ব করিতেছ?

শক্তিপাতে মায়াণ্ডগত কর্মাদির ব্যাপার থাকে না ইহা সত্য, কারণ কর্মাদি জীবকে মায়াতে আবদ্ধ রাখে। তাই মায়া হইতে অব্যাহতি ঘটে না। শক্তিপাত সর্বথা মায়ানিরপেক্ষ। অতএব যে সকল দেবতা মায়ামধ্যে বা মায়ার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন তাঁহারা নিজ নিজ অধিকার-সমাপ্তির পর অকস্মাৎ কর্মাদি-নিরপেক্ষ ভগবদনুগ্রহ হইতেই ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন। যাহারা মায়াক্রান্ত নহে তাহারা কর্মাদির অধীন নহে। কেবল শক্তিপাতের প্রভাবে তাঁহারা ভোগ অথবা মোক্ষরূপ সিদ্ধি লাভ করেন। কেহ কেহ শংকা করিতে পারেন যে, এইসকল শুদ্ধাত্মা যখন পূজা, ধ্যান, দেবারাধন প্রভৃতির প্রভাবে মায়াতীত শুদ্ধ অবস্থা—মন্ত্রত্ব, মন্ত্রেশ্বরত্ব ইত্যাদি—লাভ করেন তখন বলিতেই হইবে যে ইহাও একপ্রকার কর্মেরই ফল। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে, কারণ কর্মাদি যাবতীয় উপায় মায়ারই অন্তর্গত।

ঈশ্বরভাব কিন্তু মায়ার অতীত। তাই মায়াতীত বস্তুর ধ্যান-জপাদি বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত হওয়া মায়ামগ্ন আত্মার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? কর্ম, কর্ম-সাম্য, বৈরাগ্য, মলপাক প্রভৃতি কোনও মায়িক ব্যাপার ইহার কারণ হইতে পারে না। তাই স্বতন্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই কারণ বলিতে হয়। নিরপেক্ষ শক্তিপাতবাদীদের ইহাই সিদ্ধান্ত। জপ ধ্যান প্রভৃতি কর্ম নহে, কিন্তু ক্রিয়া। কর্মশব্দ দ্বারা এমন পদার্থ বুঝায় যাহা পরিমিত ভোগ উৎপাদন করিয়া ভোক্তার পূর্ণরূপ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপকে তিরোহিত করে অর্থাৎ উহাকে চিত্তরূপে সংকুচিত করিয়া আচ্ছাদিত করে। সিদ্ধান্তদৃষ্টিতে

৫ এই শ্লোকে 'প্রাপ্তম্' ও 'কর্হিচিৎ' এই দুইটির শব্দের প্রয়োগ হইতে মনে হয় যে শক্তিপাত নিরপেক্ষ, সুলভ ও রাগাদি প্রসঙ্গের লেশহীন। মতঙ্গাগমের টীকাকার অনিরুদ্ধও শক্তিপাতবিষয়ে নিরপেক্ষতাসিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

স্থাবরান্তমপি দেবস্য স্বরূপোন্মীলনাত্মিকা।
শক্তিঃ পততি সাপেক্ষা ন ক্বাপি...... ॥

এখানে "স্থাবরান্ত" বলাতে মনে হয় যে অত্যন্ত অযোগ্যেও শক্তিপাত হইতে পারে।

জপধ্যানাদি পরমেশ্বরের স্বরূপবিকাশিকা ক্রিয়াশক্তি, স্বরূপের আবরণকারক কর্ম নহে।৬

একই চিদ্‌রূপ পরমেশ্বর নিজ স্বাতন্ত্র্যবলে তত্তৎ প্রমাতা, প্রমেয় আদি বিভিন্ন রূপে ও নানা আকারে প্রকাশমান হন। এইজন্য একত্ব থাকিলেও ঐক্যের অবভাস না থাকার দরূণ তাঁহার নিজ স্বাতন্ত্র্যপ্রভাবে স্বরূপ গুপ্ত হয়। ইহারই নাম তিরোভাব বা বন্ধন। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের স্বরূপও পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। এইপ্রকারে বন্ধও ভোগ দ্বারা ভোক্তৃত্ব পুষ্ট করিয়া সংকোচের অবভাসনকারক জাতি আয়ু ও ভোগপ্রদরূপে বিকল্পিত, স্বয়ংকল্পিত কর্মের দ্বারা আত্মাকে বন্ধ করে। তারপর উহা বন্ধনমোচনের ক্রম হইতে নিজের আগন্তুক রূপ মলকর্মাদিকে অপসারিত করিয়া নিজের বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে পূর্ণজ্ঞানক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন কেবল স্বতন্ত্র পরমেশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন।

ছয়

পর ও অপরভেদে শক্তিপাত প্রধানতঃ দুইপ্রকার। পরশক্তিপাত হইলে পরিচ্ছিন্ন আত্ম পূর্ণ চিদাত্মারূপে প্রকাশিত হয়। ইহাই উহার পরম প্রকাশ। উপাধিহীন—অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই—উহার স্বরূপ। কিন্তু অপর শক্তিপাতে পূর্ণ চিদাত্মার প্রকাশ পূর্ববৎ থাকিলেও অবচ্ছেদ সম্যক্‌প্রকারে অপগত হয় না, কারণ এই প্রকাশে ভোগাংশ ও অধিকারাংশবশতঃ কিঞ্চিৎ অবচ্ছেদ থাকেই। কিন্তু চরম অবস্থায় ইহা থাকে না। প্রচলিত ভাষাতে পর ও অপর শক্তিপাতকে পূর্ণ ও অপূর্ণ কৃপা বলা যায়।

পূর্ণকৃপা পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে না। অপূর্ণকৃপা ব্রহ্মাদিদেবগণও করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন, যাহার প্রভাবে কৃপাপাত্র জীব ব্রহ্মাদির অধিকারান্তর্গত নানাপ্রকার ভোগ ও অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণত্ব বা পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। যদিও ইহা সত্য যে ব্রহ্মাদিও

৬ পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তি যখন ভেদজ্ঞানশালী পশুতে প্রকট হয় এবং ত্যাগ-গ্রহণ প্রভৃতি রূপে ক্ষোভময় হইয়া বন্ধনের কারণ হয়, তখন উহাকে স্বরূপাচ্ছাদক সুখদুঃখাদির জনক "কর্ম" নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু যখন ঐ একই ক্রিয়াশক্তি স্বীয় শিব-শক্ত্যাত্মক মার্গে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন উহা বিভিন্ন সিদ্ধির কারণ হয় এবং উহাকে 'ক্রিয়া' বলা হয়। তাই জপাদি ক্রিয়া, কর্ম নহে। অবিচ্ছিন্ন স্ফূর্তিই তন্ত্রশাস্ত্রে সিদ্ধিপদের বাচ্য। ইহা অক্ষর ভোগ বা মোক্ষের স্বাতন্ত্র্য।

পরমেশ্বরেরই রূপ, তথাপি স্বয়ং উন্নমিত ভেদ-সম্বন্ধবশতঃ ঐ পদ মায়াপদের অন্তর্গত বলিয়া সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের কৃপা হইতে ব্রহ্মাদি দেবতার কৃপা নিকৃষ্ট বলিতে হয়। কিন্তু একথা সত্য যে মায়ান্তর্গত হইলেও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভোগাদিময় নিকৃষ্ট অনগ্রহ করিতে সমর্থ। যে প্রকার স্বাতন্ত্র্যবশতঃ বা শক্তির সমাবেশ-নিবন্ধন রাজগণ কাহারও কাহারও প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, সেইপ্রকার স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে ব্রহ্মাদিদেবগণও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

মায়াগর্ভে যে সকল অধিকারী পুরুষ আছেন তাহাদের অনুগ্রহ মন্দ ও তীব্র ভেদে দুইপ্রকার। মন্দ অনুগ্রহের ফলে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার প্রভাবে জীব প্রাকৃতিক বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতির উর্ধ্বস্তরের কর্ম, যাহা কালাদি তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে, তখনও ক্ষীণ হয় না। প্রকৃতির নিম্ন ভূমির যাবতীয় কর্মের ক্ষয় অবশ্য হয়। এইপ্রকার বিবেক জ্ঞানীতে মল বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ইহা সত্য যে এই সকল সাধক পুনরায় প্রকৃতিগর্ভে আর জন্মগ্রহণ করিবে না। অনন্তেশ নামক ঈশ্বরের প্রেরণাবশতঃ ইহারা অপ্রাকৃত মায়িক জগতে কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করিতেও পারে। যদি ঐ অনুগ্রহ তীব্র মাত্রাতে হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ সাধকের কলা-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার কিঞ্চিৎকাল পরেই পুরুষ মায়া হইতে নিজের ভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও মায়ারাজ্য অতিক্রম করে।

কলা লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বকর্ম ক্ষয় হয় বলিয়া পুরুষের পক্ষে মায়া উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হয়। সাধনরাজ্যে এতটা অগ্রসর হইলে পুনরায় মায়াগর্ভে অবতীর্ণ হইতে হয় না। ইহাই বিজ্ঞানাকল অবস্থা। ইহাকে একপ্রকার কৈবল্য অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই সময়ে আণবমল অবশিষ্ট থাকে বলিয়া অধিকারের নিবৃত্তি হয় না। এই সব পুরুষের উপর মায়াধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের কোন অধিকার থাকে না। বিজ্ঞানাকল পুরুষ পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ তাঁহার সঙ্গে ক্রমশঃ অধিক তাদাত্ম্য অনুভব করিতে করিতে ক্রমশঃ মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বর পদ প্রাপ্ত করিয়া অন্তে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরভাব লাভ করে। পরমেশ্বর বা পূর্ণব্রহ্মের কৃপাতে মূল অজ্ঞানরূপ আণবমল নিবৃত্ত হয় ও পূর্ণত্বের অভিব্যক্তি হয়। ব্রহ্মাভিন্ন মায়ান্তর্গত অধিকারী পুরুষের কৃপাতে পূর্ণত্বলাভ হইতে পারে না, শুধু উৎকৃষ্ট ভোগাদি লাভ হইতে পারে। এইজন্য মুমুক্ষুমণ্ডলে সাক্ষাৎ ভগবানের কৃপাকেই কৃপা বলিয়া বর্ণনা করা হয়, নিম্নাধিকারীদের কৃপাকে কৃপা বলিয়া গণ্য করা হয় না।

সাত

শক্তিপাত বিচিত্র বলিয়া তন্মূলক অধিকারও বিচিত্র। সময়ী, পুত্রক, সাধক ও আচার্য বা গুরু এই সব অধিকারভেদ বিভিন্নপ্রকার শক্তিপাত হইতে উদ্ভূত হয়। এই সকল অধিকার সমষ্টিরূপেও হইতে পারে, পৃথক্ পৃথক্ রূপেও হইতে পারে। এই সব কাহারও ক্রমশঃ হয় অর্থাৎ প্রথমে সময়ীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকভাবের প্রাপ্তি হয়, তারপর আচার্যভাবে স্থিত হয়। কিন্তু কাহারও কাহারও জীবনে এইসব বিনাক্রমেই আগত হয় দেখা যায়। যেমন কোন পুরুষ সময়ী অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়াই পুত্রক অবস্থা লাভ করে অথবা সময়ী ও পুত্রক দুই অবস্থাই অতিক্রম করিয়া আচার্যপদে পৌঁছিয়া যায়। শক্তিপাতের মাত্রা মন্দ হইলে জীব মায়াধিকার প্রাপ্ত হয় ও রুদ্রাংশ ভাব লাভ করে। তারপর পরমেশ্বরের বিশিষ্ট কৃপাবশতঃ পুত্রক দীক্ষার পর পূর্ণত্বে আরূঢ় হয়। ইহার নাম 'সময়ী'। অপেক্ষাকৃত তীব্রতর শক্তিপাতের প্রভাবে কোন কোন পুরুষ বিশুদ্ধ অধ্বাতে যুক্ত হইয়া, হয় দেহান্তে পূর্ণত্বলাভ করে অথবা ক্রম লঙ্ঘন করিয়া জীবিতকালেই পূর্ণত্বলাভ করে। এই সকল পুরুষকে 'পুত্রক' বলে। কেহ কেহ প্রথমে ভোগ ও ঐশ্বর্য লাভ করিয়া বৈরাগ্য হইতে পরমপদে স্থিত হয়। ইহাদের মধ্যেও যোগ্যতাভেদে কেহ শীঘ্র, আবার কেহ বিলম্বে লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়। ইহাদের নাম 'সাধক'। কিন্তু এমন পুরুষও আছেন যিনি নিজের কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া পঞ্চকৃত্যকারী পরমেশ্বরের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ও 'গুরু' বা 'আচার্য' পদে আরূঢ় হইয়া জীবসকলকে অনুগ্রহ করেন। উঁহাদের মধ্যেও শিষ্যদের বিভিন্ন যোগ্যতা অনুসারে ভেদ অবশ্য থাকে—অর্থাৎ কেহ শিষ্যের ভোগ বিধান করেন, কেহ বা মোক্ষ বিধান করেন, কিন্তু তাঁর নিজের কোন কর্তব্য বাকী থাকে না।

আট

শক্তিপাত তীব্র, মধ্য ও মন্দভেদে প্রধানতঃ তিনপ্রকার। ইহার প্রত্যেকটি ভেদ তীব্র, মধ্য ও মন্দভেদে পুনরায় তিনপ্রকার। এইপ্রকার বিভিন্ন মাত্রার শক্তিপাতের ফলও বিভিন্ন। তীব্র শক্তিপাতের তিনটি ভেদ এইরূপ—তীব্রতীব্র মধ্যতীব্র ও মন্দতীব্র। তীব্রতীব্র শক্তিপাতের প্রভাবে স্বতঃই দেহত্যাগ হয় এবং মোক্ষলাভ হয়। ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয়ের প্রয়োজন থাকে না। এই শক্তিপাত অত্যন্ত তীব্র হইলে প্রারব্ধকেও নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু এই

তীব্রতীব্র শক্তিপাতেও তারতম্য আছে। ইহার মধ্যে যে শক্তিপাতটি অত্যন্ত তীব্র তাহার প্রভাবে শক্তিপাতের সঙ্গে সঙ্গে দেহনাশ হইয়া যায়। বিদ্যুৎপাত হইলে যেমন একই ক্ষণে দেহ ধ্বংস হয় সেইপ্রকার উৎকট তীব্রতীব্র শক্তিপাতের ফলে সঙ্গে সঙ্গে দেহনাশ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তীব্রতীব্রের মধ্য অপেক্ষাকৃত মধ্যমমাত্রাতে শক্তিপাতের অল্পক্ষণ পরেই দেহধ্বংস হইয়া যায়। তীব্রতীব্র শক্তিপাত আরও যদি কম মাত্রাতে হয় তাহা হইলে দেহ নষ্ট হইতে অধিক সময় লাগে, কিন্তু উহা আপনাআপনি নষ্ট হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তীব্রতীব্র শক্তিপাতের ফলে উহার মাত্রানুসারে প্রারব্ধনাশ ঘটিয়া থাকে। মধ্যতীব্র শক্তিপাতের ফলে দেহনাশ হয় না, কেবল অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়।[৭] কিন্তু এই অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক তাহা পৃথক্‌ভাবে গুরু অথবা শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায় না। উহা স্বয়ংই হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া থাকে। নিজের প্রতিভা স্ফুরিত হওয়ার দরুণ এই অনৌপদেশিক মহাজ্ঞানকে প্রাতিভজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। ইহার উদয়ের জন্য শাস্ত্র অথবা আচার্যের প্রয়োজন হয় না।

প্রসংগতঃ এখানে প্রাতিভজ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলা উচিত মনে হইতেছে। মধ্যতীব্র শক্তিপাতের ফলে প্রাতিভজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, ইহা বলা হইয়াছে। সৎতর্ক অথবা শুদ্ধবিদ্যা এই জ্ঞানের স্বরূপ। বাস্তবিক পক্ষে ইহা পরমেশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই নহে। যে-সকল সাধকের চিত্ত সদ্‌গুরুতে অনুরক্ত না হইয়া তত্ত্বোপদেষ্টা আচার্যে অনুরক্ত তাহারা মায়ার পাশে আবদ্ধ। তাহারা পরমেশ্বরের বামাশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া থাকে। তাহারা যে মুক্তিলাভ করে তাহা প্রলয়াকল নামক পশুর অবস্থা হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। বলা বাহুল্য, বামাশক্তি পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষের নাম। শক্তিপাতের ন্যূনতাবশতঃ

৭ প্রচলিত শাস্ত্রীয় পরিভাষা অনুসারে বলা যাইতে পারে যে তীব্রতীব্র শক্তিপাতবশতঃ প্রারব্ধসহিত সমস্ত কর্মের দাহ হয় এবং মধ্যতীব্র শক্তিপাতবশতঃ প্রারব্ধভিন্ন অবশিষ্ট কর্ম দগ্ধ হইয়া যায়। প্রকারান্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে তীব্রতীব্র শক্তিপাতবশতঃ অজ্ঞানের আবরণাংশ বিক্ষেপাংশ দুইটি একসঙ্গে (যেমন তীব্রতীব্র মাত্রাতে হয়) অথবা ক্রমশঃ (যেমন তীব্রতীব্রের মধ্যে ও মন্দমাত্রাতে হয়) এবং মধ্যতীব্র শক্তিপাতের প্রভাবে অজ্ঞানের কেবল আবরণাংশ নষ্ট হইয়া যায়, বিক্ষেপাংশ থাকিয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে লিখিত আছে—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥

এই স্থলে সমিদ্ধ অর্থাৎ বর্ধিত জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে নাশ করে এরূপ বলা হইয়াছে। এস্থলে 'সর্বকর্ম' বলাতে বুঝা যায় যে প্রারব্ধ ইহার অন্তর্গত। কারণ 'সমিদ্ধ' পদ হইতে সূচিত হয় যে ইহা জ্ঞানাগ্নির তীব্রতীব্র অবস্থা।

অসদ্‌গুরুতে অথবা দ্বৈতশাস্ত্রাদিতে জীবের প্রথম প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তারপর ভগবানের জ্যেষ্ঠা-শক্তিরূপা মঙ্গলময়ী ইচ্ছার প্রভাবে অর্থাৎ শুদ্ধা ভগবৎশক্তির সমাবেশবশতঃ জীবের হৃদয়ে সৎস্বরূপ প্রাপ্তির ইচ্ছা জাগিয়া থাকে। এই ইচ্ছার নাম সৎতর্ক। ইহার পর ক্রমশঃ সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন নিজের যোগ্যতানুসারে ভোগ অথবা মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। শক্তিপাতের বিচিত্রতানুসারে গুরু এবং শাস্ত্রে সদ্‌ভাব কিংবা অসদ্‌ভাবের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়। দ্বৈতশাস্ত্র ও দ্বৈতগুরু পরমেশ্বরের বামাশক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত, এইজন্য উহাদিগের দ্বারা মায়ালঙ্ঘন ঘটে না। বস্তুতঃ যে অবস্থা মোক্ষপদবাচ্য নহে তাহাকে মোক্ষ মনে করিয়া তাহার প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা মায়ারই কার্য। কিন্তু যতক্ষণ জীবহৃদয়ে সৎতর্করূপ শুদ্ধজ্ঞানের উদয় না হয় ততক্ষণ সার ও অসার ইহাদের বিবেচনা ঠিক ঠিক হইতে পারে না। সৎতর্কের উদয় ও জ্যেষ্ঠাশক্তির অধিষ্ঠান না হইলে অন্তঃকরণও শুদ্ধ হয় না এবং শুদ্ধিমার্গের আশ্রয়ও পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সৎতর্করূপ জ্ঞান কিপ্রকারে লাভ করা যায় ইহাই প্রশ্ন। কিরণাগমে স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে কখনও কখনও এই জ্ঞান গুরু ও শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া উদিত হইতে পারে। কিন্তু কখনও কখনও ইহা স্বয়ংই উদ্ভূত হয়। তখন গুরুর উপদেশের অথবা শাস্ত্র অধ্যয়নের আবশ্যকতা থাকে না। ইহাকে আচার্যগণ সাংসিদ্ধিক ও স্বপ্রত্যয়াত্মক নিশ্চয়রূপ জ্ঞান বলিয়া থাকেন। সাংসিদ্ধিক বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে এই জ্ঞান স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার কোন হেতু নাই এমন নহে, কারণ গুরুশাস্ত্রাদি লৌকিক হেতু না থাকিলেও ভাগবানের শক্তিপাতরূপ হেতু আছে।

জ্ঞানোদয়ের যে তিনটি কারণের বর্ণনা করা হইল তন্মধ্যে গুরু হইতে শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, কারণ গুরু হইতে শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। এইজন্য গুরুকে উপায় ও শাস্ত্রকে উপেয় মনে করা হয়। শাস্ত্র হইতে নিজের প্রতিভা শ্রেষ্ঠ, কেননা চরমাবস্থায় শাস্ত্রজ্ঞানও প্রাতিভজ্ঞান উৎপাদন করিয়া সার্থকতা লাভ করে। প্রাতিভজ্ঞানের উৎপাদন হইয়া গেলে একদিকে যেমন গুরুর উপযোগিতা থাকে না, অন্যদিকে তেমনই শাস্ত্রেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

কিন্তু উৎকৃষ্ট যোগ্যতাবিশিষ্ট পুরুষে প্রাতিভজ্ঞান গুরু ও শাস্ত্রমার্গ লঙ্ঘন করিয়া স্বতঃই উৎপন্ন হয়। উহার জন্য দীক্ষা, অভিষেক প্রভৃতি বাহ্যসংস্কারের প্রয়োজন থাকে না, কারণ সংস্কারের যথার্থ উদ্দেশ্য আদিগুরু পরমেশ্বরকে তৎ তৎ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত করা। কিন্তু প্রতিভাবান্ পুরুষে এই অধিষ্ঠান স্বতঃসিদ্ধ থাকে বলিয়া সংস্কার নিষ্ফল। শক্তিপাতের প্রধান লক্ষণ ভগবৎ ভক্তির উন্মেষ। যে মহান্ পুরুষে প্রতিভার উদয় হয় তাহাতে

ভগবদ্‌ভক্তি না থাকিয়া পারে না। এই সকল স্থলে দীক্ষা এবং অভিষেক ব্যাপার নিজ নিজ সম্বিদ্‌দেবীগণের দ্বারা আপনাআপনি সম্পন্ন হয়। সেখানে ক্রিয়া এবং দীক্ষাদির প্রয়োজন থাকে না। প্রাতিভজ্ঞান উদিত হইলে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইয়া প্রমাতা অথবা আত্মার সহিত তাদাত্ম্যলাভ করে এবং দেবীভাব প্রাপ্ত হয়।[৮]

এই শক্তিভাবাপন্ন অথবা দেবীঅবস্থাপ্রপ্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল পুরুষের জ্ঞান-ক্রিয়া অথবা চৈতন্য উত্তেজিত করিয়া থাকে। ইহারই নাম অন্তর্দীক্ষা, যাহার প্রভাবে সাধক সর্বত্র স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহাই অভিষেকের রহস্য। এইসকল সাধক অন্যান্য গুরুবর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ গুরু হইতে শাস্ত্রজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রতিভাবান্ পুরুষ লৌকিক নিমিত্তের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল প্রতিভা হইতে সকল শাস্ত্রের রহস্য ঠিকঠিক জানিতে পারে। ইহারই নাম শুদ্ধবিদ্যাসমুল্লাস অথবা প্রাতিভ মহাজ্ঞান।

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে প্রাতিভজ্ঞানের উদয় আপনা-আপনি হইতে পারে অথবা অন্য কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়াও হইতে পারে। এই আশ্রয়ের মধ্যে নিজের বোধ অথবা অন্যের দ্বারা রচিত বিভিন্ন কর্মের প্রতিপাদক বিভিন্ন শাস্ত্র অন্তর্গত আছে বুঝিতে হইবে। তান্ত্রিক পরিভাষাতে এই উপজীব্য আশ্রয়ের নাম "ভিত্তি"। এইজন্য এই জ্ঞানকে সাধারণতঃ সভিত্তিক এবং নির্ভিত্তিক বলা হইয়া থাকে। যে জ্ঞান আপনা হইতে উদিত হয় তাহার নাম নির্ভিত্তিক। কিন্তু যে জ্ঞান সভিত্তিক তাহা অংশগামীও হইতে পারে, সর্বগামীও হইতে পারে। অংশ মুখ্য এবং অমুখ্য ভেদে দুইপ্রকার বলিয়া অংশগামী জ্ঞানও দুইপ্রকার। বাস্তবিকপক্ষে অনুগ্রহপাত্র শিষ্যের যোগ্যতার তারতম্যবশতঃই জ্ঞানকে সভিত্তিক এবং নির্ভিত্তিক বলা হইয়া থাকে। যাঁহার সৎতর্ক আপনা হইতে উদিত হইয়া সকলপ্রকার বন্ধন ধ্বংস করে এবং যিনি এইভাবে পূর্ণত্ব লাভ করেন তিনিই সাংসিদ্ধিক গুরু। তিনি নিজের সম্বন্ধে কৃতকৃত্য হইলেও সর্বদা অন্যকে অনুগ্রহ করিবার জন্য প্রবৃত্ত থাকেন।[৯] কিন্তু যদি

---

৮ বহির্মুখস্য মন্ত্রস্য বৃত্তয়ো যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
তা এবান্তর্মুখস্যাস্য শক্তয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ॥

অর্থাৎ মন্ত্র বা চিত্ত বহির্মুখ হইলে যাহাদিগকে তাহার বৃত্তি বলা হয়, মন্ত্র অন্তর্মুখ হইলে ঐগুলি তাহার শক্তিরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে।

৯ স্বং কর্তব্যং কিমপি কলয়ন্ লোক এষ প্রযত্না-
ন্নো পারক্যং প্রতি ঘটয়তে কাঞ্চন স্বাত্মবৃত্তিম্।

অনুগ্রহপাত্র জীবের চিত্ত নির্মল হয় তাহা হইলে তাহার অনুগ্রহব্যাপারে কোন উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি শুধু নিজের শুদ্ধ অনুসন্ধানহীন চিদাত্মিকা দৃষ্টির দ্বারাই এইসকল জীবকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাদিগকে নিজের সমান করিয়া নেন। বলা বাহুল্য, ইহা অনুগ্রহেরই ফল। এইভাবে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ব্যাপারেও তিনি নিরপেক্ষভাবে কার্য করেন। ইহাই নির্ভিত্তিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু অনুগ্রহের পাত্র যদি শুদ্ধচিত্ত না হয় তাহা হইলে অনুগ্রহ ব্যাপারে উপকরণের আবশ্যক হয়। অনুগ্রহের পূর্বে গুরু অনুগ্রহের পাত্রকে অনুগ্রহ করিবেন বলিয়া সংকল্প করেন। ইহাকে অনুসন্ধান বলে। পরে এই সংকল্প অনুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হন। এইজন্য ইহাতে যাবতীয় বাহ্য উপকরণের প্রয়োজন হয় এবং বিধিমার্গ আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। গুরু সাক্ষাৎ পরমেশ্বর স্বরূপ হইলেও এইরূপ ক্ষেত্রে উপায়ভূত শাস্ত্রাদির শ্রবণ, অধ্যয়ন প্রভৃতির আদর করা হইয়া থাকে। অশুদ্ধ জীব নানাপ্রকার বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের সংস্কার অনুসারে উপকরণও নানাপ্রকার হইয়া থাকে। তাই ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের প্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র আবশ্যক হয়। এইগুলি না হইলে এই সকল জীবকে অনুগ্রহ করা যায় না। রোগ ভিন্ন হইলে যেমন ঔষধি ভিন্ন হইয়া থাকে তদ্রূপ চিত্ত ভিন্ন হইলে শাস্ত্রও ভিন্ন হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য এই যে গুরু শিষ্যের যোগ্যতা দেখিয়া তাহার অধিকার অনুসারে তাহাকে অনুগ্রহ করেন। ইহাই সর্বগামী সভিত্তিক জ্ঞানের মাহাত্ম্য।

কিন্তু কেহ কেহ নির্দিষ্ট শাস্ত্রানুসারে যোগ্য অনুগ্রহ পাত্রের উপর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা অংশগামী সভিত্তিক জ্ঞানের ব্যাপার। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই অংশও অসংখ্য, এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিদ্যমান থাকে। এই সকল অংশের মধ্যে কোনটি মুখ্য এবং কোনটি গৌণ। এই কারণেই অংশগামী জ্ঞানের ভেদ হয়। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ইহার বিভিন্ন ক্ষেত্রেই প্রতিভারূপী গুরু অথবা স্বাভাবিক জ্ঞান সমানরূপে থাকে,

যস্তু ধ্বস্তাখিলভবমলো ভৈরবীভাবপূর্ণঃ
কৃত্যং তস্য স্ফুটতরমিদং লোককর্তব্যমাত্রম্ ॥

সাধারণ পুরুষ কোনপ্রকারে নিজের কার্য করিয়া থাকে। অন্যের কার্যের দিকে তাহাদের বৃত্তি যায় না। কিন্তু যাহাদের সমস্ত সাংসারিক মল নষ্ট হইয়াছে সেই ভাগবত পুরুষগণের কর্তব্য লোকহিত ভিন্ন কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

কারণ উহাতে নিজবিষয়ে কৃতকৃত্যতার অভাব নাই।[১০] কেবল অন্যের হিতের জন্য বিভিন্নপ্রকার ভিত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অনুগ্রহ সোপকরণ অথবা সোপায় এবং নিরুপকরণ অথবা নিরুপায় ভেদে দুই প্রকার।

গুরু দীক্ষার দ্বারা যেমন শিষ্যকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করেন এবং তাহাকে সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ঐশ্বরিক ধর্ম প্রদান করেন, প্রাতিভজ্ঞান হইতেও ঠিক সেইপ্রকার ফললাভই হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে শুধু এইটুকু পার্থক্য যে দীক্ষা পরাধীন এবং প্রাতিভজ্ঞান নিজের স্বভাবভূত। আসল কথা এই যে জীব, ঈশ্বর ও শক্তি এই তিনটি তত্ত্ব, গুরু ও আগম হইতে তাত্ত্বিকরূপে সিদ্ধ হইলে পর, প্রাতিভজ্ঞানরূপে প্রকট হয়। গুরু এবং শাস্ত্রের ইহাই মহত্ত্ব। অর্থাৎ যে সময় গুরু সাধকের মায়াপাশ দীক্ষারূপ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করেন এবং যে সময়ে সাধক আগমের দ্বারা সত্যাসত্য ভাবনাতে ভাবিত হন, বাস্তবিকপক্ষে সেইসময়েই শিষ্যের প্রাতিভতত্ত্ব খুলিয়া যায়। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

তদাগমবশাৎ সাধ্যং গুরুবক্ত্রান্ মহাধিয়া।
শিবশক্তিকরাবেশাৎ গুরোঃ শিষ্যপ্রবোধকঃ॥[১১]

যেমন ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নি মুখপ্রেরিত বায়ুর প্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, যেমন ঠিকসময়ে বীজের বপণ সেচন প্রভৃতি সম্পন্ন হইলে উহা অংকুর ও পল্লবাদিতে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ গুরু-উপদিষ্ট ক্রিয়া দ্বারা প্রাতিভজ্ঞান অভিব্যক্ত হয়।•

এই অনুত্তর মহাজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা বিবেক হইতে উৎপন্ন হয়। অতীন্দ্রিয় ও অপ্রমেয় চৈতন্য তত্ত্ব যখন বিচার ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আত্মবোধরূপে প্রকট হয়, তখন উহার নাম হয় বিবেক। ঐ অবস্থাতে জীব, ঈশ্বর, মায়াদি পাশ এই সকলের জ্ঞান আপনাআপনি উদিত হয়। ইহাই প্রাতিভজ্ঞান। ইহা সর্বথা অভ্রান্ত বলিয়া ইহাকে সম্যক্‌জ্ঞান বা মহাজ্ঞান বলা হয়। ঐ সময় সর্বপ্রকার পরিচ্ছিন্নজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য ও অন্তঃকরণজন্য যাবতীয় খণ্ডজ্ঞান অন্যের অধীনতা ত্যাগ করিয়া ঐ মহাপ্রকাশে বিশ্রান্তি লাভ করে অর্থাৎ উহাতে লীন হইয়া যায়। যেমন সূর্যের কিরণে দীপের প্রকাশ

১০ এই সাংসিদ্ধিক গুরুই অকল্পিত গুরু। ইনি অন্য গুরু হইতে ক্রিয়াদীক্ষাদির দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ করেন নাই। তাই ইঁহাকে অকল্পিত বলা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অকল্পিতকল্পক, কল্পিত ও কল্পিতাকল্পিত ভেদে আরও তিনপ্রকার গুরু আছেন।

১১ এই জ্ঞান আগম ও গুরুমুখ হইতে পাওয়া যাইতে পারে। গুরুর চৈতন্য-শক্তিময় করস্পর্শে অর্থাৎ গুরুরূপী ভগবানের শক্তিরূপ কিরণের দ্বারা শিষ্য প্রবুদ্ধ হয়।

নিষ্প্রভ হয় সেইপ্রকার প্রাতিভজ্ঞানের উদয় হইল যাবতীয় খণ্ডজ্ঞান নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

বিবেক উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রিয়গোচর শব্দাদিবিষয়ে দূরশ্রবণাদি বিচিত্রজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন দেশ, কাল এবং আকারগত ব্যবধান ও সূক্ষ্মতাদি থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের উপর উহাদের কোনপ্রকার প্রভাব পড়ে না। যোগশাস্ত্রে যে সকল বিভূতির বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলি বিবেকবান্ পুরুষ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ শক্তিজ্ঞান লাভ হইলে উহার প্রভাবে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্ম, ষট্চক্র, স্বরসাধন, মন্ত্রবেধ, পরকায়-প্রবেশ প্রভৃতি সকল বিষয়ে অধিকার জন্মে। একই ক্ষণে এই সকল সম্পৎ আয়ত্ত হয়। বিবেকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় ভাবের প্রতি চিত্তে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় ও বিকাশপ্রাপ্ত হয়। চরম স্থিতিতে পরম চিদ্ভাবে বিশ্রান্তি ঘটে। তখন কোন সিদ্ধির প্রতি আসক্তি থাকে না— তখন মনে হয় ঐসব ঐশ্বর্য নিয়া খেলা শিশুর পুতুল খেলামাত্র, ইহা স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালের ন্যায় অলীক।

দর্পণে যেমন নিজের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইপ্রকার প্রাতিভ-জ্ঞানের আলোকে একসঙ্গে ভিতরে বাহিরে সর্বত্র পরমেশ্বরের সত্তার প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে থাকে। তখন প্রতীতি হয় যেন সমগ্র বিশ্বই তাঁহার ঘনীভূত প্রকাশমাত্র। এই অবস্থায় হেয়-উপাদেয় বোধ থাকে না বলিয়া সাধকের পরিচ্ছিন্ন সিদ্ধির আশ্রয়ভূত তৎ তৎপ্রকারের নির্দিষ্ট ধ্যান পরিত্যক্ত হইয়া যায়। তখন একমাত্র পরমবস্তুর ভাবনাই সর্বদার জন্য জাগরূক থাকে।[১২] এই ভাবনা দৃঢ় হইলেই জীবন্মুক্তি ঘটে। আর এক কথা: বিবেকের বিকাশ হইলে শাপ ও অনুগ্রহব্যাপারে সাধকের সামর্থ্য জন্মে। এইজন্য বিবেকবান্ স্বয়ং মুক্ত হইয়া অন্যকেও মুক্ত করিতে পারেন।

বদ্ধজীবরূপী অণু পঞ্চভূতে আচ্ছন্ন ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। সেইজন্য তাহাকে এক দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যদেহ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিবেকের উদয় হওয়ার পর যখন তাহার সঙ্গে প্রতিভার যোগ হয়[১৩] তখন ঐ জীব আর

১২ সাধকের চিত্তে বিশ্বাস উৎপাদন করাই সিদ্ধির প্রকৃত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই দেহে অবস্থানকালে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বিশ্বাস জন্মে যে মৃত্যুর পর অবশ্য মুক্তিলাভ হইবে। যাহাদের বিশ্বাস দুর্বল তাহাদের পক্ষে সিদ্ধির ইহাই উপযোগিতা। কিন্তু পরিপক্ব অবস্থাতে জ্ঞানের তীব্রতা সিদ্ধ হইলে সিদ্ধির প্রতি ঔদাসীন্য ও অনাসক্তি জন্মে। তখন একমাত্র পরমতত্ত্বের ভাবনাই দৃঢ় হয়। তখন জীবন্মুক্তি নিশ্চিত।

১৩ পাতঞ্জলদর্শনে বিবেকজজ্ঞানের স্বরূপবর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ইহা সর্ববিষয়ক, সর্বথাবিষয়ক ও ক্রমহীন অনৌপদেশিক তারকজ্ঞান। মহোপনিষদে (অধ্যায় ২)

জীবরূপে পরিগণিত হয় না। তখন উহার স্থান হয় শক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত। সে তখন শুদ্ধবিদ্যা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিগ্রহ ও অনুগ্রহ ব্যাপারে সমর্থ হয় এবং ইহাতে ক্রমশঃ প্ররূঢ় হইয়া, অর্থাৎ শক্তিপাতে ক্রমিক আবেশবশতঃ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয় ও পরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও শিবনামক ছয়টি কারণ বা অধিষ্ঠাতাকে ত্যাগ করিয়া অন্তে পরমেশ্বরের সাযুজ্য লাভ করে। অতএব শিব, শক্তি ও জীবই বস্তুতঃ প্রাতিভবিজ্ঞানরূপে প্রাদুর্ভূত হয়।

আত্মার স্বাভাবিক পূর্ণ আত্মবোধ সংকুচিত হইয়াই অপূর্ণ জ্ঞান বা অজ্ঞানের আকার ধারণ করে। শক্তিপাতের ফলে সঙ্কোচ কাটিয়া গেলে তাহার নিত্যসিদ্ধ স্বভাব জাগিয়া ওঠে। মধ্যতীব্র শক্তিপাতের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :

(১) ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি।

(২) মন্ত্রসিদ্ধি, যাহার প্রভাবে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।

(৩) সকল তত্ত্বকেই আয়ত্ত করার সামর্থ্য।

(৪) আকস্মিকরূপে সর্বশাস্ত্রের অর্থজ্ঞান, ইত্যাদি।

এইসব লক্ষণ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়। শক্তিপাতের তারতম্য-বশতঃ কোনো সাধকে সবগুলিরই প্রকাশ হয়, অন্য কোনো সাধকে কয়েকটির মাত্র প্রকাশ হয়। ইহাদের মধ্যে ভক্তি মুক্তি বিষয়ে প্রধান, অন্যত্র আনুষঙ্গিক। মন্ত্রসিদ্ধি ভোগবিষয়ে প্রধান, অন্যত্র আনুষঙ্গিক। অন্য দুইটি লক্ষণ উভয়ত্র সমান।

আছে যে শুকদেব জন্মকালেই এই মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বিবেক হইতে স্বতঃস্ফুরিত হইয়াছিল—

জাতমাত্রেণ মুনিরাট্ যৎসত্যং তদবাপ্তবান্।
তেনাসৌ স্ববিবেকেন স্বয়মেব মহামনাঃ ॥
প্রবিচার্য চিরং সাধু স্বাত্মনিশ্চয়মাপ্তবান্ ॥

এই জ্ঞানের প্রভাবে তিনি গুরুর উপদেশ ব্যতীতই পরমার্থতত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ জ্ঞান দৃঢ় না হওয়ার দরুণ তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। নিজজ্ঞানে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। সেইজন্য তিনি পিতা ব্যাসদেবের আদেশে বিদেহরাজ জনকের নিকট যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নয়

মন্দতীব্র শক্তিপাতের প্রভাবে সদ্‌গুরু লাভের ইচ্ছা জন্মে। তখন অসদ্‌গুরুর নিকট যাওয়ার আর ইচ্ছা থাকে না। শক্তিপাত হওয়ার পর কাহারও মন্দ প্রাতিভজ্ঞান উৎপন্ন হয়—তখন তত্ত্ব কি ও তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান কাহার আছে, এই বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা জন্মে। ইহার পর সদ্‌গুরুলাভের ইচ্ছা হয় এবং যথাসময়ে তাহার প্রাপ্তি হয়। কিন্তু কাহারও কাহারও এমনও হয় যে শক্তি-পাতের পর জাগতিক উপদেষ্টা বা ব্যাবহারিক গুরুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তারপর কিছুদিন তাঁহার শুভ সঙ্গের প্রভাবে পূর্বোক্ত জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়।

সদ্‌গুরু সাংসিদ্ধিক ও সংস্কৃত ভেদে দুইপ্রকার। সাংসিদ্ধিক গুরুতে স্বয়ংই—আপনা হইতে—জ্ঞানের উদয় হয়। ইনি শক্তিপাতের মাত্রানুসারে ক্রমশূন্যতা বা ক্রমবত্তানিবন্ধন সর্বগামী বা আংশিক হইতে পারেন।

যে গুরু অন্য গুরু হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হন তিনি সংস্কৃত গুরু। এই গুরুও কল্পিত অকল্পিত প্রভৃতি ভেদবশতঃ বিভিন্ন প্রকার। জীব সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষালাভ করিয়া শিবত্বপ্রাপ্ত হয় ও সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। এই অবস্থাতে দেহাদিতে আত্মাভিমান থাকে না এবং বিকল্পশূন্য স্বাত্মবোধ উদিত হয়। তখন দেহ থাকা ও না থাকাতে কোন পার্থক্য থাকে না। রত্নমালা আগমে আছে—

যস্মিন্ কালে তু গুরুণা নির্বিকল্পং প্রকাশিতম্।
তদৈব কিল মুক্তোঽসৌ যন্ত্রং তিষ্ঠতি কেবলম্॥

জীবন্মুক্তের সুখদুঃখানুভব প্রারব্ধ কর্মের অনুসারে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই অনুভব হয় বলিয়া তাহার মুক্তিবিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।[১৪]

১৪ অবিদ্যোপাসিতো দেহো হ্যন্যজন্মসমুদ্ভবঃ।
কর্মণা তেন বাধ্যন্তে জ্ঞানিনোঽপি কলেবরে॥

দেহ অন্যজন্মকৃত কর্মের প্রভাবে উৎপন্ন হয়। সেইজন্য উক্ত কর্মদ্বারা জ্ঞানীও বাধিত হয়। প্রারব্ধ কর্ম শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে অর্থাৎ যদি মন্ত্রাদির প্রভাবে সদ্যোনির্বাণদায়িনী দীক্ষার দ্বারা দেহপাত ঘটে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর শোধনাবশিষ্ট দেহারম্ভক কর্মের ফলে আয়ু ভোগ প্রভৃতি তো অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। যতক্ষণ ভোগ সমাপ্ত না হয় ততক্ষণ মোক্ষ হইতে পারে না। এইজন্য বিধান এই যে মরণের ক্ষণ না জানিয়া প্রাণবিয়োজিকা দীক্ষা দেওয়া উচিত নহে। এইপ্রকার দীক্ষা দিলে ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়।

মধ্যতীব্র ও মন্দতীব্র শক্তিপাত সম্বন্ধে মহাপুরুষগণের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।

তীব্রমধ্য শক্তিপাতের পর যে দীক্ষা হয় তাহাতে নিজের শিবত্বের সুদৃঢ় উপলব্ধি হয় না। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিবভাব অবশ্য হয় কিন্তু তাহার স্পষ্ট অনুভব হয় না। নির্বিকল্প আত্ম-সাক্ষাৎকারের অভাবই ইহার কারণ। অবশ্য দেহান্তে তাহার শিবসাযুজ্য নিশ্চিত। এই দীক্ষার শাস্ত্রীয় নাম পুত্রকদীক্ষা।

মধ্যমধ্য ও মন্দমধ্য শক্তিপাতবশতঃ ভগবৎপ্রাপ্তির ঔৎসুক্য থাকিলেও ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত না হওয়ার দরুণ দীক্ষাতেও ঐ প্রকার জ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটে। এই দীক্ষাকে অনেকস্থানে শিবধর্মী সাধকদীক্ষা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহার প্রভাবে ইষ্টতত্ত্বাদিতে যোজনা স্থাপিত হয় এবং যোগাভ্যাসাদির প্রভাবে ঐ তত্ত্বসংক্রান্ত ভোগ্যসকল ভোগ করিবার অধিকার জন্মে। মধ্যমধ্য শক্তিপাতস্থলে ঐ ভোগ বর্তমান দেহে থাকিতেই হয় এবং ভোগসমাপ্তির পর দেহান্তে শিবত্ব লাভ হয়। কিন্তু মন্দমধ্য শক্তিপাতস্থলে ঐ ভোগ বর্তমান দেহে না হইয়া ভাবী দেহান্তরে ঘটে। তারপর শিবত্ব লাভ হয়।

তীব্রমন্দ, মধ্যমন্দ ও মন্দ-মন্দ এই তিনপ্রকার শক্তিপাত ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রধান থাকাকালে হইয়া থাকে। শক্তিপাতের এই মন্দ অধিকারীগণের চিত্তে শিবত্ব-লাভের ঔৎসুক্য বেশী থাকে না। ইহাদের মধ্যে পরপর ভোগলালসা অধিক দৃষ্ট হয়। এইসব ক্ষেত্রে লোকধর্মী দীক্ষা আবশ্যক হয়। তীব্রমন্দ শক্তিপাত হইলে দেহান্তে সাধক অভীষ্ট ভুবনে অণিমাদি ঐশ্বর্য ভোগ করিতে করিতে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। তারপর প্রথমে পরমেশ্বরের স-কল রূপে ও পরে তাঁহার নিষ্কলরূপে যুক্ত হয়। কিন্তু শক্তিপাত আরও কম হইলে অর্থাৎ মধ্যমন্দমাত্রাতে হইলে কোন ভুবনে কিছু সময় পর্যন্ত ভোগ্য পদার্থের উপভোগ করিয়া ঐ ভুবনের অধিষ্ঠাতা হইতে দীক্ষাগ্রহণপূর্বক শিবত্ব লাভ করে। কিন্তু মন্দ-মন্দ শক্তিপাত স্থলে ঐ ভুবনে সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভোগ আস্বাদন করিতে করিতে ঐ ভুবনের নায়ক ভুবনেশ্বরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অন্তে শিবত্ব লাভ করে।

দশ

এই পর্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে শক্তিপাত বা শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত কোন জীব পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে—পূর্ণত্বের পথেও প্রবেশ করিতে পারে না। শক্তিপাতের তারতম্য

জীবের আধার বা ধারণশক্তিগত তারতম্যবশতঃ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাও সত্য যে জীব যতই নিম্নাধিকারী ও ভোগাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হউক না কেন, কখন না কখনও পরমপদ অবশ্য প্রাপ্ত হইবে। ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি অন্তরায় থাকিলে তাহার গতিতে বিলম্ব ঘটে, নতুবা শীঘ্রাতিশীঘ্র প্রাপ্তি হইতে পারে, এমনকি একটিমাত্র ক্ষণেও হইতে পারে (যেমন—তীব্রতীব্রের তীব্রমাত্রাতে)। শক্তিপাতের সময় যোগ্যতার বিচার হয় না, কিন্তু স্বভাবতঃ যোগ্যতার মাত্রানুসারেই শক্তিপাতের মাত্রা নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু মাত্রা যাহাই হোক্, ভগবৎশক্তির এরূপ মহিমা যে একবার ইহা পতিত হইলে জীবকে ভগবৎধামে না পৌঁছাইয়া ইহা শান্ত হয় না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দীক্ষারহস্য

দীক্ষা ও গুরু সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

পূর্বালোচিত শক্তিপাতকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীগুরু দীক্ষাদান করিয়া থাকেন। এখন সেই দীক্ষার রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করা যাইতেছে।

বর্তমান সময়ে যাঁহারা আধ্যাত্মতত্ত্বের অনুশীলন করেন তাঁহাদের মধ্যেও সকলের দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। কাহারও মতে দীক্ষা ও গুরুর কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন সাধনরাজ্যে দীক্ষার ও পথপ্রদর্শকরূপী গুরুর প্রায়োজন অবশ্য আছে। দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকিলে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের সমন্বয়ের প্রণালী জানা যাইতে পারে। যাঁহারা দীক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না তাঁহারা অবশ্য বাহ্য অনুষ্ঠানাত্মক দীক্ষাকে লক্ষ্য করিয়াই নিজমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে ইন্দ্রিয়গোচর বাহ্যব্যাপার ব্যতীতও দীক্ষাকার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। অবশ্য কোন কোন অবস্থায় স্থূল প্রক্রিয়াও অপরিহার্য হইয়া পড়ে, ইহা স্বীকার্য।

এইপ্রকারে "গুরু" শব্দের বাস্তবিক তাৎপর্য স্পষ্টভাবে জানা না থাকাতে গুরু বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিকল্পের উদয় হইয়া থাকে। অধিকার অনুসারে বাহ্যগুরুর আবশ্যকতা হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বাহ্যগুরুর আশ্রয় না নিয়াও ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। বাহ্যগুরু শব্দে বুঝিতে হইবে মানবগুরু, সিদ্ধগুরু অথবা দিব্যগুরু—এই তিনপ্রকার গুরুপংক্তির অন্তর্গত কোন মহাপুরুষ। সাধনার লৌকিক প্রণালীতে সাধারণতঃ মনুষ্যকেই বাহ্যগুরুরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, ভগবানের সঙ্গে জীবের বিশ্বাস ও ভক্তিমূলক সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে—এই বিষয়ে কেহ মধ্যস্থ হইতে পারে না। ভগবান্ সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং দয়ালু। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎরূপে যুক্ত হইবার কোন প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না। সরল হৃদয়ে আবাহন করিতে পারিলে জীব অবশ্যই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্ততঃ প্রাপ্তির স্থিরমার্গে পদস্থাপন করিতে পারে। এইপ্রকার অনেক বিকল্প বিদ্যমান রহিয়াছে। এক একটি করিয়া ইহাদের সমাধান করিতে চেষ্ট না করিয়া দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্যগণের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে আলোচনা

করাই উচিত মনে হইতেছে। ইহা হইতেই এই নিগূঢ় বিষয়ের রহস্য উন্মোচনে সাহায্য হইবে।

দীক্ষার স্বরূপ

দীক্ষা বস্তুতঃ আত্মসংস্কারেরই নামান্তর। আণব, মায়ীয় ও কার্মমল অথবা পাশ দ্বারা সংসারী আত্মা আচ্ছন্ন থাকে। ইহাদের প্রভাববশতঃ তাহার স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণত্ব প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে আত্মা পূর্ণ ও শিবস্বরূপ হইলেও আণবমলের আবরণবশতঃ স্বরূপগত সংকোচনিবন্ধন নিজেকে অপূর্ণ মনে করে। নিজে অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও নিজেকে সর্বপ্রকারে পরিচ্ছিন্নবৎ অনুভব করে।[১] এই পরিচ্ছিন্নতা অথবা আণবভাব প্রাপ্ত হওয়ার পর উহাতে শুভাশুভ বাসনার উদ্ভব হইয়া থাকে। এই সকল কারণের বিপাকে জন্ম (দেহসম্বন্ধ), আয়ুঃ (দেহের স্থিতিকাল) ও ভোগ (সুখ-দুঃখের অনুভব) অনিবার্য হয়। ইহারই নাম কার্মমল। ইহা কর্ম হইতে উৎপন্ন কঞ্চুকরূপ আবরণ। কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি এবং ইহাদের সমষ্টিভূত মায়া। পুর্যষ্টক ও স্থূলভূতময় বিভিন্ন জাতীয় কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ, এইসকল দেহের আশ্রয়ভূত বিচিত্র ভুবন ও নানাপ্রকার ভোগ্যপদার্থের অনুভবের কারণ মায়ীয় মল রূপে প্রসিদ্ধ।[২] বদ্ধ আত্মাতে এই তিন প্রকার আবরণ সর্বদাই থাকে। দীক্ষার দ্বারা মলিন আত্মার সংস্কার হইয়া থাকে। মলনিবৃত্তি তো হয়ই, নিবৃত্তির সংস্কার পর্যন্ত শান্ত হইয়া যায়।

"দীয়তে জ্ঞানসদ্ভাবঃ, ক্ষীয়তে পশুবাসনা।
দানক্ষপণসংযুক্তা দীক্ষা তেনেহ কীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ যাহার দ্বারা জ্ঞান প্রদত্ত হয় এবং পশুবাসনার ক্ষয় হয় এই প্রকার দান ও

১ ইহারই পারিভাষিক নাম "অভিলাষ"। ইহাকে ভ্রমবশতঃ অনেকে রাগতত্ত্ব মনে করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা রাগ নহে। রাগ বলিতে বোঝায় বিষয়াসক্তি, যাহা "আমি কিছু চাই" এইরূপ ভাষার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। এই রাগসম্বন্ধবশতঃই পুরুষ ভোক্তারূপে পরিণত হয়। কিন্তু অভিলাষ বলিতে এইরূপ কোন ভাব বুঝায় না। ইহা শুধু অপূর্ণতার বোধমাত্র এবং ইহাই অন্যান্য মলের ভিত্তিস্বরূপ।

২ স্বরূপে শরীর, ভুবন, ভাব ও ভূত যাহা কিছু প্রতিভাত হয় সবই মায়ীয় মলের অন্তর্গত। নিজের স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে কোন পদার্থের ভানকে মায়ার রূপ বলিয়া জানিতে হইবে। কলা হইতে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত যাবতীয় তত্ত্বই দেহস্থিত মায়ীয় পাশরূপ জানিতে হইবে। এই পাশ শরীর, ইন্দ্রিয়, ভুবন, ভাব প্রভৃতিকে ভোগসম্পাদনের জন্য আকার প্রদান করে। কলা হইতে পৃথিবী পর্যন্তই সংসার।

ক্ষপণযুক্ত ক্রিয়ার নাম দীক্ষা। ইহাই দীক্ষার স্বরূপ। শক্তিপাতের তীব্রতাদি ভেদ এবং শিষ্যের অধিকার বৈচিত্র্যানুসারে দীক্ষা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। শক্তিপাতের স্বরূপ, লক্ষণ, প্রকারভেদ এবং চিহ্ন প্রভৃতির বিবরণ শক্তিপাত-রহস্য প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। পাশের প্রশমন এবং শিবত্বের অভিব্যক্তির যোগ্যতা দীক্ষা হইতে উৎপন্ন হয়। ভর্জিত বীজ যেমন অংকুরিত হয় না সেইপ্রকার মন্ত্রের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে প্রভাবিত পাশ-সকলেরও পুনরায় প্ররোহ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

জীবের মোক্ষদাতা ঈশ্বর। পাশের বিচ্ছেদ এবং সর্ববিষয়ক জ্ঞান-ক্রিয়ার উদ্ভব অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্ব ও কর্তৃত্বের স্ফুরণ, ইহাই মোক্ষের স্বরূপ। পরমেশ্বর নিজের ক্রিয়াশক্তিরূপ দীক্ষার দ্বারা পশু-আত্মাকে মুক্ত করিয়া থাকেন। কোন একটি অথবা দুইটি পাশের বিচ্ছেদকে মোক্ষ বলে না। মোক্ষ অবস্থাতে অজ্ঞতা, অকর্তৃত্ব প্রভৃতি আত্মাতে থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত পশু-আত্মা স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না। সেইজন্য তাহার নিজের ক্রিয়া, জ্ঞান প্রভৃতি উপায় দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। প্রকৃতি প্রভৃতি পাশেরই অন্তর্গত। এই সকল পদার্থ হইতেও মোক্ষের উদয় হইতে পারে বলিয়া স্বীকার করা চলে না। একমাত্র পরমেশ্বরই জীবকে মুক্তিদান করিতে পারেন। কেননা আর কাহারও পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই।

আরও একটি কথা আছে ঃ সিদ্ধান্তে মোক্ষ মোচনীয় জীবের অবস্থাবিশেষের নাম। ইহা মোচনকারী বস্তুর অবস্থাবিশেষ নহে। কারণ, এই মতে মোচনকারী বস্তু একমাত্র পরমেশ্বর। পরমেশ্বর নিত্যমুক্ত বলিয়া কোন সময়েই তাঁহাতে কোন বিশেষ ধর্মের আধান হইতে পারে না। কোন কোন আচার্য মনে করেন যে অজ্ঞান রূপ মলে আচ্ছন্ন পুরুষই ভ্রমবশতঃ সংসারে ভ্রমণ করিতেছে এবং সে স্বয়ংই উহার বিরুদ্ধ-ভাবনার অভ্যাসের বলে বিবেক ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পর অজ্ঞাননিবৃত্তিবশতঃ সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি স্বরূপধর্ম প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর কেবল অধিষ্ঠাতামাত্র। এই মতে মোক্ষের কর্তৃত্ব পুরুষের। কিন্তু অধিকাংশ আচার্য এই মত সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন যে ধর্মাধর্মের কর্তৃত্ব পুরুষে আছে ইহা খুবই সত্য, কারণ কলা প্রভৃতির দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে আত্মার মল অপসারিত হইলে উহার সম্বন্ধবশতঃ পুরুষের জ্ঞানক্রিয়া যৎকিঞ্চিৎ বিকসিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিকাস কখনই এত অধিক পরিমাণে হইতে পারে না যে উহার দ্বারা সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণের স্ফুরণ হইতে পারে। অতএব কলা প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণমন-নিবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া পুরুষের কর্তৃত্বাদি ধর্ম অবিচ্ছিন্নই থাকিয়া যায়।

কোন কোন আচার্য পাশের নিবর্তনস্বভাব স্বীকার করেন। তাঁহারা

বলেন যে পাশসকল নিজ স্বভাববশতঃই নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না, কারণ জীব অথবা পাশের নিজ হইতে প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির কোন ক্ষমতা নাই। ঈশ্বরের প্রেরণা সর্বত্রই আবশ্যক। এইজন্য মোক্ষের কর্তৃত্ব ঈশ্বরেই স্বীকার করা উচিত। ইহা অবশ্যই সত্য যে সংসারদশাতে কার্য এবং কারণরূপী পাশসমূহ নানাপ্রকারে আত্মাতে জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে মোক্ষ বিষয়ে পাশের স্বয়ংকর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। মোক্ষ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি। যে ব্যঞ্জকে যে প্রকার ব্যঞ্জনাশক্তি প্রতীত হয় উহাকে অন্যত্র অজ্ঞাত বিষয়েও ঐ প্রকার ব্যঞ্জনা-শক্তিযুক্ত বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। সুতরাং কার্য ও করণরূপে প্রতীয়মান অচেতন পাশে ঈশ্বরের প্রেরণা এবং স্বতঃসিদ্ধ ব্যঞ্জনাশক্তি বর্তমান থাকিলেও দেহাদিতে আত্মবোধ থাকার দরুণ উহা যেপ্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি করিবে তাহা নিজের আবরণাত্মক আকারের সহিত সম্বন্ধ, স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে অনুরাগযুক্ত, কোন সময়ে, কোন স্থলে এবং কোন বিষয়ে রাগদ্বেষাদি বিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা স্পন্দনযুক্ত এবং শরীরাদি নাশের সঙ্গে সঙ্গে নাশশীল। পূর্ণ জ্ঞানক্রিয়ার নাম মোক্ষ। এইজন্য পাশের দ্বারা উহা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। দীপ ঘরকে প্রকাশিত করে, তাই বলিয়া উহা ব্রহ্মাণ্ডকেও প্রকাশিত করিবে ইহা বলা চলে না। সিদ্ধপুরুষের জ্ঞানক্রিয়াশক্তি পরমেশ্বরের শক্তির ন্যায় পাশ সকলকে নষ্ট করে। পশুদের মত উহা পাশের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় না এবং শরীরাদিতে আত্মবোধ ও অনুরাগাদি যুক্তও নহে।

শৈব আগম মত

দ্বৈতমতে আণবমল অজ্ঞান নহে। কিন্তু অজ্ঞানের হেতুভূত দ্রব্যবিশেষ। ইহাই আত্মার অনাদি আবরণের কারণ। যেমন চক্ষুতে জাল (ছানি) উৎপন্ন হয়, আণবমলও সেই প্রকার। ইহা দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান ইহার বিরোধী নহে। ইহা দীক্ষারূপ ক্রিয়া দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। মলের নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হয়। এই মতে অজ্ঞান দুইপ্রকার ঃ—

(ক) প্রথম অজ্ঞান বুদ্ধিগত অবিবেক। পূর্বে সাদৃশ্যের অনুভব থাকিলেই এইপ্রকার অজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, না থাকিলে নহে—রজ্জুতে সর্পভ্রম ইহার উদাহরণ। এইপ্রকার অজ্ঞান বিবেকজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। "ইহা সর্প নহে, কিন্তু ইহা রজ্জু" এইপ্রকার জ্ঞানই বিবেকজ্ঞানের স্বরূপ।

(খ) দ্বিতীয় অজ্ঞান বিকল্পজ্ঞান। এই প্রকার অজ্ঞান কাচ, কামল প্রভৃতি

দ্রব্যের সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়। দ্বিচন্দ্রজ্ঞান, পীতশঙ্খজ্ঞান প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। ইহার নিবৃত্তি জ্ঞান হইতে হয় না, কারণ স্বরূপদ্রব্যের নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই জাতীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না।

দ্বৈত আগমের মতে আত্মার অজ্ঞান বিকল্পাত্মক, ইহা দ্রব্যবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা বুদ্ধিগত অবিবেকমাত্র নহে। এই দ্রব্যের নাম মল। ইহার বিশেষ বিবরণ আগমশাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বৈত আগমের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর দীক্ষা ব্যাপার দ্বারা এই মলরূপ আবরণকে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন। এইজন্য মোক্ষের কর্তা আত্মা নহেন, ঈশ্বর। "দীক্ষৈব মোচয়ত্যূর্ধ্বং শৈবংধাম নয়ত্যপি" অর্থাৎ দীক্ষাই মুক্ত করে এবং উপরদিকে অর্থাৎ শিবধামের দিকে সঞ্চালন করে।

জ্ঞান ও ক্রিয়া মূলতঃ অভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের শক্তি এক ও অখণ্ডিত। ইহা অভিন্ন জ্ঞানক্রিয়াত্মক, অর্থাৎ একই সঙ্গে জ্ঞানক্রিয়া উভয়ই এবং উভয়ে কোন ভেদ নাই। যদি জ্ঞান হইতে ক্রিয়া ভিন্ন হইত, তাহা হইলে যেমন ঈশ্বরের সহিত মায়ার সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না ঠিক সেই প্রকার ইহার সহিতও সম্বন্ধ স্বীকার করা সম্ভব হইত না। তাহার ফলে ঈশ্বরকে ক্রিয়াশক্তির অভাববশতঃ অকর্তা মানিতে হইত। এইপ্রকারে কর্তা না থাকার দরুণ বিশ্বরচনার কোনপ্রকার ন্যায়সঙ্গত উপপাদন হইত না। সত্য কথা এই যে, জ্ঞান ও ক্রিয়ার ভেদ কল্পিত। ক্রিয়াশক্তি প্রযত্নরূপে এক হইলেও, ব্যাপারের ভিন্নতাবশতঃ বামা, জ্যেষ্ঠা এবং রৌদ্রী এই তিনপ্রকার স্বীকার করা হয়। জগতের স্থিতি এবং সংরক্ষণাত্মক ব্যাপার রোধ এবং আবরণস্বরূপ বলিয়া ইহা বামাশক্তির কার্য, সংহার জ্যেষ্ঠাশক্তির কার্য, এবং পাশক্ষয় অথবা অনুগ্রহ রৌদ্রীনামক ক্রিয়াশক্তির কার্য।

অনুগ্রহের প্রবৃত্তি কি প্রকারে হয় ইহাই মুখ্য প্রশ্ন। সিদ্ধান্ত এই যে মল অথবা বামাশক্তির আবরণাত্মক অধিকার যখন সমাপ্ত হয় এবং অনুগ্রহের প্রবৃত্তি হয় তখন আত্মাতে একটি অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হয়—আত্মা তখন কৈবল্যাভিমুখী হইয়া পড়ে। এইজন্য সূক্ষ্ম স্বায়ম্ভুব তন্ত্রে আছে—"ক্ষীণে তস্মিন্ যিযাসা স্যাৎ পরং নিঃশ্রেয়সং প্রতি।" এই ভাবের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর পশুআত্মার জ্ঞানগত ও ক্রিয়াগত আবরণ ছিন্ন করিয়া দেন। তিনি সর্বদাই জগতের উদ্ধারকার্যে প্রবণ রহিয়াছেন। তাই আত্মার শুভ ইচ্ছার উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কৃপা কার্যকরী হইতে আরম্ভ হয়। পশু আত্মাতেও বস্তুতঃ জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়েই অনন্ত, কিন্তু অনন্ত হইলেও উহা মলের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। মল পরিপক্ব হইলে ঐ আচ্ছাদন অপসারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয়—ইহা অদ্বৈত আগম মত।

অদ্বৈতবাদী তন্ত্রমতে অজ্ঞান এবং জ্ঞান উভয়ই পৌরুষ এবং বৌদ্ধ ভেদে দুইপ্রকার। পৌরুষজ্ঞানে কোনপ্রকার বিকল্প থাকে না। কৃত্রিম অহংকারাদি বিকল্প উহাতে থাকিতে পারে না—উহা পূর্ণাহন্তাময় বোধস্বরূপ। যতদিন পরমেশ্বরের সঙ্গে পূর্ণরূপে তাদাত্ম্যলাভ না হয় ততদিন ইহার অভিব্যক্তি হয় না। এই তাদাত্ম্যলাভের পূর্বে যাবতীয় বন্ধন নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। পৌরুষ অজ্ঞানরূপী আণবমল এবং কার্ম ও মায়ীয় মল ক্ষীণ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধন দূর হইতে পারে না। দীক্ষার প্রভাবে পৌরুষ অজ্ঞান অথবা আণবমল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বর্তমান দেহের আরম্ভক কার্মমল থাকে বলিয়া পৌরুষজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এই মলেরই নামান্তর প্রারব্ধ কর্ম। ইহা কাটিয়া গেলে দেহপাত হইয়া যায়। সেই সময় পৌরুষজ্ঞান আত্মসাক্ষাৎকাররূপে উদিত হয়। তখন জীব শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শক্তিপাতের তীব্রতা অনুসারে দীক্ষাক্রম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যখন শক্তিপাত অত্যধিক তীব্র হয় তখন যে দীক্ষা হয় তাহা অনুপায় ক্রমের দীক্ষা। তাহাতে শাম্ভব, শাক্ত ও আণব উপায়ের সম্বন্ধ থাকে না। এই অনুপায় দীক্ষার প্রভাবে একই ক্ষণে পূর্ণত্বলাভ হইতে পারে। ইহা হইল অত্যধিক মাত্রায় শক্তিপাতের ফল। যখন শক্তিপাত অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় ঘাটে, তখন ক্রমশঃ শাম্ভবী দীক্ষা, শাক্তী দীক্ষা এবং আণবী দীক্ষার সম্ভাবনা থাকে। দীক্ষা ভিন্ন মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই ইহা অবশ্যই সত্য, কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে সর্বত্রই বাহ্যক্রিয়া আবশ্যক। আত্মসংস্কাররূপ আন্তর-দীক্ষার প্রয়োজন সর্বত্রই আছে। কিন্তু বাহ্যক্রিয়ার আবশ্যকতা সর্বত্র স্বীকৃত হয় না। অদ্বৈত আগমশাস্ত্র হইতে যে বৌদ্ধজ্ঞান উদিত হয় তাহার প্রভাবে বৌদ্ধ অজ্ঞান এবং উহার কার্য নষ্ট হইয়া যায়, ইহা হইতে জীবন্মুক্তির প্রাপ্তি ঘটে। দীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। এইজন্য দীক্ষা হইয়া গেলেও বিকল্পের উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। বৌদ্ধজ্ঞান উদিত হইলে বিকল্পসকল উন্মূলিত হয় এবং সদ্যোমুক্তি প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু যে চিত্তে বিকল্প থাকিয়া যায় উহার মুক্তি দেহ থাকা পর্যন্ত হইতে পারে না। দেহ কাটিয়া গেলে উহার শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটে। বিকল্পশূন্য চিত্তের যে সদ্যোমুক্তি তাহাকে জীবন্মুক্তি বলে। বিকল্প নিবৃত্ত হওয়ার পর দেহ থাকিলেও মুক্তিতে কোন বাধা থাকে না। এইজন্য দীক্ষাপ্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণত্বলাভ পর্যন্ত অবস্থাসকলের ক্রম এইপ্রকারে প্রদর্শিত হইতে পারে—

(১) দীক্ষা।

(২) পৌরুষ অজ্ঞানের ধ্বংস।

(৩) অন্বয় আগমশাস্ত্রের শ্রবণবিষয়ে অধিকারপ্রাপ্তি এবং তাহার পর শ্রবণাদি সাধন।
(৪) বৌদ্ধজ্ঞানের উদয়।
(৫) বৌদ্ধ অজ্ঞানের নিবৃত্তি।
(৬) জীবন্মুক্তি।
(৭) ভোগাদি দ্বারা প্রারব্ধনাশ।
(৮) দেহত্যাগের পর পৌরুষজ্ঞানের উদয়।
(৯) পূর্ণত্ব অথবা পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তি।

ভগবানের জীবোদ্ধার ক্রম

শ্রীভগবানই গুরু। তিনিই জীবের উদ্ধারকর্তা। তিনিই জীবকে মায়াপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে স্থাপিত করিতে সমর্থ। এই সামর্থ্য আর কাহারও নাই। এইজন্য সর্বত্র তাঁহাকেই গুরুরূপে বর্ণন করা হইয়া থাকে।[৩] যোগভাষ্যে লিখিত আছে—"তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্। জ্ঞানধর্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি" —অর্থাৎ তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কল্পপ্রলয়ে এবং মহাপ্রলয়ে জ্ঞান এবং ধর্মের উপদেশ দ্বারা সংসারী জীবমাত্রকে উদ্ধার করাই তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন। ইহাই তাঁহার কৃপা। জীব অনুগ্রহের যোগ্য হইলেই তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা সত্য। এই বিষয়ে কোন কালনিয়ম নাই।

কালের ভেদানুসারে জীবোদ্ধারের প্রণালীতে বৈচিত্র্য ঘটে। প্রলয়কালে সমস্ত কার্যবর্গ পরমকারণে লীন হইয়া যায়। তখন জীবের দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি কিছুই থাকে না, কিন্তু এই সময়েও প্রয়োজনানুরূপ মলপাকসম্পন্ন হইলে অনুগ্রহপ্রাপ্তিতে কাহারও বিঘ্ন ঘটে না। সৃষ্টি সময়েও এইপ্রকারই হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুই সময়ে কোন কোন অংশে পরস্পর পার্থক্য থাকে। যে সকল জীবের কর্মক্ষয় ঘটে নাই তাহারা প্রলয়াকল অণু রূপে প্রলয়সময়ে মায়াগর্ভে লীন হয় এবং যাহাদের সকল কর্ম ক্ষীণ হইয়া যায় তাহারা মায়া অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানাকল অণুরূপে মায়া ও মহামায়ার অন্তরালে বর্তমান

---

৩ পাতঞ্জল যোগসূত্রে ঈশ্বরকে পূর্বগুরুবর্গেরও গুরুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সৃষ্টির আদিগুরু প্রতি সৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকেন। ইহাদিগকেই সিদ্ধপুরুষ এবং কার্যেশ্বর বলা হয়। কিন্তু পরমেশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন ও নিত্যসিদ্ধ। তিনি কার্যেশ্বরবর্গেরও ঈশ্বরস্বরূপ। তিনি অনাদি গুরুতত্ত্ব।

থাকে। প্রলয়সময়ে যে অনুগ্রহ বা দীক্ষা হয় তাহার প্রভাবে জীব সাক্ষাৎ শিবত্বলাভ করে। ঐ সময়ে অশুদ্ধসৃষ্টি থাকে না বলিয়া উহার উপর অধিকারের উপযোগিতা থাকে না অর্থাৎ জগদ্ব্যাপার ঐ সময়ে থাকে না। ইহাকে শাস্ত্রে নিরধিকার মুক্তি বলা হয়। আধিকারিক পদপ্রাপ্তি প্রলয়কালীন অনুগ্রহ হইতে ঘটে না, কিন্তু সৃষ্টি ও সংহারকালে নিরধিকার মুক্তিও হইতে পারে এবং মলপাকের বৈলক্ষণ্যবশতঃ ঐশ্বর্য অথবা সাধিকার মুক্তিও হইতে পারে।[৪] ইহার মধ্যে যাহারা সংহারকালে সাধিকার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় তাহারা রুদ্রাণু অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। এইসকল আত্মা আগামী সৃষ্টিতে সৃষ্টির অধিকার প্রাপ্ত হয়। যাহারা সৃষ্টির সময়ে সর্বজ্ঞানক্রিয়ার অভিব্যক্তিরূপ অনুগ্রহ লাভ করে তাহারা উহার ফলে আধিকারিক পদ প্রাপ্ত হয়। ইহারা পরমন্ত্রেশ্বর, মন্ত্র ও অপরমন্ত্রেশ্বর প্রভৃতি পদে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] এই সকল মন্ত্রেশ্বর মায়িক জগতে বিভিন্ন বিভাগে প্রধান শাসক ও ব্যবস্থাপকরূপে নিয়োজিত হন। যাহারা পরমন্ত্রেশ্বর তাহারা মায়াতীত মহামায়ারাজ্যে ঈশ্বরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া আপন আপন ভুবনে বিরাজ করিয়া থাকেন। পরমন্ত্রেশ্বর মোট আটটি—ইহাদের মধ্যে অনন্তই প্রধান। ইঁহাদের প্রত্যেকের দেহ, ভোগ্য বিষয় এবং ভুবন প্রভৃতি বিশুদ্ধ বৈন্দব উপাদানে রচিত। ইহাদের মধ্যে কোনোটি মায়ার স্পর্শে কলঙ্কিত নহে। ইহার পর অর্থাৎ মন্ত্রেশ্বর পদের প্রতিষ্ঠার পর পরমেশ্বর সাতকোটি বিজ্ঞানাকল অণুকে সাক্ষাৎভাবে সর্বজ্ঞত্ব

৪ সৃষ্টি অথবা সংহারকালেও শিবত্ব লাভের সম্ভাবনা থাকে, তবে অত্যন্ত কম ইহার কারণ এই যে মলপাক ও পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ইহার কোনটি কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে।

৫ প্রলয়াকল জীব পরমেশ্বরের সাধিকার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইলে 'মায়াগর্ভাধিকারী' নামে পরিচিত হয়। ইহাই অপরমন্ত্রেশ্বরের পদ। এই সকল জীবের সম্যক্‌রূপে কর্মক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া মায়া ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান থাকে না। সেইজন্য ইহারা প্রলয়কালে মায়াগর্ভে লীন থাকে এবং অভিনব সৃষ্টিতে জাগিয়া উঠার পর পূর্ববৎ মায়িকদেহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা পরমেশ্বরের সাধিকার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের বৈন্দব দেহপ্রাপ্তিও ঘটে। বিজ্ঞানাকল জীব সাধিকার অনুগ্রহবশত মলপাকের তারতম্য অনুসারে পরমন্ত্রেশ্বর অথবা মন্ত্রপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাদের মায়িকদেহ থাকে না, শুধু বৈন্দবদেহ থাকে। অনুগ্রহপ্রাপ্তির পূর্বে ইহারা মায়া-পুরুষ বিবেকজ্ঞানবশতঃ বিজ্ঞান-কৈবল্য অবস্থাতে মায়ার ঊর্ধ্বে বিদ্যমান ছিল। এইজন্য বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া বিশুদ্ধ অধ্বার সৃষ্টি হওয়ার সময় সর্বপ্রথম ইহারাই বিশুদ্ধ দেহ ও ভুবনাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রভৃতি শক্তির অভিব্যঞ্জনার দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া মন্ত্রপদে স্থাপিত করেন। অপরমন্ত্রেশ্বর মায়াগর্ভের অধিকারী। ইঁহাদিগের দেহ একসঙ্গে মায়িক এবং বৈন্দব উভয়ই। ইঁহাদিগেরও আপন আপন ভুবন, দেহ, ভোগ্য বিষয়াদি ঐ সকল বিভিন্ন তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে।

এই যে সৃষ্টি, সংহার ও প্রলয়কালে ভগবানের অনুগ্রহের কথা বলা হইল ইহা সাক্ষাৎ ভগবানের অনুগ্রহই জানিতে হইবে। কোন পুরুষের দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া এই অনুগ্রহ প্রবৃত্ত হয় না। সংহারকাল ও প্রলয়কালের মধ্যে পার্থক্য আছে। যখন কার্য কারণে লীন হইতে থাকে তখন এই সময়কে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কার্য কারণে সম্পূর্ণভাবে লীন না হয় সেই সময়কে সংহারকাল বলে। কার্য লীন হওয়ার পর নবীনসৃষ্টির প্রারম্ভ পর্যন্ত যে সময় তাহার নাম প্রলয়কাল। তান্ত্রিক পরিভাষাতে এই সাক্ষাৎ অনুগ্রহকে নিরধিকরণ অনুগ্রহ বলে, কিন্তু স্থিতিকালে পরমেশ্বর সাধারণতঃ আচার্য অথবা গুরুর দেহকে সাক্ষাৎভাবে অথবা পরম্পরাক্রমে আশ্রয় করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি কলাবিশিষ্ট স-কল জীবকে অনুগ্রহ করেন। যে সকল জীব নিরন্তর তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে শুদ্ধ চিদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের উপরই এইপ্রকার অনুগ্রহ হয়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে, পূর্ণরূপে মলপাক সম্পন্ন হইলে স্থিতিকালেও কখনো কখনো কোনো কোনো বিরল জীবাত্মার উপর নিরধিকরণ অনুগ্রহ ঘটিয়া থাকে। সাধিকরণ অনুগ্রহের প্রভাবে শিবত্বলাভ হইতে পারে অথবা কোন আধিকারিক পদের প্রাপ্তিও হইতে পারে। এইসকল বিভিন্ন পদের প্রাপ্তি শক্তিপাতের তীব্রতাদি বৈচিত্র্য হইতে ঘটিয়া থাকে। এই সকল পদ স্থূল দৃষ্টিতে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে ঃ—

(ক) পঞ্চাষ্টক প্রভৃতি রুদ্রগণের পদ (রুদ্রপদ)।
(খ) শতকোটি মন্ত্রের পদ (মন্ত্রপদ)।
(গ) অপর-মন্ত্রেশ্বর বর্গের পদ (পতিপদ)। এই 'পতিপদ'

অনন্তাদির পদ হইতে ভিন্ন। মনে রাখিতে হইবে যে এই অনন্তাদি পদ প্রাপ্তি হইলে পর মায়া ও কর্মের অভাববশতঃ অধোগতি অথবা পতন হইতে পারে না। রৌদ্রাগমে আছে—

ভুক্ত্বা ভোগান্ সুচিরমমরস্ত্রীনিকায়ৈরুপেতাঃ।
স্রস্তোৎকণ্ঠাঃ শিবপদপরৈশ্বর্যভাজো ভবন্তি ॥

অর্থাৎ এইসকল অনন্তাদি পদ যাঁহারা প্রাপ্ত হন তাঁহারা দীর্ঘকাল দেবাঙ্গনাদের সহিত ভোগসকল উপভোগ করিয়া আকাঙ্ক্ষাশূন্য হাওয়ার পর শিবপদে স্থিত হইয়া পরম ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন।

(ঘ) ঈশ্বর (অনন্ত), সদাশিব ও শান্তস্বরূপ ঈশানের পদ (ঈশানপদ)। এইসকল পদের প্রাপ্তি সালোক্যাদি পদের প্রাপ্তি বলিয়া জানিতে হইবে।

তান্ত্রিকগণ বলেন যে আগম-প্রতিপাদিত জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়া যাঁহারা অন্যপ্রকার জ্ঞান ও যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধিনিবন্ধন মধ্যস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইঁহাদিগের মধ্যে দুইটি বিরুদ্ধ কর্মের অভিব্যক্তি সমান সমান হইয়া থাকে। ইহার ফলে উপকারীর প্রতি প্রসন্নতা এবং অপকারীর প্রতি ক্রোধ, সাম্যরূপা অভিন্নবৃত্তিরূপে পরিণত হয়। এই অবস্থার সাম "মাধ্যস্থ্য"। তাঁহাদিগের পরিভাষা অনুসারে ইহারই নাম জীবন্মুক্তি।[৬]

সাধিকার মুক্তি ও তাহার প্রকারভেদ

তন্ত্রপ্রতিপাদিত সাধিকার মুক্তি নানাপ্রকার। এইসকল সাধিকার মুক্তিতে দীক্ষা প্রভৃতি উপায়ের বৈচিত্র্য আছে, এবং তত্ত্বপদপ্রাপ্তির জন্য প্রীতি, শ্রদ্ধা প্রভৃতির তারতম্য আছে। অতএব উপায় ও আদরের বৈলক্ষণ্যবশতঃ যোগ্যতা তিনপ্রকার বলিয়া উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট এই তিনপ্রকার সাধিকার পদের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই তিন পদের নাম—মন্ত্রমহেশ্বর, মন্ত্রেশ্বর ও মায়িক অধিকারী। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে আশংকার পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না কারণ এই সকল পদ চরম অবস্থা অথবা পরাসিদ্ধির দ্যোতক নহে। এইজন্য এই সকল পদে আত্মা নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে পারে না। তাছাড়া এই অবস্থাতে নিজ পদ হইতে স্খলিত হইয়া পতনের আশংকাও থাকিতে পারে। তৎ তৎ ভুবনের প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ বাস্তবিক মোক্ষ নহে, ইহা মোক্ষের আভাস মাত্র। এই অবস্থা মহাপ্রলয় পর্যন্তই থাকিতে পারে। নবীন সৃষ্টির প্রারম্ভকালে ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের প্রভাবে অধোগতির আশংকা থাকে, কারণ কর্মফলভোগ মায়ার অন্তর্ভুক্ত সংসারমণ্ডলেই হইতে পারে। কিন্তু এইসকল ভুবনে থাকিলেও মুক্তি হইতে পারে। মল পরিপক্ব হইলে যখন দীক্ষালাভ হয় তখন মুক্ত হওয়ার মার্গে অধিকার লাভ হয়। প্রত্যেক ভুবনেই দীক্ষার দ্বারা বদ্ধজীবকে মুক্ত করিবার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন সদ্গুরু বিদ্যমান থাকেন।

ন হৃষ্যত্যুপকারেণ নাপকারেণ কুপ্যতি।
যঃ সমঃ সর্বভূতেষু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ যিনি উপকারে প্রসন্ন হন না এবং অপকারেও কুপিত হন না এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টি থাকেন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। কিন্তু অগমসম্মত জীবন্মুক্তি ইহা হইতে পৃথক্।

তাই স্বায়ম্ভুব আগমে বলা হইয়াছে—"ভুবনে ভুবনে গুরবঃ প্রতিবসন্তি।" এই সকল পদের মধ্যে মন্ত্রমহেশ্বর পদ শ্রেষ্ঠ। এই সকল পদের অধিকার সমাপ্ত হইলেই অপবর্গ লাভ হয়। তখন পতনের কোন আশংকা থাকে না।

প্রলয়ের সময় যখন ভগবান জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে দীক্ষা দেন তখন তিনি জীবের পূর্ববর্ণিত তিন প্রকার যোগ্যতাবিষয়ে ধ্যান দেন না। এই সকল বিভিন্নপ্রকার যোগ্যতা অধিকারের সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রলয়কালে অধিকারের কোন উপযোগ থাকে না বলিয়া তখন অনুগ্রহকালে অধিকারবিষয়ক বিচার করা হয় না। তবে ইহা সত্য যে স্থিতিকালের যে অনুগ্রহ তাহা শিষ্যের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

পরমন্ত্রেশ্বর এবং মন্ত্রসকলের মুক্তিকে অপরামুক্তি বলে। ইহা পরমেশ্বরের বামাদি তিন শক্তির কার্য এবং ভগবদ্-আজ্ঞার অধীন। এইজন্য ইঁহারা শক্তিতত্ত্বের নীচে অবস্থান করেন।[৭] ইঁহারা উৎপন্ন হইয়া আপন আপন অধিকার ব্যাপারে ভগবৎ-প্রেরণাবশতঃ প্রবৃত্ত হন। ইঁহারা উভয়েই কলাদি কার্যকারণহীন এবং অধিকারবিশিষ্ট। তাই ব্যাপক হইলেও ইহাদিগকে মায়ার উপরিস্থিত বলিয়া মানা হয়। ইহাদের মধ্যে পরমন্ত্রেশ্বর মন্ত্রবর্গের প্রেরক বলিয়া ঊর্ধ্বস্থিত এবং তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয় বলিয়া মন্ত্রসকল অধঃস্থিত। এই উভয়ের উপর অনুগ্রহ করার পর ভগবান এই সকল মন্ত্রেশ্বরে অধিষ্ঠিত হইয়া মায়া হইতে কলাদি তত্ত্ব ও ভুবনাদি রচনা করেন এবং ঐ সকল কলা দ্বারা জীবসকলকে কর্মানুসারে যোজনা করেন। সর্বান্তে পরিপক্বমল জীবসকলকে মায়াগর্ভাধিকারী বা অপরমন্ত্রেশ্বর পদে স্থাপিত করেন। ভগবানের এই অনুগ্রহব্যাপার পরম্পরাতে ঘটিয়া থাকে, সাক্ষাৎরূপে নহে।

সময়দীক্ষা

তান্ত্রিকগণ বিভিন্ন গ্রন্থে দীক্ষার প্রকারভেদ বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বিভিন্ন দীক্ষার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ক্রম আছে। শিষ্যের যোগ্যতামূলক অধিকারভেদই এই ক্রমের মুখ্য কারণ। কিন্তু এই ক্রম স্বাভাবিক বলিয়া অপরিহার্য হইলেও অনেক-স্থলে যথাবৎ অনুসৃত হয় না। ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি আশ্রমচতুষ্টয় ক্রমবদ্ধ হইলেও

৭ এই অধোবর্তিতা দেশকৃত নহে। কারণ এইসকল আত্মা সমরূপে ব্যাপক ও বিভু। কিন্তু ক্রিয়াশক্তি বিষয়ে তারতম্য থাকার দরুণ ঊর্ধ্ব এবং অধঃ এইপ্রকার নির্দেশ করা হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে বিভুত্ব সমান থাকিলেও ক্রিয়াশক্তির বিকাশে ন্যূনতাবশতঃ অধোবর্তী বলা হইয়া থাকে।

যেমন তীব্র বৈরাগ্যস্থলে মধ্যবর্তী এক বা দুই আশ্রম লঙ্ঘনপূর্বক পূর্ববর্তী কোনো আশ্রম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার জন্মে, ঠিক সেইপ্রকার দীক্ষাক্রম বিষয়েও বলা চলে।

সকলপ্রকার দীক্ষার মধ্যে প্রথমে সময়দীক্ষাই আলোচ্য। এই দীক্ষাতে সকল পশু আত্মার সমান অধিকার আছে। ইহাতে কাল ও আশ্রমাদির নিয়ন্ত্রণ নাই। আত্মার অনাদি মল কিঞ্চিন্মাত্র পক্ব হইলেই যখন ভগবানের কৃপাশক্তি অত্যন্ত মন্দরূপে জীবে অবতীর্ণ হইতে থাকে তখনই এই দীক্ষা হইতে পারে। গুরুকর্তৃক শিষ্যের মস্তকে শিবহস্তের অর্পণই সময়দীক্ষার স্বরূপ। এই দীক্ষার পর গুরুশুশ্রূষা ও বিভিন্ন দেবপূজাতে অধিকার জন্মে। তাহা ছাড়া ভগবানের প্রতি ভক্তির উন্মেষও হইতে থাকে। এই দীক্ষার প্রধান ফল প্রাক্তন কর্মসমূহের পরিপাক। কর্ম পরিপক্ব না হইলে নষ্ট হইতে পারে না। যদিও কালরূপী অগ্নিদ্বারা নিরন্তরই কর্মসমূহ পক্ব হইতেছে তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কাল ক্রমধর্মক বলিয়া কালকৃত পাকও ক্রমিক ভোগের দিকে চিত্তের উন্মুখতামাত্র। ক্রমিক ভোগ দ্বারা কর্মক্ষয় অবশ্য হয় সত্য, তবে ক্রমশঃ হয়, একসঙ্গে হয় না, হইতে পারেও না। তাহা ছাড়া উহা দ্বারা কর্ম কোনো সময়েই নিঃশেষ হইতে পারে না, কারণ কর্মের মূল নষ্ট না হওয়ার দরুণ নূতন কর্মের সঞ্চয় হইতেই থাকে। অনাদিকাল হইতে অসংখ্য কর্ম উপচিত হইতেছে—ঐগুলিকে এক একটি করিয়া ক্রমশঃ নষ্ট করা যায় না। এইজন্য দীক্ষা আবশ্যক, কারণ দীক্ষা সমষ্টিরূপে কর্মবন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ। সর্বান্তে কখনও না কখনও কর্ম একসঙ্গে নষ্ট হইতে পারে। উহাকেই পূর্ণতম জ্ঞানোদয় বলা হইয়া থাকে। অপূর্ণ জ্ঞানোদয়কালে সঞ্চিত কর্মরাশি নষ্ট হয় এবং দেহারম্ভক কর্ম বাকী থাকিয়া যায়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে কালশক্তিও ভগবানের ক্রিয়াশক্তিরই রূপান্তর। কাল রুদ্রবিশেষ (কালাগ্নিরুদ্র) বলিয়া কালশক্তি রৌদ্রীশক্তি। দীক্ষাও রৌদ্রীনাম্নী ক্রিয়াশক্তিরই ব্যাপার। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে মাত্রা ও বিকাশাদিগত পরস্পর বৈশিষ্ট্য আছে।

"সময়" বলিতে বুঝায় আগমশাস্ত্রীয় মর্যাদার পালন। প্রথম বা সময়দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে শাস্ত্রের অধ্যাপনা, শ্রবণাদি ও হোম, জপ, পূজন, ধ্যানাদিতে যোগ্যতালাভ হয়। সময়ীর আত্মা চর্যা ও ধ্যান দ্বারা শুদ্ধ হয়। গুরূপদিষ্ট শাস্ত্রোক্ত আচারাদির পালনকে চর্যা বলে। ধ্যান যোগাভ্যাসের নামান্তর। এই দীক্ষার প্রভাবে পূর্ণত্বলাভ হয় না এবং মন্ত্রারাধনক্রমে ভোগফলাভ হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে ঈশ্বরপদপ্রাপ্তি বা অপরামুক্তি লাভ হইতে পারে এবং পুত্রকাদি ভাবীপদ লাভ করার যোগ্যতা জন্মে। পাশশুদ্ধিই ঐশ্বর্যের

কারণ—এই দীক্ষা দ্বারা ঈশ্বরসম্বন্ধ হইলে উহা হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে পাশশুদ্ধি পাশসকলের সমূল নিবৃত্তি নহে। কারণ কলা, তত্ত্ব ও ভুবন প্রভৃতি ছয় অধ্বার শুদ্ধি ও পরতত্ত্বের যোজনা এই দুইটি ব্যাপার যতক্ষণ সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ সম্পূর্ণ পাশের অপগম ঘটে না এবং পূর্ণত্বলাভও হয় না, উহার জন্য সূক্ষ্ম বিধান আছে। কিন্তু সময়ীর জন্য এইপ্রকার বিধান নাই, আবশ্যকও হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে—সময়ীর ঈশ্বরারাধনযোগ্যতা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? ইহার উত্তর এই—এইপ্রকার যোগ্যতাপ্রাপ্তির জন্য শুধু অধিষ্ঠাতৃকারণবর্গের বিশ্লেষণই পর্যাপ্ত। ঐ পর্যন্ত সময়ীর সীমা।

জাত্যুদ্ধার, দ্বিজত্বপ্রাপ্তি ও রুদ্রাংশতালাভ—এই তিনটি ব্যাপার দ্বারা সময়ীর আত্মসংস্কার জন্মে। পশু আত্মা প্রারব্ধ ভোগের জন্য যে দেহলাভ করে সেই দেহসম্বন্ধ জাতির উৎকর্ষ লাভই জাত্যুদ্ধার নামে কথিত হয়। এই ব্যাপারটি যথাবিধি সম্পন্ন হইলে পূর্বজাতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে জাত্যুদ্ধার ক্রিয়ার প্রভাবে দেহের সূক্ষ্মতম অবয়বসংস্থানে আমূল পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়। ইহার পর যে অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য দ্বিজত্বলাভ। এই উভয় প্রক্রিয়াতে জাগ্রৎ মন্ত্রশক্তির উপযোগিতা আছে। মন্ত্রশক্তি অলৌকিক ও অচিন্ত্য। প্রয়োগকর্তা যদি যোগ্য হন তাহা হইলে ঐ শক্তির দ্বারা দুঃসাধ্য কার্যও সুগমতার সহিত সিদ্ধ হইতে পারে। সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম যে মন্ত্রশক্তি দেহে প্রয়োগ করা উচিত নহে। প্রারব্ধজনিত ভোগের খণ্ডন সম্বন্ধেই ঐ নিষেধের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। মন্ত্রে এমন সামর্থ্য আছে যে উহা প্রয়োগ করিতে পারিলে ক্ষণেকের মধ্যে প্রাণবিয়োগ হইয়া দেহপাত হইতে পারে। কিন্তু উহা করা উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে অভুক্ত প্রারব্ধকর্ম ভোগের জন্য দেহান্তের পরেও অবস্থান্তরে আবদ্ধ থাকা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহাতে মোক্ষলাভের জন্য কালবিলম্ব খুব অধিক হয়। শোষণ, দাহন, আপ্যায়ন ও জাত্যুদ্ধার প্রভৃতির জন্য বর্তমান দেহেও মন্ত্রপ্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। উগ্র মন্ত্রশক্তি দ্বারা দেহের শোষণাদি কার্য হয়—তাই অভিষেকের আবশ্যকতা।

দ্বিজত্বলাভের জন্য মন্ত্র দ্বারাই দেহের যোনি, বীজ, আহার, দেশ ও ভাবের শুদ্ধিসম্পাদন করিতে হয়। দেহ রজঃ ও বীর্যের সংযোগে উৎপন্ন হয়। রজোবীর্য শুদ্ধ না হইলে শুদ্ধদেহ হইতে পারে না। আজকাল গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কারের বিজ্ঞানরহস্য লোকে জানে না। স্ত্রী-পুরুষের নৈতিক সংযমের অভাব ও চিত্তের চঞ্চলতাবশতঃ বর্তমান যুগে বিশুদ্ধদেহের উৎপত্তি প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য তন্ত্রশাস্ত্রের আদেশ এই যে মন্ত্রশক্তি দ্বারা যোনি ও বীজের শোধন আবশ্যক। ইহা করিলে দেহগত অশুদ্ধি

নিবৃত্ত হইতে পারে। শ্রৌত এবং স্মার্ত প্রক্রিয়া অনুসারে আহার নির্বাহ করিলে আহার শুদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহাও ঠিক ঠিক হয় না। তাই এই ত্রুটির পূর্তির জন্য মন্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক হয়। ম্লেচ্ছাদির সম্বন্ধবশতঃ দেশ অশুদ্ধ হয় এবং অসত্য কুটিলতাদি দোষবশতঃ ভাব মলিন হয়। তাই মন্ত্রের দ্বারাই দেশ ও ভাবেরও শোধন করা আবশ্যক।

এইপ্রকারে শুদ্ধির আধান হইলে মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধবিদ্যাতে জন্মলাভের ফলে অলৌকিক দ্বিজত্বপ্রাপ্তি ঘটে।[৮] ইহারই নাম দ্বিতীয় জন্ম। দ্বিজত্ব অলৌকিক বলিয়া লৌকিক দ্বিজগণের জন্যও এই প্রক্রিয়া করণীয় বলিয়া মানা হয়।[৯] এই দীক্ষাতে একই জাতির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার নাম "শিবময়ী" ব ভৈরবীয় জাতি। ইহার পর কেহ পূর্বজাতির সহিত নিজের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিলে সে শাস্ত্রমতানুসারে প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হয়। দ্বিজত্ব সিদ্ধ হইলে শিশুকে উপবীত দেওয়ার নিয়ম আছে। ইহাও অলৌকিক। উপবীত গ্রহণের তাৎপর্য হইল আত্মার সান্নিধ্যে মন্ত্রসামর্থ্য দ্বারা সম্বন্ধ হওয়া। তন্ত্রশাস্ত্রমতে উপবীত

৮ গর্ভাধানাদি চল্লিশটি সংস্কার মন্ত্রশক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এইসকল সংস্কার শুদ্ধবিদ্যায় জন্মগ্রহণের জন্য সর্বথা উপযোগী।

৯ মন্ত্রশক্তির প্রভাবে বর্তমান শরীরের দাহ হয় এবং জাত্যুদ্ধার প্রভৃতি হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে এই প্রকার শুদ্ধতত্ত্বময় দেহান্তরের উৎপাদন এবং দ্বিজত্বাপাদন অন্য জাতিতেও করা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধি আছে যে যোগিগণ এখনও মন্ত্র দ্বারা নিজের ও অন্যের জাতির পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকেন। আগমমতে শিব, পুরুষ ও মায়া বাদে অন্য সকল তত্ত্ব এবং জাতি প্রভৃতি অনিত্য। তাই জাত্যুদ্ধার, দ্বিজত্বাপাদন প্রভৃতি ব্যাপারে কোন অংশেই অসঙ্গতি নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে দেহে শূদ্রত্বাদি জাতি নিত্য হওয়ার দরুণ জন্য নহে। তাই দ্বিজত্বাপাদন কেবল দ্বিজের জন্যই করণীয়, অন্যের জন্য নহে। এই মতানুসারে ইহা বর্তমান দেহবিষয়ক। তাঁহারা বলেন যে কর্মান্তরবশতঃ দ্বিজদেহ প্রাপ্ত হওয়ার পর আটচল্লিশ ক্রিয়াদ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়। ইহাতে শূদ্রাদির অধিকার নাই। ক্ষেমরাজ বলেন যে ইহা পারমেশ্বর আগমের মত নহে, কারণ এই ক্রিয়া অলৌকিক এবং ইহার সঙ্গে ভাবী দেহের সম্বন্ধ আছে। শঙ্কা হইতে পারে—তাহা হইলে ভুবনাধ্বাতে আটচল্লিশ সংস্কারের আধান দ্বারা দ্বিজত্বাপাদন করা হয় কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে এ শঙ্কা অমূলক, কারণ ঐ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য আলাদা। উহা পুত্রকের ভোগশুদ্ধির জন্য, সময়ীর জন্য নহে। বাগীশ্বরীতে গর্ভাধানাদি দ্বারা তৎ তৎ তত্ত্বে উদ্ভূত সম্পূর্ণ ভূতসর্গ অর্থাৎ চৌদ্দপ্রকার প্রাণীর ভোগশুদ্ধি করা আবশ্যক। দ্বিজভোগশুদ্ধিও উহার অন্তর্গত। ইহা উহার জন্যই করণীয়। সময়ীর জন্য তত্ত্বশোধনের আদেশ নাই। তাই সময়দীক্ষাতে ইহার কোন স্থান নাই।

অনন্ত মন্ত্র ও দেবতাবর্গের ব্যাপক শুদ্ধবিদ্যারূপ শক্তিসূত্রের প্রতিরূপক। গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত চল্লিশটি সংস্কারের বলে শুদ্ধবিদ্যাতে জন্ম হওয়ার পর সূক্ষ্মবিজ্ঞান অথবা ভাবনা দ্বারা চৈতন্যসংস্কার করিতে হয়। এই-প্রকার আটচল্লিশটি সংস্কার দ্বারা পূর্ণ দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়।

ইহার পর সময়ীর রুদ্রাংশাপাদন করা আবশ্যক। নিজে রুদ্রাংশ না হইলে শাস্ত্রার্থজ্ঞানপূর্বক রুদ্রের ধ্যানে একাগ্রতা লাভ করা অসম্ভব। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতে ঈশ্বরসম্বন্ধ প্রাপ্ত হওয়াও কঠিন। এই ক্রিয়া ঠিকভাবে করিতে হইলে গুরুর পক্ষে প্রথমে শিষ্যের প্রোক্ষণ ও তাড়ন করার আবশ্যকতা আছে। তারপর গুরু স্বয়ং ঊর্ধ্বমার্গীয় রেচক ক্রিয়া দ্বারা নিজ শরীর হইতে বাহির হইয়া শিষ্যের দেহে প্রবেশ করিবেন ও ঐ মার্গে শিষ্যের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছিবেন। সেখানে যাইয়া শিষ্যের চৈতন্য বা পুর্যষ্টককে শিথিল করিবেন। ইহার পারিভাষিক নাম বিশ্লেষণ ক্রিয়া। ইহাতে শরীরের সঙ্গে জীবনের এক সূক্ষ্মসূত্র বা রশ্মিমাত্রের সম্বন্ধ থাকিয়া যায়। ইহার পর পুর্যষ্টককে ছেদন করিয়া অর্থাৎ উহাকে পৃথক্ করিয়া উহার অবগুণ্ঠনকে শুদ্ধ উপাদান দ্বারা আবৃত করিতে হয়। অনন্তর সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ করিয়া দ্বাদশান্ত বা মস্তকে স্থাপন করিতে হয়। তারপর ঐ স্থান হইতে জীবকে সম্পুটিত করিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা টানিয়া নিতে হয়। এতটা কার্য সম্পাদনকালে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের অভেদজ্ঞান রক্ষা করা আবশ্যক। তাহার পর ঊর্ধ্বপূরক দ্বারা গুরুর নিজের হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতে হয়।

এই ব্যাপারে কুম্ভক দ্বারা স্বারস্য সম্পাদন করিয়া অর্থাৎ নিজের সঙ্গে শিষ্যের অভেদাপাদন করিয়া পুনর্বার ঊর্ধ্ব উদ্‌বেষ্টনের ক্রমে রেচন করিতে হয়। রেচনের সময়ে জীব উত্তরোত্তর ছয়টি দেবতাকেই ত্যাগ করে। ইহাদের নাম ও স্থান এই প্রকার—

১। হৃদয়ে ব্রহ্মা
২। কণ্ঠে বিষ্ণু
৩। তালুতে রুদ্র
৪। ভ্রূমধ্যে ঈশ্বর
৫। ললাটে সদাশিব
৬। ব্রহ্মরন্ধ্রে শিব

দেহের ন্যায় বাহ্যজগতেও এই ছয় দেবতার পরপর অধিষ্ঠান আছে। বস্তুতঃ বিশ্বের নিম্নতম প্রদেশ হইতে সমস্ত অধ্বাই এই ছয় দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত। দেবতাদের ত্যাগ হইতেই শিষ্যের পক্ষে উক্ত দেবতাদের অধিষ্ঠিত মার্গ হইতে বিশ্লেষলাভ করার যোগ্যতা জন্মে। স্বামীকে পরাভূত করিলে তাহার বশবর্তী

সকলেই অধীনতা স্বীকার করে। তাহাদের সঙ্গে পৃথক্ যুদ্ধ করিতে হয় না। দেবতাত্যাগের পর অর্থাৎ দেহ অথবা বিশ্বের অধিষ্ঠাতৃ কারণবর্গ হইতে বিশ্লেষ ঘটিবার পর ঈশ্বরপদের প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরারাধনার যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। ভ্রূমধ্য হইতে জীবকে নিয়া সম্পুটিত করিতে হয় ও সংহারমুদ্রা দ্বারা উহাকে উঠাইয়া পুনর্বার শিষ্যের হৃদয়ে স্থাপিত করিতে হয়।

ভোগদীক্ষা ঃ সাধকদীক্ষা

সময়ীদীক্ষার পর পুত্রকাদি অন্যান্য দীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত প্রথমেই পুত্রকাদি দীক্ষাও হইতে পারে। এই সময়ে দীক্ষাতে অধ্বাশুদ্ধি আবশ্যক। কিন্তু সম্পূর্ণ পাশশুদ্ধি না হইলে তাহা হইতে পারে না এবং পরতত্ত্বযোজন ব্যতীত পাশসকলের উন্মূলন অসম্ভব। তাহার অভাবে ভোগ বা মোক্ষ কোনো ফলের প্রাপ্তি হইতে পারে না। সময়ীদীক্ষাতে পাশশুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, কারণ দীক্ষা দ্বারাই অংশতঃ পাশশুদ্ধি ঘটে।

ফলার্থী শিষ্য ভোগ ও মোক্ষভেদে ভোগার্থী ও মোক্ষার্থী এই দুইপ্রকার। মোক্ষার্থী বা মুমুক্ষু পুত্রক ও আচার্যভেদে দুইপ্রকার। শিষ্যের দীক্ষার পূর্বে গুরুকে দেখিতে হয় সে স্ব-প্রত্যয়ী অথবা গুরু-প্রত্যয়ী। স্ব-প্রত্যয়ী হইলে গুরুকে তাহার বাসনা অনুসারেই দীক্ষা দিতে হয়। গুরু-প্রত্যয়ী হইলে ও গুরুতে নির্ভরশীল হইলে গুরুর কর্তব্য প্রথমে তাহার ভোগদীক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া মোক্ষদীক্ষার ব্যবস্থা করা।

শিবধর্মিণী ও লোকধর্মিণী দীক্ষা

সাধক দুইপ্রকার ঃ শিবধর্মী ও লোকধর্মী। তাই ভোগ বা ভূত (ভুক্তি) দীক্ষাও শিবধর্মিণী ও লোকধর্মিণী দুইপ্রকার। উভয় দীক্ষার ভেদ থাকিলেও উভয়েই সাধন আছে। তাই দুই দীক্ষাকেই সাধকদীক্ষা বলে। শিবধর্মিণী দীক্ষার প্রভাবে যোগ্যতা অনুসারে সাধক তিন প্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ঃ মন্ত্রেশ্বর পদপ্রাপ্তি, মন্ত্রপদপ্রাপ্তি ও পিন্ডসিদ্ধি বা অবান্তর সিদ্ধি। প্রথম দুইটি এক-প্রকার পারমেশ্বরিক ফল। তৃতীয়টি হইতেছে বিভিন্ন ভোগভূমিতে আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করা। দীক্ষার প্রভাবে জীব যে ভোগভূমিতে ভোগাস্বাদনের জন্য গমন করে সেখানে সে জরামৃত্যুহীন স্থির দেহ প্রাপ্ত হয়। প্রলয়কালে ঐ ভোগভূমি নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ঐ দেহ নষ্ট হয় না। বহু অবান্তরসিদ্ধিও এই তৃতীয় বিভাগে আছে, যেমন খড়্গসিদ্ধি, অঞ্জনসিদ্ধি, পাদুকাসিদ্ধি ইত্যাদি। শিবধর্মী সাধক গৃহস্থ হইতে পারে, যতিও হইতে পারে। ইঁহাদের অধ্বশুদ্ধি শুদ্ধ শিবমন্ত্র দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

এই সকল সাধক মন্ত্রারাধন পরায়ণ হইয়া আরাধ্য মন্ত্রের আদেশমত কার্য করে। জ্ঞানবত্তা, অভিষেক প্রভৃতি এই দীক্ষার ফল। এই মার্গের সাধককেও সময়াচার পালন করিতে হয়।

লোকধর্মিণী দীক্ষার প্রভাবে প্রাক্তন বা সঞ্চিত ও আগামী কর্মের মধ্যে অশুভাংশ বা দুষ্কৃতাংশ মাত্র নষ্ট হয় ও শুভাংশ অণিমাদি সিদ্ধিরূপে পরিণত হয়। প্রারব্ধকর্ম অবশ্য ভুগিতে হয়। ভোগান্তে প্রারব্ধজাত দেহ পতিত হইলে গুরু দীক্ষিত সাধককে অণিমাদি ভোগের জন্য উর্ধ্বলোকে সঞ্চালিত করেন। ঐখানকার ভোগ সমাপ্ত হইলেও যদি ভোগবাসনা অতৃপ্ত থাকে, তাহা হইলে ঐ বাসনার অনুরূপ ভোগের জন্য উর্ধ্বতর ভুবনে গুরু তাহাকে পাঠান। এইপ্রকারে শুভকর্মভোগের পর বৈরাগ্যের উদয় হইলে ঐস্থান হইতে—অন্তিম ভোগস্থান হইতে—পরমেশ্বরের নিষ্কল স্বরূপে যোজিত করেন। এই যোজনা শুধু যে নিষ্কল স্বরূপের সঙ্গেই হইবে এমন কোন কথা নাই। নানাপ্রকার মায়াতীত বিশুদ্ধভুবনের অধীশ্বরবর্গের সঙ্গেও সালোক্য হইতে সাযুজ্য পর্যন্ত ফলের জন্য হইতে পারে। এইসকল অবস্থা সাধকের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের তারতম্যমূলক। বলা হইয়াছে—

লোকধর্মিণমারোপ্য মতে ভুবনভর্ত্তরি।
তদ্ধর্মাপাদনং কুর্যাৎ শিবে মুক্তিকাংক্ষিণম্ ॥

অর্থাৎ লোকধর্মী সাধককে গুরু নিজের ইষ্ট ভুবনেশ্বর স্বরূপে যুক্ত করিয়া তাহার ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেন। অথবা যদি মুক্তিকামী হয় তাহা হইলে তাহাকে শিবে আরোপিত করিয়া তাঁহার ধর্ম সংযুক্ত করেন। এই উর্ধ্ব গতি ও যোজনা ক্রমশঃ সাধক ও গুরুর সংকল্পানুসারে ঘটিয়া থাকে।

সবীজ ও নির্বীজ দীক্ষা

মুমুক্ষুর দীক্ষা সবীজ, নির্বীজ ও সদ্যোনির্বাণদায়িনী ভেদে তিনপ্রকার। ইহার মধ্যে তৃতীয়টি দ্বিতীয়রই প্রকারভেদমাত্র। তাই মুমুক্ষুর দীক্ষা বস্তুতঃ দুইপ্রকার। সাধারণতঃ নির্বীজ দীক্ষা বালক, মূর্খ, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও ব্যাধিগ্রস্তাদির জন্য। অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রবিচারে কুশল নহে তাহাদের জন্য নির্বীজ দীক্ষার বিধান আছে। তাহাদের জন্য সময়াচার পালনের আবশ্যকতা থাকে না। এই দীক্ষার প্রভাবে কেবল গুরুভক্তির ফলেই মুক্তিলাভ হয়।

দীক্ষামাত্রেণ মুক্তিঃ স্যাদ্ ভক্তিমাত্রাদ্ গুরোঃ সদা।
(স্বচ্ছন্দতন্ত্র)

ইহাতে গুরুভক্তিমাত্রই সময়, অন্য সময় নাই।

সদ্যোনির্বাণদীক্ষা মুমূর্ষু অবস্থাতে দিতে হয়; কারণ এই দীক্ষা অতি

প্রদীপ্ত মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া অতীতাদি ত্রিবিধ পাশই নষ্ট করে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই দেহশুদ্ধি ও দেহপাতের পর পরমপদপ্রাপ্তি হয়।

দৃষ্ট্বা শিষ্যং জরাগ্রস্তং ব্যাধিনা পরিপীড়িতম্।
উৎক্রময্য ততস্ত্বেনং পরতত্ত্বে নিয়োজয়েৎ ॥

শিষ্য জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইলে গুরু তাহাকে শরীর হইতে উৎক্রমণ করাইয়া পরমতত্ত্বে নিয়োজিত করেন।

সবীজ দীক্ষার ব্যবস্থা বিদ্বান্ ও কষ্টসহিষ্ণু শিষ্যের জন্য। এই দীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে শাস্ত্রবিহিত আচার ঠিক ঠিক পালন করিতে হয় না করিলে নিজের শিবময়ী সত্তা হইতে কিছু সময়ের জন্য ভ্রষ্ট হইয়া বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়।

মুমুক্ষুর সবীজ ও নির্বীজ উভয়প্রকার দীক্ষারই একমাত্র প্রয়োজন মোক্ষ। আচার্যের দীক্ষা হয় সবীজ। বুভুক্ষু সাধক-দীক্ষাও সবীজ হয়। সবীজ দীক্ষা হইলেই অভিষেক হইতে পারে। বিদ্বান্ ও কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তিকে সবীজ দীক্ষা দিয়া আচার্য ও সাধকপদে অভিষিক্ত করিতে হয়। আচার্য মুমুক্ষু, কিন্তু সাধক ভোগার্থী। অভিষেক ব্যতীত ভোগ ও মোক্ষে অধিকার হয় না। কেবল সবীজদীক্ষাই পরমেশ্বরের সঙ্গে যোজন-সাধক। এইজন্য সাধক ও ভোগার্থীরও প্রথমে শিব বা পরমেশ্বরের নিষ্কল রূপের সঙ্গে যোগ হয়। তারপর ভোগসিদ্ধির জন্য সদাশিব অর্থাৎ পরমেশ্বরের স-কল রূপের সঙ্গে যোগ হয়। সর্বপ্রথম নিষ্কলরূপের সঙ্গে যোগের উদ্দেশ্য এই যে, স-কল রূপ সিদ্ধিবহুল হইলেও এই নিষ্কলযোজন ক্রিয়ার প্রভাবে স-কল পদে অবস্থানকালে সিদ্ধি বা ঐশ্বর্যভোগ থাকিলেও ভোগান্তে পরমপদ প্রাপ্তিতে কোন বাধা ঘটে না।

শিবধর্মিণী দীক্ষাতে সাধকের সাধকত্বে অভিষেক হয়। অভিষেক বিদ্যাদীক্ষার পরে হয়। শিবধর্মী সাধকের শিবপদে যোজনের পর যে সদাশিবপদ-যোজনরূপা দীক্ষা হয় তাহাকে বিদ্যাদীক্ষা বলে। (বত্রিশ বর্ণাত্মক) সকল মন্ত্রই বিদ্যা, তাহার দ্বারা বিদ্যাদীক্ষা হয়। সদাশিব পদ বিদ্যাত্মক। যদিও সকল মন্ত্রদ্বারা পরমপদের প্রাপ্তিও হইতে পারে তথাপি বাসনাভেদবশতঃ উহাকে বিদ্যাদীক্ষা বলে। সদাশিব পদ পর্যন্ত অণিমাদি ভোগদীক্ষাই ভূতিদীক্ষা। ইহা শান্তি পর্যন্ত পদে যোজনের পর হয়। অবশ্য গুরুকৃপাতে ইহা শিব-যোজনাত্মিকাও হইতে পারে—ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। শিবধর্মী সাধককে বিধিপূর্বক কর্মশোধন করিতে হয়। নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যা এই কলাতে যে কার্মফল আছে তাহা স্থূল। সূক্ষ্মরূপে পাঁচ কলাতেই কর্মসত্তা থাকে। অর্থাৎ শান্তি ও শান্ত্যতীত কলাতে সূক্ষ্ম কার্মফল থাকে। এইজন্য সমনা পর্যন্ত সমস্ত অধ্বাই পাশ জাল।

সাধককে কর্মের ক্ষয় করিতে হয় বটে, তবে সকল কর্মের নহে। প্রাক্তন বা সঞ্চিত ও আগামী কর্মের ক্ষয় একসঙ্গে করিতে হয়, কিন্তু বর্তমান দেহ দ্বারা মন্ত্রারাধনাদিরূপ কর্মকে নষ্ট করিতে নাই, তাহা হইলে সাধকের সিদ্ধি বা ভূতি লাভ হইতে পারে না। ভোগার্থী সাধকের ভোগপথে বাধাদান অনুচিত। বিদ্যাদেহ বা সদাশিবরূপে সকল মন্ত্রের ন্যাস করিয়া ও ঐ দেহকে অণিমাদি গুণসম্পন্ন ধ্যান করিয়া তাদৃশ গুণসম্পত্তির জন্য হোমপূর্বক সাধকের অভিষেক করা আবশ্যক। সকল যোজন ঠিক ঠিক নিষ্পন্ন হইলে অণিমাদি গুণের উদয়ের জন্য প্রক্রিয়া করিতে হয়। অভিষেকের প্রণালী হইতে বুঝা যায় যে ভোগার্থী সাধকের জন্য আপাততঃ ভোগের ব্যবস্থা থাকিলেও অন্তে মোক্ষই প্রাপ্তি হয়।

শিষ্যাভিষেক

পাঁচটি কলসের দ্বারা অভিষেক হয়। এই সকল কলস ক্রমশঃ দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব ও ঈশানকোণে স্থাপিত হয়। প্রথম তিন কলসে ক্রমশঃ নিবৃত্তি প্রভৃতি তিন কলার ন্যাস করার পর শান্ত্যতীত কলার ন্যাস ঈশানকোণস্থ কলসে করিয়া অন্তে পূর্বদিক্‌স্থিত কলসে শান্তিকলার ন্যাস করিতে হয়। শান্ত্যতীত কলার পর শান্তিকলার ন্যাসের তাৎপর্য এই যে সাধক যেন প্রথমে শিবদশাতে বিশ্রান্তি লইয়া নির্বিঘ্নভাবে সদাশিব দশায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ইহার পর ভোগাস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া অন্তে শিবত্বলাভ করিতে পারে। শান্তিকলার ভোগই পরমেশ্বরের স-কল অবস্থার অণিমাদিভোগ। শান্ত্যতীত কলা প্রথম তিনকলা ও শান্তিকলা দ্বারা আবৃত থাকে। এই পাঁচ কলসে পৃথিব্যাদি পাঁচটিকে ন্যাস করিতে হয়। এই পাঁচটি পঞ্চ স্থূলভূত নহে, কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ, যাহাদের মধ্যে সমস্ত তত্ত্ব ও তত্ত্বেশ্বর স্ফুরিত হন। ইহার পর প্রতি কলসে আরাধ্য মন্ত্র অর্থাৎ প্রধানতঃ সকল মন্ত্র ও অন্যান্য মন্ত্র ন্যাস করিয়া সর্বজ্ঞত্বাদি বিদ্যাঙ্গসমূহ দ্বারা 'সকলীকরণ' করিতে হয়। তারপর উহাতে এই সকল বিদ্যাঙ্গের আবরণন্যাস করিতে হয়। এই সকল সর্বজ্ঞত্বাদি বিদ্যাঙ্গ সিদ্ধি-সম্পাদনের অনুরূপ বলিয়া অন্যপ্রকার আবরণন্যাস দরকার হয় না। ইহার পর সাধ্যমন্ত্র দ্বারা নিবৃত্ত্যাদি প্রতি কলসকে অভিমন্ত্রিত করিতে হয়। তাহাতে মন্ত্রপ্রভাবে সকল ভূমিই সিদ্ধিপ্রদ হইতে পারে।

আচার্যাভিষেক

এইবার সংক্ষেপে আচার্যাভিষেক বর্ণনা করিতেছি। যে কোন ব্যক্তি আচার্যপদে নিযুক্ত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি গুরু হইতে আগমের যথার্থ

জ্ঞান লাভ করিয়াছে বা কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রবৃত্তির সংযমশীল, যে সদাচারসম্পন্ন ও সম্যক্‌প্রকারে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করে—এইরূপ ব্যক্তি আচার্যপদে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য। এই অভিষেক শিবযোজন পর্যন্ত দীক্ষা সমাপ্ত হইবার পর করিতে হয়। ইহাতে পাঁচ কলসে পাঁচতত্ত্ব ও তাহাদের ব্যাপক পাঁচকলা ন্যাস করিয়া তাহাদের মধ্যে অনন্ত হইতে শিব পর্যন্ত পঞ্চ ভুবনেশ্বরকে স্থাপন করিতে হয়। তারপর পূর্বাদি ক্রমে ষড়ঙ্গ আবরণযুক্ত মন্ত্রের চিন্তনসহ পরমেশ্বরের অর্চন হয়, পরমতত্ত্ব ভাবনার সহিত প্রতি কলসকে অভিমন্ত্রিত করিতে হয়। কলসসকলকে পূজন করিয়া মুখ্য অভিষেককার্য আরম্ভ হয়। এক মন্ডল রচনা করিয়া ও উহাকে স্বস্তিকাদি দ্বারা অলংকৃত করিয়া উহার উপর এক চন্দ্রাতপ লাগাইতে হয় ও উহাকে ধ্বজা দ্বারা সুশোভিত করিতে হয়। তারপর ঐ মন্ডলে চন্দন বা অন্য ভাল কাষ্ঠনির্মিত পীঠ স্থাপনপূর্বক তাহাতে অনন্তাসন ধ্যান করিতে হয়। তাহার পর অভিষেকার্থী শিষ্যের 'সকলীকরণ' সংস্কার করিতে হয়। তাহার পর তাহাকে ঐ পীঠে ঈশানাভিমুখে বসাইতে হয়। তারপর গুরু শিবভাবে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চন করেন। দীপ প্রভৃতি দ্বারা আরতি, পূর্ণকলস দ্বারা নির্মন্থন করিতে হয়। ইহাতে সব বিঘ্নের উপশম হয়। তারপর ঐসকল নিবৃত্ত্যাদি কলসের মুখ হইতে জলধারা শিষ্যের উপর ঢালিতে হয়। ইহাই অভিষেচন। তারপর শিষ্য পূর্ববস্ত্র ত্যাগ ও নববস্ত্র ধারণ করিবে। পূর্ববস্ত্র মায়িক কঞ্চুকভাবাপন্ন, অভিষেকের পর তাহা আর থাকে না। নবীন-বস্ত্র পরমশিবের প্রকাশ। সদা ইহাকে ধারণ করিতে হয়। ইহার পর যোগপীঠ বা আসনে উপবিষ্ট শিষ্যকে গুরু অধিকার দেন অর্থাৎ উষ্ণীষ মুকুটাদি ছত্র পাদুকা আসন অশ্ব শিবিকা প্রভৃতি রাজোচিত উপকরণ ও আচার্যভাবের উপযোগী কর্তবী (কাঁচি), স্রুক্‌, দর্ভ ও পুস্তকাদি দান করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করা হয়ঃ "আজ হইতে তুমি আশ্রমচতুষ্টয়স্থ ভগবৎশক্তিপাতযুক্ত বলিয়া দীক্ষাযোগ্য ব্যক্তিকে কেবল অনুগ্রহ করার ইচ্ছাবশতঃ (স্নেহ লোভাদিবশতঃ নহে) দীক্ষা দান কর। এই অধিকার তোমাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের আদেশে দেওয়া যাইতেছে।"

তারপর আচার্য অভিষিক্ত শিষ্যকে স্বহস্তে উঠাইয়া মণ্ডলে প্রবেশ করাইবেন ও সেখানে পরমেশ্বরের পূজা করাইয়া বলিবেনঃ "ভগবন্‌। আপনার আদেশে আপনার আজ্ঞানুবর্তী আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত আমি এই ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিয়াছি। এই ব্যক্তি এখন গুরুপরাম্পরাক্রমে শিবতত্ত্বের উপদেশ করিবে। আমি আপনার সান্নিধ্যে ইহাকে উপদেশ দিতেছি যাহাতে এই অনুগৃহীত পুরুষ আপনার স্বরূপ লাভ করিতে পারে।" তারপর গুরু মণ্ডপের বাহিরে আসিয়া

ক্রমশঃ পাঁচটি কলসই অগ্নিতে আহুতি দিবেন। তারপর পূর্ণাহুতি। তারপর অভিষিক্ত পুরুষকে দক্ষিণ হস্তে পঞ্চ অঙ্গুলী মন্ত্রদ্বারা চিহ্নিত করিবেন ও কনিষ্ঠিকা পঞ্চ অঙ্গুলীও স্পর্শ করিবেন। যথাবিধি এই করস্পর্শের প্রভাবে মন্ত্র দীপ্ত করণরূপে অল্প সময়ে কার্যক্ষম হয় ও সমস্ত পাশ দগ্ধবীজবৎ হইয়া যায়। ঐ সময়ে শিষ্য মণ্ডলাগ্নির সম্মুখে পরমেশ্বর, কলস ও অগ্নিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অধিকারপ্রাপ্তিবশতঃ প্রসন্ন হইয়া জীবন্মুক্তি ও পরমশিবত্ব দুই ফলই প্রাপ্ত হয়। তখন হইতে সে শিবতুল্য হইয়া শিবধামপ্রাপক গুরুপদবাচ্য হয়।

এই যে পরমেশ্বরের স-কলরূপে যোজনা ও তারপর অণিমাদি গুণপ্রাপ্তির জন্য অভিষেকক্রিয়ার কথা বলা হইল, ইহার পূর্বে ভগবানের নিষ্কল রূপের সঙ্গে যোগ ও তাঁর গুণপ্রাপ্তির জন্য ক্রিয়া আবশ্যক। কারণ, ভোগার্থী সাধকের জন্য শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে যে প্রথমে নিষ্কল যোজন করিয়া পরে স-কল যোজন করিতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে দীক্ষামাত্রেরই অন্তিম ফল মোক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা মুমুক্ষু ও নিবৃত্তিমার্গী তাহাদের ভোগবাসনা না থাকার দরুণ মোক্ষরূপ ফললাভে কোন ব্যবধান থাকে না। কিন্তু ভোগার্থী পুরুষ প্রথমে ইচ্ছানুরূপ ভোগ আস্বাদন করিয়া ভোগবাসনাশূন্য হইলে মুক্ত হয়। দুই দীক্ষার প্রয়োজনে ভেদ আছে, কিন্তু ফলে ভেদ নাই।

ক্রিয়াদীক্ষা

ক্রিয়া ও জ্ঞানভেদে দীক্ষা দুইপ্রকার। উভয় দীক্ষারই এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে তাহা বুঝা যায়। ক্রিয়াদীক্ষা নানাপ্রকার—কিন্তু জ্ঞানদীক্ষা একই প্রকার। ক্রিয়াদীক্ষা সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দুইপ্রকার। তাহার পর অসাধারণ দীক্ষা অধ্বাভেদে ভিন্ন ভিন্ন—যেমন কলাদীক্ষা, তত্ত্বদীক্ষা, ভুবনদীক্ষা, বর্ণদীক্ষা, মন্ত্রদীক্ষা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে তত্ত্বদীক্ষা সাধারণতঃ চারিপ্রকার—ছত্রিশ তত্ত্বদীক্ষা, নবতত্ত্বদীক্ষা, পঞ্চতত্ত্বদীক্ষা ও ত্রিতত্ত্বদীক্ষা। তারপর একতত্ত্বদীক্ষার কথাও পাওয়া যায়। ছত্রিশতত্ত্বকে নবতত্ত্বে পরিণত করিতে পারিলে নবতত্ত্বদীক্ষা দ্বারাও ছত্রিশ তত্ত্বের শুদ্ধি হইতে পারে। নবতত্ত্ব হইতেছে—প্রকৃতি, পুরুষ, নিয়তি, কাল, মায়া, বিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব ও শিব। ছত্রিশ তত্ত্বকে পাঁচ বা তিন তত্ত্বে পরিণত করিতে পারিলে পঞ্চতত্ত্ব বা ত্রিতত্ত্বদীক্ষা দ্বারা ঐ একই ফললাভ হইতে পারে। পঞ্চতত্ত্ব হইতেছে পৃথিবী, অপ্‌, তেজ, বায়ু ও আকাশ। ত্রিতত্ত্ব হইতেছে—শিব, আত্মা ও মায়া। একতত্ত্বদীক্ষাতে ছত্রিশতত্ত্বের সমষ্টিরূপে একতত্ত্ব গ্রহণ করা হয়। ইহারই নাম 'বিন্দু'। উহার শুদ্ধিতে সকল তত্ত্বেরই শুদ্ধি হয়। পদদীক্ষার প্রণালী নব

তত্ত্বদীক্ষার অনুরূপ। বর্ণ, মন্ত্র, ভুবনদীক্ষার প্রণালী কলাদীক্ষার মতন। অতএব অধ্বার বৈচিত্র্যবশতঃ ক্রিয়াদীক্ষা একাদশ প্রকার।

কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞানদীক্ষা এক ও অভিন্ন। ইহাতে বৈচিত্র্য নাই। সর্বসমেত বারো প্রকার দীক্ষা। পুত্রকের দীক্ষা সবীজ, নির্বীজ ও সদ্যোনির্বাণদায়িনী ভেদে তিনপ্রকার। মোট (১২×৩) ছত্রিশ প্রকার। আচার্য দীক্ষা শুধু সবীজ, তাই বারো প্রকার। শিবধর্মী ও লোকধর্মী সাধকের দীক্ষা একসঙ্গে (১২+১২) চব্বিশ প্রকার। সময়ীর দীক্ষাতে অধ্বন্যাস থাকে না। জ্ঞান দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতি ভেদ হইলে একপ্রকার, ক্রিয়া দ্বারা গ্রন্থিভেদ হইলে এক—মোট দুইপ্রকার। সমষ্টি সংখ্যা (৩৬+১২+২৪+২= ৭৪) চুয়াত্তর। ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যের আশয় ভিন্ন বলিয়া কোনো সাধকে কোনো অধ্বার প্রাধান্য থাকে, অন্য সকল অধ্বার গৌণত্ব থাকে। এইভাবে দীক্ষা অনন্তপ্রকার। আচার্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—

যত্র যত্র হি ভোগেচ্ছা তৎ প্রাধান্যোপক্ষেপতঃ।
অন্যান্তর্ভাবনাতশ্চ দীক্ষাঽনন্তবিভেদভাক্।

এইরূপ তত্ত্বাধ্বাতেও কোনো তত্ত্বের প্রাধান্য ও অন্য তত্ত্বের গৌণত্ব হইতে পারে। দীক্ষা তাই স্বভাবতই বিচিত্র, তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ছত্রিশ তত্ত্বদীক্ষা অপেক্ষা নবতত্ত্বদীক্ষার অধিকারী ও গুরু শ্রেষ্ঠ। নবতত্ত্ব হইতে পঞ্চতত্ত্ব, তাহা হইতে ত্রিতত্ত্ব, তাহা হইতে একতত্ত্বদীক্ষার অধিকার বিরল। বস্তুতঃ একতত্ত্ব-দীক্ষার গুরু ও শিষ্য উভয়ই দুর্লভ।

কলাদীক্ষার বিজ্ঞান (পাশক্ষপণ ও শিবত্বযোজন)

দীক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য এখানে দৃষ্টান্তরূপে কলাদীক্ষার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সকল অধ্বার মূলে কলার প্রাধান্য ও শিষ্যাধিকারের প্রকারভেদের দৃষ্টিতে পুত্রকের প্রাধান্য। তাই এস্থলে পুত্রকের কলাদীক্ষার বর্ণনা প্রদত্ত হইল।

বাগীশ্বরীগর্ভে জন্মলাভের পরে সংসার উপশম ঘটে বলিয়া পুত্রক নামের সার্থকতা। পৃথিবী হইতে কলাতত্ত্ব পর্যন্ত মায়ার অধিকার। ইহাই সংসার-মণ্ডল। ইহার পরে আছে শুদ্ধবিদ্যার রাজ্য। শুদ্ধ বিদ্যাই বাগীশ্বরী। বাগীশ্বরীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধভুবনসকলে অবস্থান ও সঞ্চারের অধিকার লাভ করা যায়। এই জন্ম বস্তুতঃ বৈন্দব দেহ মন্ত্রদেহ-প্রাপ্তির নামান্তর। এই জন্মব্যাপার সম্পাদন করিতে হইলে একুশটি অবান্তর সংস্কার আবশ্যক হয়। জন্মের পর ক্রমশঃ আরও পাঁচটি সংস্কার আবশ্যক হয়, যথা—অধিকার, ভোগ, লয়, নিষ্কৃতি ও বিশ্লেষ। মোট এই ছয় সংস্কার

দ্বারা মন্ত্রের প্রভাবে পশুর পাশ সকল বিনষ্ট হয়। পাশ নিবৃত্ত হয়, পরে তাহার সংস্কারও নিবৃত্ত হয়। ইহাই দীক্ষার প্রথম অংগ বা পাশক্ষয়। দীক্ষার দ্বিতীয় অংগ শিবত্বযোজন, যাহার জন্য ত্রয়োদশ পদার্থের অনুভবাত্মক জ্ঞান আবশ্যক হয়। সদ্‌গুরু যখন দীক্ষাদান করেন তখন এই দুইটি অংগই পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন হয়। শিবত্বযোজনে যে তেরোটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞান আবশ্যক হয় তাহাদের নাম এই—চার প্রমাণ, প্রাণসঞ্চার, ছয় অধ্বার বিভাগ, হংসোচ্চার, বর্ণোচ্চার, বর্ণগণ কর্তৃক কারণসমূহের ত্যাগ শূন্য, সামরস্য, ত্যাগ সংযোগ, উদ্‌ভব, পদার্থভেদন, আত্মব্যাপ্তি, বিদ্যাব্যাপ্তি ও শিবব্যাপ্তি। শিবব্যাপ্তিতে নিজের শিবভাবাপত্তি পূর্ণ হয়। যোজনাক্রিয়ার ইহাই উদ্দেশ্য।

পাশক্ষপণ কলাতে অন্য অধ্বার আবির্ভাব

এখানে দৃষ্টান্তরূপে কলাধ্বা নেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু জানিতে হইবে যে ইহাতে অন্যান্য অধ্বাও অন্তর্ভূত আছে। তত্ত্বাদি অন্য দীক্ষাতেও একই নিয়ম। সর্বপ্রথম চাই অধ্বাসকলের সন্ধান ও উপস্থাপন। পুঞ্জ, মণ্ডল, গুরু, শিষ্য ও দীক্ষার্থী শিষ্যের শরীরে পাশসূত্র—এই ছয়টি অধিকরণে অবস্থিত অধ্বাসকলের একত্র সম্মেলন—ইহাই অধ্বসংগর। এই ক্রিয়ার সংগে অধ্বাসকলের সাধারণ বা অভিন্নরূপে জ্ঞানই উপস্থাপন ক্রিয়া দ্বারা সম্মিলিত অধ্বাসকল হইতে ইষ্ট অধ্বার প্রধানরূপে উপস্থাপন। অধ্বা উপস্থিত হইলে তাহার ব্যাপ্তি দেখিতে হয়, যাহাতে অধ্বার বিস্তার জানা যায়। তখন দেখা যায় এই ব্যাপ্তিদর্শন বস্তুতঃ সর্বত্র বিশ্বেরই দর্শন। কারণ, বিশ্ব ইহাতে অন্তর্ভূত। কলাদীক্ষাতে পাঁচ কলাতে ছত্রিশ তত্ত্ব, দুশো-চবিবশ ভুবন, পঞ্চাশবর্ণ, দশ মন্ত্র ও একাশি পদ অন্তর্ভুক্ত। ইহা ভাবনা দ্বারা সমষ্টিভাবে ও পৃথক্‌ভাবে জ্ঞান করিতে হয়। নিবৃত্ত্যাদি কলা পৃথিব্যাদির শক্তি বা সূক্ষ্মরূপ। কলাবর্গের অধিষ্ঠান ব্রহ্মা হইতে শিব পর্যন্ত ছয়দেবতা। অর্থাৎ পাঁচ কলার সমষ্টিভূত বিন্দুর অধিষ্ঠাতা শিব। তাই সাকল্যে ছয় অধিষ্ঠাতা। এই ছয়-দেবতার শুদ্ধিতে কলাশুদ্ধি।

অধ্বশুদ্ধি

অধ্বশুদ্ধির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সৃষ্টি ও শুদ্ধিতত্ত্বের রহস্য বুঝা আবশ্যক। চিদানন্দময় পরমেশ্বর আপন স্বরূপভূতা স্বাতন্ত্র্য বা উন্মনা শক্তির দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে নিজের মধ্যে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ ভাসিত করেন। শিব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব বাচ্য বা গ্রাহ্য এবং বাচক বা গ্রাহকরূপে স্থিত। বাচক পর, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে বর্ণ, মন্ত্র ও পদনামে প্রসিদ্ধ। বাচ্যও পরাদিরূপে কলা, তত্ত্ব, ভুবন নামে প্রসিদ্ধ।

বর্ণশব্দের তাৎপর্য অভেদবিমর্শনরূপা শক্তি—ইহা পরা। কিঞ্চিৎ স্থূল হইলে ইহা হয় ভেদাভেদবিমর্শময় মন্ত্র—ইহা সূক্ষ্মা। আরও স্থূল হইলে ইহা ভেদবিমর্শময় পদ নামে প্রসিদ্ধ হয়—ইহা স্থূলা। বাচ্যরূপা শক্তি ক্রমশঃ কলা, তত্ত্ব ও ভুবন রূপ ধারণ করে। বাস্তবিকপক্ষে কলা নামে একই শক্তি স্ফুরিত হয়। এই স্ফুরণে যৌগপদ্য তো থাকেই, তাহা ছাড়া দর্পণনগরবৎ ক্রমেরও ভান হয়। ক্রমের ভানেও বৈশিষ্ট্য থাকে। অর্থাৎ যেটা পূর্বকালিক সেটা উত্তরকালিকরূপে ব্যাপকভাবে থাকে, যেমন মৃত্তিকা থাকে ঘটাদিতে। আর যেটা পরকালিক সেটা পূর্বকালিকে থাকে শক্তিরূপে, যেমন বৃক্ষ থাকে বীজে। অতএব সব বস্তুতেই সব বস্তু আছে—'সর্বং সর্বাত্মকম্।'

এইভাবে দেখিলে জানা যায় প্রতি প্রমাণ বা ভাবই বস্তুতঃ পরমশিবের স্বরূপ। এই স্বরূপটি ছয় অধ্বার স্ফুরণরূপ পরমেশ্বর-শক্তিময় ও অকার হইতে হকার পর্যন্ত পরামর্শরূপ পূর্ণাহন্তাময় বিশ্রামস্থান। কিন্তু আত্মা আপন মায়াশক্তির প্রভাবে স্বীয় পরমশিব ভাব না জানার দরুণ নিজেকে অপূর্ণ মনে করে। শাব্দীকলার প্রভাবে তাহার ঐশ্বর্য লুপ্ত হয়। ঐশ্বর্যলোপের মুখ্য ফল এই যে, বর্ণ ও কলা নিজের তাত্ত্বিকরূপে স্ফুরিত না হইয়া প্রত্যয়-সকলের উৎপাদন করে। এই প্রত্যয়বশতঃই আত্মা দেহাদি অনাত্ম বস্তুতে অহং প্রতীতি করিতে বাধ্য হয়। সংগে সংগে ক্রিয়াংশের সংগে সম্বন্ধ হওয়াতে নিজেকে ভোক্তারূপী মনে করে। এই অভিমানের দরুণ খেচরী, দিক্‌চরী, গোচরী ও ভূচরী এই চারি শক্তিচক্রের অধীন হইয়া "পশু" পদবাচ্য হয়। এই পশুভাব দূর করিবার জন্য পরমেশ্বরের অনুগ্রাহিকা শক্তি ভগবদ্‌ভাবাবিষ্ট গুরুর হৃদয়ে পরমার্থস্বরূপে স্ফুরিত হইয়া সমস্ত অধ্বাকে, তাহার সংকোচ দূর করিয়া, অনবচ্ছিন্ন চিৎশক্তির স্ফুরণরূপে প্রদর্শন করে এবং দীক্ষা ও জ্ঞানাদি দ্বারা শোধিত করে। অতএব গুরুর স্ফুরণরূপ মন্ত্রাদি শোধক, এবং পশু আত্মাতে অভিনিবিষ্ট মন্ত্রাদি শোধ্য। মন্ত্রাদিতে এইপ্রকার শোধ্যশোধক ভাব আছে—একথা মনে রাখিতে হইবে। এক এক অধ্বা সর্বময় বলিয়া তৎ তৎ অধ্বার প্রাধান্যবশতঃ দীক্ষা-ব্যাপারে অন্য পাঁচ অধ্বারও অন্তর্ভুক্তিরূপে শোধন ঘটে। এই জন্য ব্যাপ্তিজ্ঞান দরকার।

নিবৃত্তিকলার শোধন

যখন পূর্ববর্ণিত উপস্থাপন ক্রিয়ার দ্বারা কলা অধ্বা সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন উহাকে নিকটে আনিয়া শুদ্ধ করা আবশ্যক। ইহার পর শিষ্যের দেহে নিম্ন হইতে উপর পর্যন্ত ক্রমশঃ নিবৃত্তি প্রভৃতি পাঁচটি কলার ন্যাস করা আবশ্যক। এমনভাবে উহা করিতে হইবে যাহাতে গুল্‌ফ পর্যন্ত নিবৃত্তির এবং

নাভি, তালু, মূর্ধা ও ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠাদি কলার ন্যাস হইতে পারে। এই পর্যন্ত প্রারম্ভিক ব্যাপার। ইহা সম্পন্ন হইলে অধ্বগত তিনটি পাশেরই শোধন হইতে পারে। সমগ্র বিশ্বই পাশময়। নিবৃত্তিকলাকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবী তত্ত্ব রহিয়াছে এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া একশত আটটি ভুবন বিদ্যমান আছে।[১০] এইখানে বর্ণ আছে একটি (ক্ষ), মন্ত্র আছে দুইটি এবং পদ আছে আঠাশটি। প্রতিষ্ঠাকলাতে জল হইতে প্রকৃতি তত্ত্ব পর্যন্ত তেইশটি তত্ত্ব আছে। ভুবন আছে ছাপ্পান্নটি[১১], বর্ণ আছে তেইশটি (হ হইতে ট পর্যন্ত), মন্ত্র আছে তিনটি এবং পদ আছে একুশটি। বিদ্যাকলাতে তত্ত্ব আছে সাতটি (পুরুষ হইতে মায়া পর্যন্ত), ভুবন আছে সাতাশটি,[১২] বর্ণ আছে সাতটি (জ হইতে য পর্যন্ত), মন্ত্র আছে দুইটি এবং পদ আছে বিশটি। শান্তি কলাতে তত্ত্ব আছে তিনটি (শুদ্ধ বিদ্যা হইতে সদাশিব পর্যন্ত), ভুবন আছে সতেরটি[১৩] বর্ণ আছে তিনটি (গ, খ, ক), মন্ত্র আছে দুইটি এবং

---

১০ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সাতটি ভুবন আছে, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে দশদিকে একশত রুদ্রভুবন আছে, এবং সকল ভুবনের উপরে সর্বাধিষ্ঠাতা বীরভদ্রের ভুবন আছে। এইপ্রকারে নিবৃত্তিকলার অন্তর্গত পৃথিবীতত্ত্বে একশত আটটি ভুবন আছে জানিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সাতটি ভুবন এই প্রকার—অধোভোগে কালাগ্নি, কুষ্মাণ্ড ও হাটক এই তিন, মধ্যভাগে ভূলোক একটি এবং ঊর্ধ্বভাগে সত্যলোক হইতে সপ্তলোকাত্মক এক ভুবন। তদনন্তর উহার পশ্চাতে বিষ্ণুলোক এক এবং রুদ্রলোক এক। সর্বসমেত সাত ভুবন।

১১ জলতত্ত্বে গুহ্যাষ্টক নামক আটটি ভুবন আছে। তেজতত্ত্বে অতিগুহ্যাষ্টক নামক আটটি ভুবন আছে। বায়ুতত্ত্বে গুহ্যতরাষ্টক নামক আটটি ভুবন আছে। আকাশ তত্ত্বে পবিত্রাষ্টক, অহংকার, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় তত্ত্বে স্থাণ্বষ্টক নামে আটটি, বুদ্ধিতত্ত্বে দেবযোনি অষ্টক নামে আটটি এবং গুণতত্ত্বে যোগেশ্বরাষ্টক নামে আটটি—এই প্রকারে সর্বসাকল্যে ছাপ্পান্নটি ভুবন আছে। এই যে দেবযোনি ভুবনের কথা বলা হইল—ইহা সূক্ষ্ম। ইহাদের স্থূলভুবনও আছে, সেগুলি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত।

১২ পুরুষ ও রাগতত্ত্বে আটটি বিদ্যেশ্বরের ভুবন, নিয়তি ও বিদ্যাতত্ত্বে বামা হইতে মনোন্মনা পর্যন্ত নয়টি শক্তির ভুবন, কাল ও কলাতত্ত্বে মহাদেবাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত তিনটি ভুবন এবং মায়াতত্ত্বে সাতটি ভুবন—একটি নীচে, একটি উপরে, চারটি মধ্যে এবং মায়াধিষ্ঠাতা অনন্তের ভুবন একটি—সাকল্যে সাতটি ভুবন আছে।

১৩ শুদ্ধবিদ্যাতে বিদ্যাবাগীশগণের এক ভুবন, ঈশ্বরতত্ত্বে পনেরো ভুবন, ঈশ্বরের এক ভুবন, অনন্তাদি বিদ্যেশ্বরগণের আট ভুবন, ধর্মাদির চার ভুবন, বামাদি তিন শক্তির এক ভুবন, জ্ঞানক্রিয়ার এক ভুবন ও সদাশিব তত্ত্বে এক ভুবন—এইপ্রকারে সর্বসমেত সতেরো ভুবন জানিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানক্রিয়া ভুবনে উনষাটটি ভুবন আছে।

পদ আছে এগারোটি। শান্ত্যতীত কলাতে তত্ত্ব আছে দুইটি (অর্থাৎ বিন্দু, নাদ—কলার পাশশক্তি ও শিব), ভুবন আছে ষোলটি,[১৪] বর্ণ আছে ষোলটি (বিসর্গ হইতে অ পর্যন্ত), মন্ত্র আছে একটি ও পদ আছে একটি (ঋ)।

এই বিশাল বিশ্বব্যাপক পাশসমূহকে শোধন[১৫] করিবার জন্য একটি প্রণালী আছে, যাহাতে জন্ম প্রভৃতি ছয়টি সংস্কার অন্তর্গত রহিয়াছে। সমগ্র জগতে চৌদ্দপ্রকার প্রাণী বিদ্যমান আছে। এই সকল প্রাণী দেবতা, মনুষ্য ও তির্যক্ এই তিনটি মুখ্যশ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল জীবের দেহসৃষ্টি ভূতসর্গ নামে পরিচিত। কিন্তু যোনি ব্যতীত দেহ সৃষ্টি হইতে পারে না। এই চৌদ্দপ্রকার ভূতসৃষ্টির মূলভূতা যোনি শতরুদ্র হইতে অনন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। শতরুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অবস্থিত এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধোভাগে অবস্থিত। বাক্ অথবা বাগীশ্বরী এইসকল যোনির মধ্যে না থাকিয়া নিবৃত্তির উপরবর্তী কলাসকলে ব্যাপ্ত থাকেন। নিবৃত্তিব্যাপিকা বাগীশ্বরীর সঙ্গে পৃথিবী তত্ত্বে স্থিত অনন্ত হইতে শতরুদ্র পর্যন্ত বিভিন্ন ভুবন সকলের অধিবাসী চৌদ্দ-প্রকার প্রাণীর বিভিন্ন শরীরের সম্বন্ধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ বাগীশ্বরীই সকল শরীরের উৎপাদিকা। কলাদীক্ষার সময়ে যখন অধ্বসন্নিধানের পর অধ্ববিশেষ রূপে কলাঅধ্বার ও তদন্তর্গত নিবৃত্তিকলার উপস্থাপন হয় তখন ঐ নিবৃত্তি-ব্যাপিকা বাগীশ্বরীকে নিবৃত্তিকলার অন্তর্গত যোনিসকলের মধ্যে একসঙ্গে ঋতুরূপে সন্নিহিত করা আবশ্যক হয়। বাস্তবিকপক্ষে যে ব্যক্তির উপর

এখানে উহাদের বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। সদাশিব ভুবন শিবরুদ্রাদি আবরণের অন্তর্গত অনন্ত ভুবনাবলির ব্যাপক।

১৪ শান্ত্যতীত কলাতে যে শিবতত্ত্ব আছে তাহাতে বিন্দু হইতে সমনা পর্যন্ত সকল ভূমিই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিন্দু, নাদ ও কলা এই তিনটি আবরণ প্রধান, তন্মধ্যে বিন্দু আবরণের তিনটি ভুবন আছে, যথা—শান্ত্যতীত ভুবন, ইহা নিবৃত্তি প্রভৃতি চারটি কলাদ্বারা বেষ্টিত। অর্ধচন্দ্র ভুবন ও নিরোধিকা ভুবন ইহারা আপন আপন পাঁচ কলার দ্বারা বেষ্টিত। নাদাবরণে আছে ছয়টি ভুবন, নাদে আছে ইন্ধিকা প্রভৃতি পঞ্চশক্তির পাঁচটি ভুবন এবং নাদান্তে সুষুম্নেশ্বর পরব্রহ্মে এক ভুবন। শক্তি আবরণে মোট সাতটি ভুবন আছে যথা—সূক্ষ্মা প্রভৃতি চার শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত পরাশক্তির ভুবন, ব্যাপিনী ভূমিতে পঞ্চকলার পঞ্চভুবন এবং সমনা অথবা মহামায়াতে একটি শিবভুবন, সাকল্যে ষোলটি ভুবন।

১৫ দীক্ষাতে পুরুষে বিদ্যমান সকল পাশেরই শোধন হয়। বুদ্ধিগত পাশের শোধন হয় না। এইজন্য বুদ্ধিতে দোষ থাকিয়া গেলেও দীক্ষা নিষ্ফল হয় না। তবে শক্তিপাত তীব্রতম হইলে বুদ্ধিগত দোষসমূহের বীজও নষ্ট হইয়া যায়।

ভগবানের অনুগ্রহ উৎপন্ন হয় তাহার জন্য বাগীশ্বরী আর্তস্বরূপে সন্নিহিত থাকেন। এই অর্তব শুদ্ধ সৃষ্টির দিকে উন্মুখতাযুক্ত একসঙ্গে বহুদেহের সৃষ্টির সামর্থ্যমাত্র। গুরু কেবল প্রয়োজনব্যাপার দ্বারা সন্নিহিত বাগীশ্বরীকে মুদ্রাবন্ধনের দ্বারা স্থাপিত করেন। তাহার পর উক্ত শিষ্যের পাশসূত্রকে প্রোক্ষণ ও তাড়ন করিয়া নিজের দক্ষিণ মার্গদ্বারা বাহির করিয়া পরে উহাকে শিষ্যের বামমার্গ দ্বারা ভিতরে প্রবেশপূর্বক পাশসূত্রস্থিত পুর্যষ্টককে ছেদন করিতে হয়। তদনন্তর ছিন্ন পুর্যষ্টককে আকর্ষণ করিয়া দেহের সঙ্গে তাহার রশ্মিমাত্র সম্বন্ধ রাখিয়া নিজের দ্বাদশান্তস্থানে অর্থাৎ মস্তকে রক্ষা করিতে হয়। তারপর ঐস্থানের চৈতন্যকে সম্পুটিত করিয়া দিব্যশিবহস্তে সংহারমুদ্রার দ্বারা পূরক ক্রিয়ার সহায়তায় হৃদয়ে নিজের আত্মার সঙ্গে যোজন করা আবশ্যক। ইহার পর কুম্ভক ও রেচকক্রিয়া করিয়া উহাকে দ্বাদশান্তে উঠাইয়া লিঙ্গমুদ্রা-দ্বারা সন্নিহিত বাগীশ্বরীর গর্ভে স্থাপন করিতে হয়। এই গর্ভাধানের সময় গুরু নিজেকে ক্রিয়াশক্তিপ্রধান স্রষ্টা ঈশ্বররূপে এবং বাগীশ্বরীকে মায়ারূপে দর্শন করেন। এই সময় বাগীশ্বরী অশুদ্ধ জগৎপ্রসবকারিণী মায়ারূপাই বটে, কিন্তু কালান্তরে শুদ্ধ জগৎ প্রসব করার সময়ে ইনিই মহামায়ারূপা হইয়া যান। এই মায়ারূপা বাগীশ্বরীর সঙ্গে শুদ্ধবিদ্যার কোন সম্বন্ধ নাই, নতুবা ক্রমিক কর্মভোগদ্বারা সকলকে একই সময়ে শুদ্ধ করার জন্য অনন্ত দেহসৃষ্টি আবশ্যক হইত না। গুরুর পক্ষে শিষ্যের চৈতন্যকে মায়ারূপা বাগীশ্বরীতে যুক্ত করিয়া নিবৃত্তিকলাপ্রধান অধ্বাতে অর্থাৎ একশ আট ভুবনে বিভিন্ন শরীরে সৃষ্টি করা আবশ্যক হয়।

এই সকল দেহের সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে ইহার দ্বারা প্রাক্তন কর্মবাসনানিমিত্তক অনন্ত জন্ম, আয়ু ও ভোগাত্মক ফলের প্রাপ্তি ঘটে। এই সকল বিভিন্ন শরীরে তৎতৎ দেশকাল ও স্বভাব অনুসারে ভোগ হইয়া থাকে, কারণ মন্ত্রশক্তির প্রভাবে এই সকল শরীর একই সময়ে ফলোন্মুখ হয়। নানাপ্রকার ভোগের জন্য শিষ্যের শুদ্ধ শরীরই যে বিভিন্নপ্রকার এবং বহুসংখ্যক হইয়া থাকে, তাহা নহে। কিন্তু সে নির্দিষ্ট ভোগের জন্য তদনুরূপ নানা-প্রকার জীবভাবেও বাগীশ্বরী যোনিতে সংযোজিত হয়। এই স্থলে দীক্ষার পাত্র একজন হইলেও বিভিন্ন শরীর ধারণ করার জন্য তাহাকে অনেক বলা হইয়াছে। অনেক ভোগের আশ্রয়স্বরূপ বিচিত্র দেহ ও বিচিত্র ভোগ্যের সম্বন্ধ-বশতঃ, এক হইলেও উহাতে অনেকত্ব আবির্ভূত হইয়া থাকে। বাগীশ্বরীর গর্ভে শিষ্যের চৈতন্য সংযোজিত করার পর সকল গর্ভেই একসঙ্গে শতরুদ্র হইতে অনন্ত পর্যন্ত অনেক প্রকার দেহ পরমেশ্বর ভাবে আবিষ্ট গুরুর ইচ্ছাবশতঃ সম্পন্ন হয়। ইহার পর গর্ভ হইতে নিঃসরণ হয়। ইহার নামই জন্ম।

পাশনাশের জন্য যে ছয়টি সংস্কার আছে তাহার মধ্যে ইহাই প্রথম সংস্কার।

জন্মের পর অধিকার প্রভৃতি আরও পাঁচটি সংস্কার আছে; ইহা বলা হইয়াছে। সকল যোনিতে ঐ সকল দেহ একই সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তখন উহাদের ভোগে অধিকার জন্মে। মায়ার অন্তর্গত ভোগই কর্মের ফল। কর্ম শুভ অথবা অশুভ বাসনাত্মক। এই সকল কর্ম হইতে ভোগ ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু মন্ত্রশক্তির প্রভাবে অক্রমে অর্থাৎ একই সঙ্গে ভোগসকল নিষ্পন্ন হইতে পারে। অনেক জন্ম হইতে সঞ্চিত প্রাক্তন কর্ম দগ্ধ হইয়া যায় এবং ভবিষ্যৎ কর্মের বৃত্তিও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। কেবল দেহারম্ভক কর্মই ভোগ দ্বারা নষ্ট হয়। কর্মানুষ্ঠান হইতে ভোগসাধন প্রাপ্ত হইলে সুখদুঃখাত্মক ভোগ অনুভব করার অবসর হয়। ভোগনিবৃত্ত হইয়া গেলে কিছু সময়ের জন্য একটি অনির্বচনীয় তৃপ্তির উদয় হয়, ইহা পরম প্রীতির অবস্থা। তন্ত্রশাস্ত্রে উহাকে লয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর নিষ্কৃতি নামক সংস্কারের আবশ্যকতা হয়। শুভ অথবা অশুভ কর্ম হইতে বীরভদ্রভুবন পর্যন্ত বিভিন্ন ভুবনে জন্ম, আয়ু, ভোগ এই তিনপ্রকার ফলের অনুভব হয়। ইহাকে শুদ্ধ করার জন্যই নিষ্কৃতি সংস্কার আবশ্যক হয়। ভুবনাকার বিষয়ে যে সকল বিষয় ভোগ্যরূপ হয়, উহাদিগকে শুদ্ধ করা আবশ্যক হয়। নিষ্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইয়া যায়। ইহার ফলে কেবল জন্ম প্রভৃতিরই যে শুদ্ধি হয় এমন নহে, রুদ্রাংশপ্রাপ্তিরূপা শুদ্ধিও উৎপন্ন হয়। নিষ্কৃতি ভোগসমাপ্তির সূচক। ইহার পর ভোগ হইতে বিশ্লেষ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে ভোগের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্বন্ধ ঘটে না। কারণ, ঐ সময়ে ভোক্তাতে ভোক্তৃত্ব থাকে না। আণবমলের দরুণ যে বিষয়াসক্তি বা রাগ উৎপন্ন হয় তাহারই নাম ভোক্তৃত্ব। বিশ্লেষ অথবা ভোগভাব সম্পন্ন হইয়া গেলে ভূতসর্গরূপে নানাপ্রকার স্থূল সূক্ষ্মাদি শরীর নষ্ট হইয়া যায়। উহাদের পুনর্বার উদ্ভবের সম্ভাবনাও থাকে না।

এইপ্রকারে দীক্ষার দ্বারা তিনপ্রকার পাশেরই বিশ্লেষ ঘটিয়া থাকে। ঐ সময়ে সব শরীর নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া গুরু শিষ্যকে অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে দেখিয়া থাকেন। পাশসম্বন্ধবিমুক্ত চৈতন্য শুদ্ধ নিবৃত্তিকলার উপরে স্থিত হয় ও সুবর্ণপ্রভার ন্যায় দেদীপ্যমান হয়। তখন নিবৃত্তি দ্বারা ব্যাপ্ত পৃথিবীতত্ত্ব হইতে শিষ্যকে উঠাইয়া লইতে হয়। যদিও এই চৈতন্য নিবৃত্তির শুদ্ধতাবশতঃ নির্মল, তথাপি এখন পর্যন্ত অন্যান্য কলার শুদ্ধি হয় নাই বলিয়া ব্যাপক দৃষ্টিতে উহাকে মলযুক্তই বলিতে হয়। গুরু ঐ চৈতন্যকে পৃথিবী তত্ত্ব হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রণবপুটিত হংসবীজের আকারে সংহার-

মুদ্রা দ্বারা পূরকক্রিয়া অবলম্বনপূর্বক নিজের হৃদয়ে নিয়া আসেন। তাহার পর কুম্ভক ও দ্বাদশান্তে রেচন করিয়া পুনর্বার দ্বাদশান্ত হইতে উঠাইয়া নাড়ীরন্ধ্র দ্বারা শিষ্যের হৃদয়ে পেঁাছাইয়া দেন। তন্ত্রশাস্ত্রে এই ক্রিয়াকে 'তৎস্থীকরণ' বলে।

নিবৃত্তিকলা শুদ্ধ হইয়া গেলে পরে ঐ কলার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাকে আবাহন করিয়া পূজা ও তর্পণ করিতে হয়। তাহার পর শিষ্যের পুর্যষ্টক অথবা সূক্ষ্মদেহের কিঞ্চিৎ অংশ তাঁহাকে অর্পণ করিতে হয়। পুর্যষ্টক শব্দের অর্থ 'পুরী' অথবা সূক্ষ্ম দেহের আরম্ভক পাঁচ তন্মাত্রা ও মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আট অবয়ব। এই অষ্ট অবয়ব হইতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি অবয়ব ব্রহ্মাকে অর্পণ করিতে হয় এবং তাহার পর পরমেশ্বরকে নিম্নোক্ত আদেশ শুনাইয়া দিতে হয়, যথা—

"ভুবনেশ ত্বয়া নাস্য সাধকস্য শিবাজ্ঞয়া।
প্রতিবন্ধঃ প্রকর্ত্তব্যঃ যাতুঃ পদমনাময়ম্ ॥"

(দ্রষ্টব্য-মালিনীবিজয়)

হে ভুবনেশ্বর! ভগবান শিবের আদেশ অনুসারে পরমপদের যাত্রী এই সাধকের মার্গে বিঘ্ন উপস্থিত করিও না।

ইহার অন্তর্গত পূজা, হোম প্রভৃতি করিয়া তাহার পর ব্রহ্মাকে ও তাহার পর বাগীশ্বরীকে বিসর্জন করিতে হয়। বাগীশ্বরী বস্তুতঃ স্বাতন্ত্র্যশক্তিরূপা পরাবাকেরই স্ফুরণমাত্র। তাই পরাবাকের সঙ্গে একত্ব সম্পাদনই উহার বিসর্জন। ইহার পর বিশুদ্ধ নিবৃত্তিকলাতে বিশুদ্ধ পাশ সকলকে দর্শন করিতে হয়। ইহার ফলে প্রাক্তন ও ভাবী দুইপ্রকার কর্মই কাটিয়া যায়, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ, পুত্রকশিষ্য মুমুক্ষু বলিয়া সাধকের ন্যায় ফলের দিকে উন্মুখ থাকে না।[১৬] ফলদানে উন্মুখ বর্তমান অথবা প্রারব্ধ কর্মের শুদ্ধি করার বিধান নাই। কেবল ভোগ দ্বারাই উহাকে ক্ষীণ করিতে হয়।

এইপ্রকারে নিবৃত্তিকলার শুদ্ধির পর উহার সন্ধান আবশ্যক। ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকারে করা হয়—(১) শুদ্ধকলার সন্ধান এবং (২) প্রতিষ্ঠা-

১৬ শিবধর্মিণী দীক্ষাতে সাধককেও জন্মান্তর হইতে সঞ্চিত শুভাশুভ এবং বর্তমান জন্মে ভাবী কর্ম শুদ্ধ করিতে হয়। কেবলমাত্র ভাবী মন্ত্রারাধনরূপ কর্মের শোধন করা হয় না, কারণ এই সকল কর্ম হইতে বিভূতির আবির্ভাব হয়। লোকধর্মিণী দীক্ষাতে লৌকিক সাধকের প্রাক্তন ও আগামী কর্মে অধর্মাংশমাত্র নষ্ট করা হয়, ধর্মাংশ রাখিয়া দেওয়া হয়। দীক্ষার প্রভাবে এই ধর্মাংশ অণিমাদি বিভূতিরূপ ফল প্রদান করে।

ব. বি./তা. সা. ১৪-৯

কলার সম্বন্ধবশতঃ অশুদ্ধ কলার সন্ধান। সম্পূর্ণ পাশের শোধনকারক একাদশ অঙ্গবিশিষ্ট নিষ্কল মন্ত্রই শোধন করিয়া থাকে। এই নিষ্কলমন্ত্র শুদ্ধকলার বাচক বলিয়া ইহাকে শুদ্ধ বলা হয়, আর ইহাই অশুদ্ধকলার বাচক হইলে ইহাকে অশুদ্ধ বলা হয়। শুদ্ধ নিবৃত্তিবাচক নিষ্কলের উচ্চারণ কোন বিশিষ্ট স্বরূপে করা হইয়া থাকে। ইহার স্বরূপ পরবিন্দু পর্যন্ত ব্যাপক এবং ইহা প্রসরোন্মুখ। এই দুইটির একত্ব অথবা সামরস্য ভাবনা করিতে করিতে এবং শুদ্ধ নিবৃত্তিকে লীন ও অশুদ্ধ প্রতিষ্ঠাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তদ্বাচক[17] মূল মন্ত্রের সঙ্গে একীভূত ভাবনা করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

প্রতিষ্ঠাকলার শোধন

ইহার পর পূর্ববর্ণিত প্রণালীতে প্রতিষ্ঠাকলাকে শোধন করিবার বিধান রহিয়াছে। এইস্থলেও পূর্বের ন্যায় কলাসন্ধান, প্রতিষ্ঠাকলার ব্যাপ্তিদর্শন, বাগীশ্বরী গর্ভ হইতে জন্ম এবং তাহার পরবর্তী অধিকার প্রভৃতি বিশ্লেষ পর্যন্ত সকল ক্রিয়াই করিতে হয়। কিন্তু নিবৃত্তি অপেক্ষা কিছু কিছু বৈশিষ্ট কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে তাড়ন, প্রোক্ষণ প্রভৃতি কার্য ক্রিয়াপ্রধান ঐশ্বর্যমূর্তিতে, এবং অধিকার, ভোগ, লয় এবং নিষ্কৃতি শিবভাবাপন্ন[18] হইয়া করিতে হয় এবং বিশ্লেষণ একচৈতন্য ভাবনা ও উদ্ধারাদি ক্রিয়া জ্ঞানশক্তিপ্রধান সদাশিবরূপে হইয়া থাকে, কিন্তু ক্রিয়াশক্তি-প্রধান ঈশ্বররূপে হয় না। প্রতিষ্ঠাকলার অধিপতি বিষ্ণু। ইহাকে পূর্ব-প্রণালী অনুসারে পূর্যষ্টকের রস অর্পণ করিতে হয়। ইহাকেও পূর্বের ন্যায় ভগবদ্ আদেশ শ্রবণ করাইয়া বিসর্জন করিবার পর পরাবাকে বাগীশ্বরীকে বিসর্জন করিতে হয়। ইহার পর পূর্বের ন্যায় কলাসন্ধান করা আবশ্যক।

বিদ্যাকলার শোধন

এইপ্রকারে যখন পশু দুই কলা হইতে মুক্তিলাভ করে তখন তাহার চৈতন্যকে বিদ্যাতে যুক্ত করিয়া শুদ্ধ করিতে হয়। এই স্থলেও সকল প্রক্রিয়া পূর্বের ন্যায় জানিতে হইবে। কিন্তু বিশ্লেষণ ও পাশ ছেদের পর আত্মস্থতা ও তৎস্থীকরণ করা আবশ্যক। এই কলার অধিপতি রুদ্র। তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া পূর্যষ্টকের গন্ধরূপ অংশ অর্পণ করিতে হয়।

১৭ নিবৃত্তি প্রভৃতি পাঁচটি কলার বীজমন্ত্রকে ক্রমশঃ হৃৎ, শিরঃ, শিখা, কবচ ও নেত্রমন্ত্র বলা হইয়া থাকে।

১৮ অধিকারাদিজ্ঞান প্রভুত্ববশতঃ হইয়া থাকে। সদাশিব প্রভৃতি সমস্ত স্থলে একমাত্র শিবই প্রভু।

শান্তি ও শান্ত্যতীত কলার শোধন

শান্তি ও শান্ত্যতীত কলার শোধনে নূতন কোন প্রক্রিয়া নাই, তবে এই স্থলে পুর্যষ্টকের অহংকার রূপ অংশ শান্তির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে এবং মনরূপ অংশ শান্ত্যতীতার অধিষ্ঠাতা সদাশিবকে অর্পণ করিতে হয়।

পঞ্চকলাবিশিষ্ট দীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পরে বাগীশ্বরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার বিধান আছে।

পুর্যষ্টক অর্পণ

পুর্যষ্টক অর্পণের তাৎপর্য কি? পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে শিষ্যের পুর্যষ্টককে ব্রহ্মাদি পঞ্চকারণে অর্থাৎ কলাধিষ্ঠাতা দেবতাতে অর্পণ করিতে হয়। এই পঞ্চদেবতা সমস্ত অধ্বার অধিষ্ঠাতা। ব্রহ্মাতে শব্দ ও স্পর্শ অর্পিত হয়। এই ব্রহ্মা বাস্তবিক পক্ষে পরম ব্যাপকরূপে নাদান্তের ঊর্ধ্বে বিরাজমান। ব্রহ্ম-রন্ধ্রের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মস্বরূপ[১৯] বিষ্ণুতে রস অর্পিত হয়। ইনি প্রসরণময় শক্তিস্বরূপ[২০]। রুদ্রে রূপ ও গন্ধের সমর্পণ হয়। ইনি পরমব্যাপকরূপে ব্যাপিনীপদে অবস্থিত অনাশ্রিত নাথ[২১]। মনে রাখিতে হইবে ব্যাপিনী শূন্যেরই নামান্তর। বুদ্ধি ও অহংকার রূপ অংশ ঈশ্বরেই অর্পিত হইয়া থাকে। এই ঈশ্বর সমনাপদে আরূঢ় সৃষ্টির অধিকারযুক্ত শিবেরই নামান্তর[২২]। মন সদাশিবে অর্পিত হয়। এই সদাশিব নির্মল স্বাতন্ত্র্যময় চিদানন্দঘন পরম শিবেরই স্বরূপ[২৩]। এই সকল দেবতাকে পুর্যষ্টকের অংশ সমর্পণ করার

১৯ ব্রহ্মে সূক্ষ্মতম শব্দ ও স্পর্শের সম্বন্ধ আছে, কারণ ইহা নাদান্ত ও শক্তির মধ্যবর্তী অবস্থা।

২০ বিষ্ণুর সঙ্গে সূক্ষ্মরসের সম্বন্ধ আছে, কারণ শক্তি মূলতঃ স্পর্শপ্রধান হইলেও প্রসরণ অবস্থাতে রসময়ী হইয়া থাকে। এইজন্যই শক্তিময়ী বিষ্ণুতে সূক্ষ্মতম রসের সম্বন্ধ মানা হয়।

২১ রুদ্রে সূক্ষ্মতম সংস্কাররূপে অতি সূক্ষ্ম গন্ধের সত্তা রহিয়াছে। ব্যাপিনী অথবা অনাশ্রিত পদে সমগ্র বিশ্বে সন্ধায়কস্বরূপ রুদ্রের স্থিতি। সূক্ষ্মতম সংস্কার অর্থাৎ গন্ধ পূর্বসৃষ্ট জগতের উপসংহারের পর স্থিতিশীল বীজভাবমাত্র।

২২ শিব কেবল মননাত্মক, এইজন্য উঁহার সহিত লীন বুদ্ধি ও অহংকার বাসনার সম্বন্ধ থাকে।

২৩ পরমশিব উন্মনাশক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। উহাতে মনন সংস্কার থাকেনা, ইহা সত্য, কিন্তু তান্ত্রিক আচার্যগণ বলেন যে উহাতে অতি সূক্ষ্মতম, সুপ্রশান্ত মনঃসংস্কারের সম্বন্ধ থাকে।

উদ্দেশ্য এই যে এই উপায়ে সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্মতম সংস্কারও শান্ত হইয়া যাইবে। সূক্ষ্মদেহ আত্যন্তিকরূপে নিবৃত্ত হইয়া গেলে দীক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য প্রায় সিদ্ধ হইল বলা চলে।

শান্ত্যতীত কলা শুদ্ধ হইয়া পরমশিবে লীন হইয়া যায়। এই পরমশিব স্বাতন্ত্র্যময় এবং ব্যাপিনী হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সকল প্রকার ভাব ও অভাবের ভিত্তিস্বরূপ মহাশূন্যের আশ্রয়। স্বাতন্ত্র্য শক্তিই উন্মনা এবং মহাশূন্য সমনাত্মক।

পূর্বোক্ত বিবরণে মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত অধ্বশুদ্ধি দেখানো হইয়াছে। এই পর্যন্ত অধ্বা আত্মতত্ত্বদ্বারা ব্যাপ্ত, এবং পরমদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাই প্রমেয়স্বরূপ। মায়ার উপরে শুদ্ধবিদ্যা হইতে সদাশিব পর্যন্ত অধ্বা ভগবানের জ্ঞানক্রিয়াত্মিকা শক্তির দ্বারা ব্যাপ্ত। সমগ্র অধ্বার এই অংশটিকে পরমদৃষ্টিতে প্রমাণ ও করণাত্মক মনে করা যাইতে পারে। ইহার পর শক্তি অথবা সমনা পর্যন্ত শিবতত্ত্ব দ্বারা ব্যাপ্ত। ইহাকে পরম দৃষ্টিতে পরমাত্মার রূপ মনে করা যাইতে পারে। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে যে পৃথিবী হইতে মায়া মর্যন্ত আত্মতত্ত্বই প্রমেয়, শুদ্ধবিদ্যা হইতে সদাশিব পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্বই প্রমাণ এবং শক্তি ও শিবরূপী শিবতত্ত্বই প্রমাতা। এই তিন তত্ত্বের শুদ্ধিতে ক্রমশঃ পূজা, হোম আদি বিধি এবং অনুষ্ঠানগত ন্যূনতা ও আধিক্যবশতঃ, মন্ত্রোচ্চারণ বিষয়ে বিলোমভাববশতঃ এবং মনোবিজ্ঞানরূপ ভাবনাতে বৈকল্যবশতঃ যে সকল ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, তাহাদের নিরাকরণও আবশ্যক হয়।

শিখাচ্ছেদ

ইহার পর শিখাচ্ছেদের বিধান রহিয়াছে। স্থূলদেহে যে শিখা সংরক্ষণ করা হয় উহা মস্তক পর্যন্ত ঊর্ধ্বগতিশীল প্রাণশক্তির অনুকরণ। এই শক্তির অধঃপ্রবাহই বন্ধনের হেতু। বাহ্য শিখাচ্ছেদের তাৎপর্য হইল প্রাণশক্তির উপশম। শান্ত্যতীতা শক্তি সমস্ত তত্ত্বে ব্যাপ্ত, সমস্ত কারণের কারণ এবং সকলপ্রকার উপাধিবর্জিত ও নিষ্কলঙ্ক। এই শক্তিকে পুষ্পের অগ্রভাগস্থ জলবিন্দুর ন্যায় শিষ্যের শিখাগ্রে ভাবনা করিয়া ঐ শিখাটিকে মন্ত্রপূত কর্তরী বা কাঁচী দ্বারা ছেদন করা আবশ্যক। ইহার পর শিখাহোম হইয়া থাকে। উহাকে প্রাণশক্তির বিলাপন মনে করিতে হইবে। এই পর্যন্ত কৃত্য নিষ্পন্ন হইলে শিষ্য গুরুর শিবহস্ত পূজা করিয়া ও মণ্ডপে পরমেশ্বরের পূজা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে—"হে ভগবন্। আপনার কৃপাতে ছয় অধ্বাতে নিবদ্ধ পশুকে আকর্ষণ করিয়া এবং উহার মল শুদ্ধ করিয়া শিখাচ্ছেদ পর্যন্ত যাবতীয় কৃত্য আপনার প্রদর্শিত ক্রমানুসারে আমি সম্পাদন

করিয়াছি। এখন উহাকে নিশ্চিতরূপে পরমশিব অবস্থাতে পেঁছাইবার একমাত্র উপায় আপনার নিরপেক্ষ অনুগ্রহ।"

শিবত্বযোজন (ক্রিয়াদীক্ষা)

যোজনার উপযোগী যে সকল ক্রিয়া আছে তাহাদের তাৎপর্য কি? পাশশুদ্ধির পর গুরুকে ভগবদ্ আদেশ অনুসারে শিষ্যের অভেদসম্পাদক যোজনাক্রিয়া করিতে হয়। এই ক্রিয়ার অন্তর্গত প্রাথমিক কৃত্য সম্পাদন করিয়া তাহাকে অংগমন্ত্রসকল শুদ্ধ করিতে হয়। এই সকল মন্ত্র শ্রীভগবানের অন্তরংগা শক্তিস্বরূপ। ইহারা চৈতন্যস্বরূপ আত্মার নিষ্কল স্বরূপকে আচ্ছাদন করে, স-কল ভাবের স্ফুরণ করে, এবং এইপ্রকারে ভেদজ্ঞানের উৎপাদক হয়। এই সকল মন্ত্রকে অনুরোধ করিতে হয় যে তাহারা যেন পশুকে স-কল ভাবে পরিণত না করে। যোজনকর্ম অত্যন্ত কঠিন। ইহার দ্বারাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যোগ সিদ্ধ হয়, এবং জীব পরমশিব অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই স্বচ্ছন্দতন্ত্রে আছে—

> তস্মিন্ যুক্তঃ পরে তত্ত্বে সর্বজ্ঞাদিগুণাম্বিতঃ।
> শিব একো ভবেদ্ দেবি অবিভাগেন সর্বতঃ॥

জ্ঞান ও যোগের অভ্যাস না থাকিলে যোজনক্রিয়া করিতে পারা যায় না।

পুর্যষ্টকে অর্থাৎ লিংগশরীরে যে অহংভাব থাকে তাহাকেই প্রথমে শান্ত করিতে হয়। কারণ, এই অহংভাবের উপশম না হইলে ভগবানের সংগে যোগ স্থাপিত হইতে পারে না। স্বপ্নাবস্থায় প্রাণকে আশ্রয় করিয়া পুর্যষ্টক কার্য করে কিন্তু সুষুপ্তিতে ইহার আশ্রয় শূন্য। এইজন্য প্রাণ ও শূন্য ভূমিকে শান্ত করা আবশ্যক হয়। কারণ, যদিও কারণাধিষ্ঠাতৃ দেবতাদিগকে পুর্যষ্টকের অবয়ব সকল অর্পণ করা হইয়াছে, তথাপি উহার দ্বারা এক হিসাবে বৃত্তি-সকলের নিরোধ হইতে পারে মাত্র। উহার ফলে ভূমিশুদ্ধি হয় না এবং ভূমি-শুদ্ধি না হইলে যোজনার উপযোগী আত্মা প্রভৃতির ব্যাপ্তি হইতে পারে না। প্রাণ এবং শূন্যের প্রশমনের জন্য জ্ঞান এবং যোগাদি আন্তরক্রিয়া কিছু কিছু আবশ্যক। এই প্রসংগে শ্বাসের দেশগত ও কালগত পরিমাণ জানিয়া প্রাণের আরোহণ অবরোহণ দুইটি ক্রিয়ারই তত্ত্ব জানা আবশ্যক হয়। এইজন্য পূর্ণত্ব প্রাপ্তির মার্গে যে পরিমাণ অধ্বা অতিক্রম করিতে হয় তাহার পরিচয় থাকা আবশ্যক। এই ব্যাপারটি, যাহা তন্ত্রশাস্ত্রে অধ্বলংঘন নামে অভিহিত হয়, উর্ধ্বনাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহার পারিভাষিক নাম 'হংসোচ্চার'।

হংসোচ্চার

এই উচ্চার দুইপ্রকার—একটি স্বাভাবিক ও অপরটি প্রযত্ন দ্বারা সিদ্ধ হয়। এই দ্বিতীয় প্রকার উচ্চারের প্রভাবে নিষ্কলমন্ত্রের অবয়বভূত বর্ণসকল অর্থাৎ অ, উ, ম প্রভৃতি ব্রহ্মাদি কারণবর্গকে এবং তদনুকূল কালকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। এই পর্যন্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিলে প্রাণের চঞ্চলতা দূর হয় এবং প্রাণ শান্তিলাভ করে। ইহাই হইল প্রাণের উপশম প্রণালী। ইহার পর শূন্যভূমিকে শান্ত করা আবশ্যক হয়। এই বিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞান আবশ্যক, কারণ তাহা না হইলে মন্ত্র, আত্মা ও নাড়ী প্রভৃতির সামরস্য বুঝিতে পারা যায় না। সামরস্য বুঝিতে না পারিলে পরমেশ্বরের সঙ্গে আত্মার যোগস্থাপন কি প্রকারে হইবে? মন্ত্রোচ্চারে অঙ্গরূপে উহার অঙ্গভূত বারোটি প্রমেয় জানা আবশ্যক হয়। এই সকল প্রমেয় প্রণবের বিভিন্ন অবয়ব, ইহা মনে রাখিতে হইবে। এইগুলির নাম অ, উ, ম, বিন্দু, অর্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিনী, সমনা ও উন্মনা। এই সকল প্রমেয় জানিয়া উহাদের প্রত্যেকটি দশা ত্যাগ করিতে পারিলে ক্রমশঃ ঊর্ধ্ব আরোহরূপ অবস্থা লাভ করা যায়। ইহাকে উদ্ভব বলে। কিন্তু এই সকল দশা ত্যাগ করার ক্রম জানার পূর্বে উহাদের সংযোগপ্রকার জানা আবশ্যক। জ্ঞান এবং মন্ত্ররূপী শূলের দ্বারা অর্থাৎ বিশুদ্ধজ্ঞান এবং মুদ্রা ও ভাবযুক্ত মন্ত্রবলে গ্রন্থিসকলকে ভেদ না করিতে পারিলে পূর্ববর্ণিত দশা ত্যাগ অথবা উদ্ভব কিছুই হইতে পারেনা। এই জ্ঞানও যোগের মূল, ভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ সুদৃঢ় ধারণা এবং শব্দাদির অনুভব। এই দুইপ্রকার ভাবের বলেই বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং যোগ উপলব্ধ হইতে পারে। এই স্থিতিতে শূন্যের উপশম হইয়া যায়। এতটা পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিতে পারিলে আত্মতত্ত্বে নিজের বিশুদ্ধ অবস্থার অনুভব হয়। ইহাকে আত্মব্যাপ্তি বলে। ইহার পর বিদ্যাতত্ত্ব ক্রমশঃ উন্মনাতে বিশ্রান্ত হইলে বিদ্যাব্যাপ্তি আয়ত্ত হয়। তাহার পর শিবতত্ত্ব পরমশিবে সমাবিষ্ট হইলে শিবব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়। যখন শাস্ত্র ও অনুভব দ্বারা এই তিনপ্রকার ব্যাপ্তির ঠিক ঠিক জ্ঞান জন্মে, তখন নিখুঁতভাবে পরতত্ত্বযোজন হইতে পারে।

প্রাণোচ্চারবিজ্ঞান

এইবার প্রথমে পরিমাণ সহিত প্রাণোচ্চারের বিজ্ঞান বলা যাইতেছে। যোগিগণ বলেন যে প্রাণ হৃদয় হইতে প্রসৃত হইয়া উপরের দিকে সমনাশক্তির কেন্দ্র ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত সঞ্চার করিয়া থাকে। এই প্রদেশের বিস্তার অতি বৃহৎ হইতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণীতেও নিজ নিজ মান অনুসারে ছত্রিশ অঙ্গুলি।

প্রাণের এই গতি যদিও সকল প্রাণীতেই একপ্রকার, তথাপি কর্মবৈচিত্র্যবশতঃ ইহাতেও তারতম্য দৃষ্ট হয়। এই ছত্রিশ অঙ্গুলিসঞ্চারে, যাওয়া ও আসা উভয়প্রকার গতি অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে প্রাণের গতি আরোহ ও অপানের গতি অবরোহ জানিতে হইবে। প্রাণরূপী সূর্য হৃদয়ে উদিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে অস্তগমন করেন, ইহার নাম দিন। পক্ষান্তরে অপানরূপী চন্দ্র ব্রহ্মরন্ধ্রে উদিত হইয়া হৃদয়ে অস্তগমন করেন—ইহার নাম রাত্রি। এই প্রাণ-অপানরূপ দিবা-রাত্রিতে দুইটি সন্ধ্যা আছে। প্রাতঃসন্ধ্যার স্থান হৃদয় এবং সায়ংসন্ধ্যার স্থান ব্রহ্মরন্ধ্র। হৃদয় হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত সঞ্চার করিতে প্রাণের যতটা সময় লাগে উহাকে ষোড়শ ত্রুটি বা একনিঃশ্বাস বর্ণনা করা হয়। এইপ্রকার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে হৃদয় পর্যন্ত নামিবার সময়ে অপানের ঠিক ততটাই সময় লাগে—ইহার নাম প্রশ্বাস। ইহারই মধ্যে উভয় সন্ধ্যার অন্তর্ভাব জানিতে হইবে। প্রত্যেক সন্ধ্যা এক এক ত্রুটিকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এইজন্য প্রাণ ও অপান উভয়ের সম্মিলিত সঞ্চার সওয়া দুই অঙ্গুলি বলা হইয়া থাকে।

যতক্ষণ পর্যন্ত পরমতত্ত্বের জ্ঞান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হয়। প্রাণরূপী মন্ত্র হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়া জ্ঞানবিকাশের তারতম্য অনুসারে উপরের দিকে প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরমতত্ত্বের জ্ঞান না থাকার দরুণ ইহা ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত উত্থিত হইয়া নীচে ফিরিয়া আসে এবং ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিতে পারে না। সর্বপ্রথম মন্ত্র আঠারো অঙ্গুলি পর্যন্ত উঠিয়া তালুস্থানে উপনীত হয়। এইটি রুদ্র অথবা মায়াগ্রন্থির স্থান। এই গ্রন্থি ভেদ না করিতে পারার দরুণ ইহা মধ্যনাড়ীর দ্বারা ভ্রূ-মধ্যে ঈশ্বরস্থানে গমন করে। প্রথম আঠারো অঙ্গুলি প্রাণ তালুস্থানেই থাকিয়া যায়। ইহার পর ভ্রূ-গ্রন্থিভেদন না করিতে পারার দরুণ পরবর্তী ছয় অঙ্গুলি ঐখানেই থাকিয়া যায়। এইখান হইতে পার্শ্ববর্তী দুই নাড়ী অবলম্বন করিয়া শেষ বারো অঙ্গুলি প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত গমন করে। কিন্তু শাক্তবল না থাকার দরুণ উহা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিতে পারে না। তাই শেষ বারো অঙ্গুলি ঐস্থানেই থাকিয়া যায়। ঐস্থানেই প্রাণের অস্তগমন হয়। ইহার পর অপানক্রিয়ার পরে ইহা পুনর্বার হৃদয়দেশ হইতে উত্থিত হয়। এইপ্রকারে নিরন্তর এই কার্য চলিতেছে। ইহা হইল দুর্বল অধিকারীর কথা।

কিন্তু যে সাধক শাক্তবল প্রাপ্ত হয় তাহার প্রাণ সকল গ্রন্থিতেই সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়। পরতত্ত্বের জ্ঞানসম্পন্ন হইলে যে কোন গ্রন্থিতে স্থিত থাকিলেও প্রাণের গতি বাধিত হয় না অর্থাৎ দেহাদিতে প্রমাতৃভাব উদিত হইয়া উহাকে অধীন করিতে পারে না। পরজ্ঞানবশতঃ সে দেহাদিতে বিদ্যমান অহংকার হইতে সর্বদার জন্য মুক্ত হইয়া যায়। প্রাণের ঊর্ধ্বসঞ্চারের মাত্রা

অনুসারে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের উদয় এবং তারপর জ্ঞানের বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় প্রাণ শক্তির দ্বারা প্রতিহত হইয়া নীচের দিকে গমন করে, সেই সময়ে সাধক অজ্ঞানের অবস্থাতে থাকে। এইটি 'অবুধ' অবস্থা। যে সময়ে সে হৃদয়ে স্থিত হইয়া হৃদয় হইতে উপরের দিকে উঠিতে আরম্ভ করে, সেইটি তাহার 'বুধ্যমান' অবস্থা। ঐ সময়ে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে থাকে। উপরে উত্থিত হইতে হইতে যখন তাহার শক্তি লাভ হয়, তখনকার অবস্থার নাম 'বুধ' অর্থাৎ জ্ঞানী। শক্তিবল প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বারোহণের কৌশল জানিতে পারা যায়—ইহার ফলে ব্যাপিনী পর্যন্ত উপনীত হইতে পারিলে সাধকের অবস্থার নাম হয় 'প্রবুদ্ধ'। ইহারও উপরে উঠিয়া সমনা পর্যন্ত সমস্ত অধ্বা অতিক্রম করিতে পারিলে 'সুপ্রবুদ্ধ' অবস্থা প্রাপ্তি হয়। তখন পরমতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। তখন মনের সংস্কারও ক্ষীণ হইয়া যায় বলিয়া উন্মনা ভাবের প্রাপ্তি হয়। ইহা বলা আবশ্যক যে এই অবস্থা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদের পর হইয়া থাকে। এই অবস্থায় অণুতম হইতে মহত্তম পর্যন্ত কালের স্পর্শ থাকে না, নিবৃত্তি প্রভৃতি কোন কলা থাকে না, প্রাণ ও অপানের সঞ্চারও থাকে না, পৃথিবী প্রভৃতি ছত্রিশটি তত্ত্বও থাকে না এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি কারণবর্গও থাকে না। ইহা পরম অদ্বয় এবং পরম শুদ্ধ অবস্থা। এই অবস্থার অনুভব হইলে জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয়।

ষড়ধ্বা

প্রাণের মধ্যেই ছয়টি অধ্বা অবস্থিত। সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে প্রাণ দুই প্রকার। প্রাণসঞ্চারের প্রসঙ্গে যে প্রাণের কথা বলা হইয়াছে তাহা স্থূলপ্রাণ। সূক্ষ্মপ্রাণে সঞ্চার নাই। ইহা এক ও সর্বত্র ব্যাপক। কিন্তু স্থূলপ্রাণের একটা পরিমাণ আছে—ইহা ছত্রিশ অঙ্গুলিমাত্র। এখানে অধ্বার আশ্রয়রূপী যে প্রাণের কথা বলা হইল তাহা সূক্ষ্মপ্রাণ। বিশেষসকলের মধ্যে সামান্যের আভাস থাকে—তাহাকে তত্ত্ব বলে। শরীর ও ভুবনাদির রচনার মূল উপাদান এই তত্ত্ব। দেহ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, পাষাণাদিতে যে কাঠিন্যের আভাস তাহাই পৃথিবীতত্ত্ব। এইপ্রকার অন্যান্য তত্ত্ববিষয়েও জানিতে হইবে। এই সামান্যের আভাস পরচিদ্ ভিত্তিতে ভাসমান হয়। ভাসমান হয় বটে কিন্তু পরমচিদ্-ভূমিতে এইসকল চিদেকরস থাকে বলিয়া সেখানে কোনপ্রকার বিভেদ থাকে না। সঙ্কোচের সময়ে চিৎশক্তি প্রথমে প্রাণের রূপ গ্রহণ করিয়া দেহে ব্যাপক হয় এবং বিভিন্ন তত্ত্বের রূপে স্ফুরিত হইতে থাকে। ছয়টি অধ্বার মধ্যে ইহারই নাম তত্ত্বাধ্বা। পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত কাঠিন্যাদিরূপে যে চিৎশক্তির ভান হয় তাহাই তত্ত্বাধ্বা ও ভুবনাধ্বা। সমগ্র দেহে ব্যাপক সূক্ষ্মপ্রাণে অন্যান্য

অধ্বার বিভাগ জানিতে হইবে। নিবৃত্তি ও প্রতিষ্ঠাকলা দেহের অধোভাগে, বিদ্যাদি তিন কলা উপরিভাগে আছে। আত্মার শুদ্ধদশা শান্ত্যতীত কলা হইতেও পরবর্তী। তাহারও ঊর্ধ্বে উন্মনা ও পরতত্ত্বের সামরস্যরূপ অব্যয়পদ আছে। মন্ত্রকলাসকলের স্থিতিও প্রাণেই জানিতে হইবে। বর্ণ হইতেছে শব্দ, শব্দ হইল ধ্বন্যাত্মক প্রাণের নবরূপ। এইজন্য ধ্বনিরূপ প্রাণ হইতেই বর্ণসকলের উদ্ভব হয় এবং ধ্বনিতেই বর্ণের লয় হয়। এইজন্য বর্ণাধ্বাও প্রাণে স্থিত। শব্দাতীত হইতে পারিলে পরমতত্ত্বের সঙ্গে অভেদ হয় ও বিভুত্বের আবির্ভাব ঘটে। তখন ধর্মাধর্ম ও প্রাণাপানাদি যাবতীয় দ্বন্দ্বের নাশ হয়।[২৪] বর্ণের ন্যায় মন্ত্র এবং পদও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত, কারণ ঐগুলিও শব্দাত্মক।

হংসোচ্চার ও বর্ণোচ্চার

এইবার সংক্ষেপে হংসোচ্চার ও বর্ণোচ্চারের কথা বলিব। পরমেশ্বরের বোধরূপা শক্তি বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া পরাকুণ্ডলিনীরূপে এবং বিমর্শাত্মিকা বলিয়া নাদাত্মিকা বর্ণকুণ্ডলিনীরূপে স্ফুরিত হয়।[২৫] ইহার পর ইহা ভিতরেই বর্ণকুণ্ডলিনীরূপ অভিভূত করিয়া প্রাণকুণ্ডলিনীরূপে ভাসমান হয়। এই প্রাণই 'হংস'। ইহা স্বভাবতঃই উপর ও নীচের দিকে চলিতে থাকে। ইহার এইপ্রকার চলনবশতঃ 'হ' কার ও 'স' কার বিমর্শরূপে উহার ভান হয়। এইস্থলে 'হ' কারের ধর্ম ত্যাগ ও 'স' কারের ধর্ম গ্রহণ। এই নাদরূপী হংসের যেটা স্বাভাবিক উচ্চার তাহাই পরিস্ফুট বর্ণের উচ্চার। এই বর্ণোচ্চার যোগিগণের ভ্রূমধ্যস্থানে বিন্দুরূপে অনুভূত হয়। এই বিন্দু অবিভক্ত জ্ঞানরূপ। জগতের সকলপ্রকার ভেদ অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সম্পূর্ণ ভেদের বাচক অ, উ ও ম এই তিনমাত্রা। এই তিনটিকে পিণ্ডিত বা মিলিত করিয়া একাকার করিলে যে জ্যোতির্ময় জ্ঞানের উদয় হয়, উহারই নাম বিন্দু। ইহার উপলব্ধি হয় ভ্রূমধ্যে। ইহার পর মস্তক অর্থাৎ ললাটে অর্ধচন্দ্রস্থানে উপনীত হইলে পূর্বোক্ত বর্ণোচ্চার বিন্দুরূপ হইতেও সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে। বিন্দু

---

২৪ অধর্মের প্রভাবে স্থাবর পর্যন্ত দেহের প্রাপ্তি হয়। এই সকল দেহ অপান-প্রধান হয়। ধর্মের প্রভাবে প্রাণপ্রধান শক্তি অথবা সমনাভূমি পর্যন্ত দেবাদি যোনির প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু বিজ্ঞানবলে অন্বয়-বোধ হইলে পরে উভয়ের ত্যাগ হয় ও জীবিত থাকিতেই সর্বব্যাপকত্ব ও বিভুত্ব আবির্ভূত হয়।

২৫ এই বিশ্বগর্ভা কুণ্ডলিনী শক্তি প্রসুপ্তভুজঙ্গবৎ। ইহা স্বভাবতঃই নাদময় বা বিমর্শময় রূপ ত্যাগ করিয়া প্রাণাত্মক রূপ ধারণ করিয়া আছে।

অবস্থাতে বিভিন্ন জ্ঞেয়ের ভেদ বিগলিত হইয়া উহাদের অভিন্ন জ্ঞেয়রূপে ভান হয়। কিন্তু উহাতে জ্ঞেয়াংশের প্রাধান্য থাকে, জ্ঞানাংশের নহে। কিন্তু অর্দ্ধ-চন্দ্রে জ্ঞানাংশের বৃদ্ধির দরুণ জ্ঞেয়াংশের প্রাধান্য কম হইতে থাকে। ইহার পর উচ্চার নিরোধিকা অবস্থাতে উপস্থিত হয়, তখন জ্ঞেয়ভাবের প্রাধান্য একেবারে নিবৃত্ত হয় ও পরিস্ফুট রেখারূপে উর্ধ্বোন্মুখ প্রতীত হইতে থাকে। এই রেখা হইতে নাদে প্রবেশ হয়। কিন্তু ইহা অযোগীর পক্ষে নাদমার্গের রোধক। তাই ইহার নাম "নিরোধিকা"। ইহার পর বর্ণোচ্চার নাদ ও নাদান্ত ভূমি অবলম্বন করে। এইটি ঈশ্বরপদ—এখানে জ্ঞেয়ভাব অভিভূত থাকে ও বিভিন্ন বাচক শব্দের অভেদজ্ঞান প্রধানতঃ স্ফুরিত হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, বাচ্যবর্গের অভেদ বিন্দুতে হয় এবং বাচকবর্গের অভেদ নাদ ও নাদান্তে হয়। ইহার পর প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্রে বা শক্তিস্থানে একপ্রকার দিব্যস্পর্শ অনুভব করিয়া কৌশলপূর্বক উর্ধ্বপ্রবেশ করিয়া ব্যাপিনীতে ব্যাপকত্ব লাভ করে। ত্বকের সঙ্গে যেখানে কেশের সম্বন্ধ উহাই ব্যাপিনীর অনুভবস্থান। ইহার পর সমনাপদে অর্থাৎ শিখার সঙ্গে কেশের সম্বন্ধস্থানে উহা বিশুদ্ধ মননরূপে স্থিত হয়। ইহা মন্তব্যহীন মনন অথবা বিশুদ্ধ মনের অবস্থা। প্রাণাত্মক হংস যখন ইহাও অতিক্রম করে তখন শুদ্ধ আত্মস্বরূপে প্রকাশমান হয়। ইহার স্বভাব হইল মনের উল্লঙ্ঘন। অর্থাৎ সমনা পর্যন্ত জ্ঞানক্রিয়াদি সবই ক্রমযুক্ত, সমনার উপরে শুদ্ধ আত্মা আপন স্বভাব প্রাপ্ত হইলে ক্রমলঙ্ঘন হইয়া থাকে। ঐ সময় একই সময়ে সমগ্র বিশ্ব অভেদে প্রকাশিত হয়। এই অভেদপ্রকাশ উন্মনাশক্তির ব্যাপার। উন্মনাশক্তির আশ্রয়ে শুদ্ধ আত্মা পরমেশ্বর অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চিদানন্দময় পরমশিবের সঙ্গে আত্মার অভেদ সম্পন্ন হয়।

এইপ্রকারে শিবত্বলাভের ফলে প্রাণাত্মক সঞ্চার হীন হইয়া যায়। প্রাণের সংকোচ ও প্রসরণ আর থাকে না। উহা ব্যাপক হয়—ছত্রিশ তত্ত্বময় সমগ্র বিশ্বরূপে ও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাতীতরূপে স্ফুরিত হইতে থাকে।

এইবার বর্ণসকলের কারণত্যাগের কথা বলিব। নিবৃত্ত্যাদি কলার অধিষ্ঠাতা হৃদয়াদি প্রদেশ হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত নিষ্কল মন্ত্রের অবয়ব অকারাদি বর্ণের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ রহিয়াছে।[২৬] এই সকল বর্ণ ছয়টি কারণাত্মক দেবতাকে

---

২৬ ব্রহ্মার স্থান হৃদয়, বিষ্ণুর কণ্ঠ ও রুদ্রের তালুমধ্য। বিন্দুস্বরূপ ঈশ্বরের স্থান ভ্রূমধ্য, নাদাত্মক সদাশিবের স্থান ললাট হইতে মূর্ধা পর্যন্ত ও শিবের অংগভূত শক্তি ব্যাপিনী ও সমনার স্থান মূর্ধার মধ্য হইতে ক্রমশঃ উপরে উপরে। বিন্দু অর্ধচন্দ্র ও নিরোধিকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। নাদের ব্যাপ্তি নাদান্ত পর্যন্ত। আনন্দময়ী স্পর্শানুভূতির অন্তে শক্তির ত্যাগ হয়। সেইপ্রকার নির্বিষয়ক মননমাত্রের অনুভব হইবার পরে সমনার ত্যাগ হয়।

উল্লঙ্ঘন করিয়া পরাবাক্‌স্বরূপে সর্বকারণকারণ পরমেশ্বরস্বরূপে লীন হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিন ভূমিতে বাচ্য ও বাচক পরস্পর ভিন্ন বা পৃথক্ থাকে। কিন্তু বিন্দুতে ও উহার উপরে উহাদের মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না। অ, উ, ম ক্রমশঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের বাচক হইলেও সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্রহ্মাদিরূপে বর্ণিত হইতে পারেনা, কিন্তু বিন্দু সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ। সেইপ্রকার নাদ স্বয়ং সদাশিবরূপ এবং সমনা পর্যন্ত শক্তি প্রভৃতি স্বয়ং শিবতত্ত্ব,[২৭] এরূপ বলা চলে। সমনার লঙ্ঘন হইলে যোগী শুদ্ধ আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উন্মনা শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরমশিবভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ উন্মনার ত্যাগ হয় না— উন্মনার আশ্রয়ে পরমশিবভাবের প্রাপ্তিই উন্মনাত্যাগরূপে বর্ণিত হয়।

ভাবের মধ্যে আপেক্ষিক স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা লক্ষিত হয়। আরোহণ ক্রমে চরম অবস্থায় পরমসূক্ষ্মভাবের প্রাপ্তি হয়। ভাবসকলের এই পরা অবস্থাকে পরাসত্তা রূপে বর্ণনা করা হয়। সর্বকারণভূত পরমেশ্বরেই এই আত্যন্তিক সূক্ষ্মতার বিশ্রাম। উহা অখণ্ডভাব বলিয়া অনন্ত খণ্ড কারণসকলের অভাবরূপ। তাই কোন কোন স্থানে উহাকে 'অভাব' বা 'অসৎ'ও বলা হয়। সমনা যাবতীয় উপাধি হইতে অতীত, তাই উহাকে অলক্ষ্য (অলখ) বলে—উহা ইন্দ্রিয় ও মনের ব্যাপারের অতীত। দ্রষ্টামাত্র বলিয়া উহাতে দৃশ্যাত্মক কোন ভাব নাই। বস্তুতঃ ব্যবহারে উহা অভাবপদবাচ্য হইলেও উহা চিদানন্দঘন পরমসত্তা। উহার প্রাপ্তিই মোক্ষ। এই পরমভাবের তুলনাতে উন্মনা শক্তিকেও অপরভাব বলা চলে। যদিও উন্মনা পরমেশ্বরের সমবায়িনী শক্তি বটে, তথাপি ইহা আত্মবিমর্শরূপা বলিয়া অপরভাব, পরভাব নহে। উন্মনার তুলনায় সমনা অপরভাব, কারণ উন্মনা ব্যাপক, সমনা তার ব্যাপ্য। বাস্তবিক পক্ষে সমনা উন্মনা হইতে পৃথক্ নহে। এইপ্রকার ব্যাপিনী সমনার অপরভাব। ব্যাপিনী যাবতীয় ভাবকে নিজের মধ্যে ধারণ করে বলিয়া মহাশূন্য পদবাচ্য। সমনাও শূন্যই বটে, কিন্তু ইহা ব্যাপিনীর পরাবস্থা, কারণ মহাশূন্য অতিক্রম করিতে পারিলেই সমনার সত্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাপিনীর অপরভাব শক্তি—ইহা আনন্দরূপা স্পর্শানুভূতিময়ী। এই আনন্দানুভব কাটাইতে পারিলেই ব্যাপিনীর অনুভব সম্ভবপর হয়। স্পর্শরূপা শক্তির অপরভাব নাদ ও ব্যাপীনাদ। যোগী শব্দরূপে স্পষ্টভাবে ইহার অনুভব লাভ করে। বলা বাহুল্য, শব্দানুভব নিবৃত্ত হইলেই স্পর্শানুভব আনন্দরূপে লক্ষিত হয়। নাদের অপরভাব বিন্দুরূপ জ্যোতি, যাহা অর্ধচন্দ্র ও নিরোধিকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। জ্যোতির অপরভাব হইল মন্ত্র। অকার, উকার ও মকাররূপ বর্ণপরামর্শই মন্ত্র।

২৭ এই শিব সদাশিব অপেক্ষা অসব্য, কিন্তু পরমশিব অপেক্ষা সব্য।

এখানে অর্থবাচক মন্ত্র বুঝিতে হইবে। মন্ত্রের অপরভাব পৃথক্‌ভূত বাচ্য অথবা কারণবর্গ—অর্থাৎ রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাদি কারণত্রয়ের অপরভাব পদের আশ্রয়ভূত তত্ত্বসমষ্টি। ইহাদের পর তত্ত্বসকলের অপরভাব হইল ভুবন। ভুবন সর্বাপেক্ষা স্থূল। ইহার পর আর অপরভাব নাই।

ভাবসকলের এই পরত্ব-অপরত্ব আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার নামান্তর। সমস্ত ভুবনই পঞ্চভূতের নামান্তর। যে সকল ভুবন মায়া বিদ্যা প্রভৃতি পদে বিদ্যমান আছে, সে সব সূক্ষ্মতত্তে রচিত। কিন্তু অধোদেশবর্তী ভুবন স্থূলভূত দ্বারা রচিত। সকল ভুবনই আপন আপন কারণ দ্বারা অধিষ্ঠিত। বস্তুতঃ এই সবই শিবের ছয়টি স্থূল বা অপররূপের অন্তর্গত। এইপ্রকার সাকার রূপের ধ্যান হইতে নানাপ্রকার সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইতে পারে কিন্তু মোক্ষলাভ হয়না। মোক্ষ শুধু পরম বা চিন্ময়রূপের ধ্যান হইতেই হইতে পারে। ইহা যোগীর পক্ষেই সম্ভব। যোগী ভগবানের ভুবনাদি সাকাররূপ সকলকেও চিদানন্দময় শিবস্বরূপেই ধ্যান করিয়া থাকেন, সাকারভাবে করেন না।

পরমেশ্বরের ছয়প্রকার স্থূল রূপ আছে—

(১) ভুবন—ইহার চিন্তনে ভুবনেশ্বরত্ব লাভ হয়।

(২) বিগ্রহ—ব্রহ্মাদি কারণদেবতাগণের বিগ্রহচিন্তন হইতে তদ্‌রূপতা লাভ হয়।

(৩) জ্যোতি অথবা বিন্দু—ইহা ধ্যান করিলে যোগসিদ্ধি লাভ হয়, ত্রিকালজ্ঞান হয় এবং যোগের প্রকর্ষবশতঃ জ্যোতির সঙ্গে তন্ময়তাপ্রাপ্তি হয় এবং শ্রেষ্ঠ যোগিপদে প্রতিষ্ঠা হয়।

(৪) ব্যাপিনী বা আকাশ—ইহার ধ্যানবশতঃ শূন্যাত্মভাবের উদয় হইয়া বিন্দুত্ব জন্মে।

(৫) নাদ বা শব্দের ধ্যানে শব্দাত্মভাব হয় ও সমস্ত বাঙ্‌ময়ে অধিকার জন্মে।

(৬) মন্ত্র—জপ, হোম বা অর্চনা দ্বারা ইহার আরাধনাফলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তি হয় পরমশিবের ধ্যান হইতে। পরমশিব দ্রষ্টৃস্বরূপ বলিয়া তাঁহার ধ্যান দৃশ্যরূপে করা যায় না। উহাকে পরমসত্তাত্মক চিদ্‌রূপে ভাবনা করিতে হয়। সদাশিব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত ভাবকে নিরালম্বন করাই তাঁহার ভাবনা। এই সকল ভাব যখন প্রশান্তরূপ বা অরূপ হইয়া শক্তিধামে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখনই শক্তিময় হইয়া যায়। ইহারই নাম ভাবসমূহের অবলম্বনশূন্যতা অথবা চিৎতত্ত্বের ভাবনা। ইহার পরিণামে উপাধিহীন পরমতত্ত্বের প্রাপ্তি হয়। ইহাই কারণত্যাগের রহস্য।

ইহার পর হয় কালত্যাগ। সমস্ত অধ্বাই কালে প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুণ বুঝিতে হইবে যে দেশ ও কাল উভয়েরই ভিত্তি প্রাণ। আকারের বিভিন্নতা-বশতঃ যেমন দেশাধ্বার বিভাগ অথবা দেশক্রমের আভাস জন্মে, সেইপ্রকার ক্রিয়ার বৈচিত্র্যবশতঃ কালাধ্বার বিভাগ হইয়া কালক্রমের আবির্ভাব হয়। প্রাণ হইল পরমেশ্বরের শক্তি। তাই অন্তে সকল অধ্বাই চিৎস্বরূপেই বিশ্রান্ত। অতএব অমূর্ত, সর্বগামী ও নিষ্ক্রিয় চৈতন্যের মূর্তি ও ক্রিয়ারূপে স্ফূর্তিই 'দেশ' ও 'কাল' নামে পরিচিত। কাল ঈশ্বরের বিশ্বাভাসক ক্রিয়াশক্তিময় রূপ। পরমাত্মার এই নিত্যরূপা মায়া প্রমাতার দৃষ্টিতে কালতত্ত্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত কালকে প্রাণে লীন করা না যায় ততক্ষণ পরমভাবে স্থিতি অসম্ভব। কালের প্রভাবেই প্রাণের উচ্চার হয়, প্রাণের উচ্চার হইতে মাতৃকা বা বর্ণসকলের উদয় হয়। বর্ণসকল উদিত হইয়া যাবতীয় বাচকশব্দে ব্যাপ্ত হয় ও বাচক বাচ্য অর্থে ব্যাপ্ত হয়। তাই জগতের সকল পদার্থ কালের কলনার অধীন।

তান্ত্রিক আচার্যগণ বলেন যে, পরম প্রকাশরূপ পরমেশ্বর অথবা ব্যাপক সত্তার ভিত্তিতে হৃদয় হইতে দ্বাদশান্ত পর্যন্ত ভবনশীল প্রাণসঞ্চারে অর্থাৎ ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত প্রদেশে পর পর অষ্ট ভৈরবের উদয় হয়। স্থূলপ্রাণ ষোলো তুটি পরিমিত বলিয়া এক এক ভৈরব দুইটি দুইটি তুটি আশ্রয় করিয়া কার্য করিয়া থাকে। অপানেও তাই হয়।[২৮] অনুভবযোগ্য কালের আদি (সূক্ষ্মতম) রূপ হইল তুটি ও অন্ত বা মহান্ রূপ হইল মহাকল্প। যে মহাকল্পের অন্তে ব্রহ্মার অন্ত হয়, ইহা সে মহাকল্প নহে। ইহা সেই মহাকল্প যাহার অন্তে সদাশিবের অন্ত হয় অর্থাৎ পরম মহাকল্প। ভূলোক, পিতৃলোক ও দেবলোকাদি স্থানের কালমান হইতে ব্রহ্মলোকের কালমানে যে-প্রকার ভেদ আছে, সেইপ্রকার ব্রহ্মলোকের কালমান হইতে সদাশিবলোকের কালমানে ভেদ আছে। ব্রহ্মার লয় হইলেও সমগ্র সৃষ্টি লুপ্ত হয় না কারণ, তখন ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বতন সৃষ্টি থাকে। কিন্তু সদাশিব সমস্ত লোকের উপরে স্থিত ও সকল ভুবনের অধিষ্ঠাতা। তাই সদাশিবের লয় হইলে সৃষ্টির পূর্ণ লয় হয় বলা চলে।[২৯] ব্রহ্মার সংহারক কাল কেবলমাত্র একটি কারণকে সংহার করে কিন্তু

---

২৮ এই সকল তুটি কালের করণ। ইহারা প্রাণকে রুদ্ধ করিয়া কালকে উদ্বুদ্ধ করে। দুই ক্ষণে এক তুটি। ক্ষণ সূক্ষ্ম ও স্ফুট অনুভবের যোগ্য নহে বলিয়া তুটি হইতেই কালের আদিগণনা করা হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে তুটি হইতে ন্যূন কালের ভান হয় না।

২৯ সদাশিব পর্যন্তই বিশ্বের ব্যাপ্তি। তাই সদাশিবের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুই প্রকার অধ্বারই লয় হয়। ইহাই প্রকৃত মহাপ্রলয়। কিন্তু এই উপসংহৃত

সদাশিবের সংহারক কাল পাঁচটি কারণেরই সংহারক। যখন এই কাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব এই পাঁচ অধিষ্ঠাতার সঙ্গে ইহাদের ভুবনকেও গ্রাস করিয়া শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হয় তখন তাহার শান্তি হয়। শক্তির মস্তকে স্থিত এই কালকে অর্থাৎ পরম মহাকালকে অপরকাল বলা হয়। তান্ত্রিক পরিভাষাতে ত্রুটি হইতে গণনা করিয়া ইহাকে ষোড়শসংখ্যক কাল বলা হয়।[৩০] এইজন্য কখনও কখনও ইহাকে কেবল 'ষোড়শ' শব্দেও বর্ণনা করা হয়। ব্যাপিনীতে যে সাম্যসংজ্ঞক কাল আছে উহা পূর্বোক্ত অপরকালের অঙ্গীস্বরূপ পরমকাল। ইহা 'সপ্তদশ' কাল। সমনাতে ইহাও থাকে না। ওখানকার কালের নাম 'কাল বিষুবৎ'—ইহা পরাৎপর অথবা পরার্ধকাল। সংখ্যাক্রমে ইহা অষ্টাদশ। ইহাই সকল কালের অবয়বী। ইহার পর আর কাল নাই। যাহা কিছু আছে—তাহা নিত্যোদিত ও পরার্ধ পর্যন্ত সকল কালের ব্যাপক। উন্মনা অবস্থার অন্তে যখন শক্তি ও শক্তিমানের অনুভবে অন্বয় ভাবের আবির্ভাব হয় তখন উহার সঙ্গে ঐ নিত্যকালের অভিন্নরূপে সাক্ষাৎকার হয়। সেখানে কাল নাই। একমাত্র প্রাণোচ্চারের দ্বারা এই পরার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত বাহ্যকালকে শান্ত করার পর কালাতীত পদে স্থিতিলাভ হয়।[৩১]

শূন্যপ্রশমনের জন্যও জ্ঞান অপেক্ষিত। পরমশিবই পরম শূন্যপদ। অন্যান্য শূন্য জানিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিলেই ইহার প্রাপ্তি হয়। তান্ত্রিক-সম্মত সাতটি শূন্যের মধ্যে ছয়টি শূন্য গতিশীল বলিয়া বস্তুতঃ শূন্য নহে। তাই ছয় শূন্যে ত্যাগ করিয়া সপ্তম শূন্যে লয়প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহাই পরমপদ। ইহা অবস্থাহীন[৩২] চিদ্রূপ সত্তামাত্র। ইহার প্রকাশেই সকল ভাব ও অভাব প্রকাশিত হয়। ইহাতে কোনপ্রকার ভেদ নাই। এই লোকোত্তর

বিশ্বের মূলভূত অরূপা শক্তি তখনও থাকে। অতএব সমনা ভূমিতে যখন ইহারও উপশম হয়, তখনই প্রকৃত মহাপ্রলয় বলা চলে।

৩০ ত্রুটি হইতে কালসংখ্যা এইপ্রকার—১-ত্রুটি, ২-লব, ৩-নিমেষ, ৪-কাষ্ঠা, ৫-কলা, ৬-মুহূর্ত, ৭-অহোরাত্র, ৮-পক্ষ, ৯-মাস, ১০-ঋতু, ১১-অয়ন, ১২-বৎসর, ১৩-যুগ, ১৪-মন্বন্তর, ১৫-কল্প, ১৬-মহাকল্প।

৩১ এই যে কালত্যাগের কথা বলা হইল ইহা বাচ্যদেবতার অবধিভূত বাহ্যকাল জানিতে হইবে। ইহা বাহ্য তত্ত্বগত বিস্তারময় কাল। ইহাকে প্রশান্ত করিবার জন্য সূক্ষ্মমন্ত্রকলার উচ্চারকালের আশ্রয় নেওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ বীজ নষ্ট হইলে বৃক্ষ যেমন স্বয়ংই নষ্ট হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্মকাল নিবৃত্ত হইলে স্থূলকাল স্বতঃই নষ্ট হয়।

৩২ উন্মনাও একটি অবস্থা, কারণ ইহা পরতত্ত্বে প্রবেশের উপায়। তাই বিজ্ঞান-ভৈরবে "শৈবো মুখমিহোচ্যতে" বলিয়া ইহার বর্ণনা করা আছে।

স্থিতি বস্তুতঃ শূন্য বা অভাব নহে, কেবল প্রমেয়াদি প্রপঞ্চ বা ভাব হইতে মুক্ত বলিয়া ইহাকে শূন্য বলা হয়—

অশূন্যং শূন্যমিত্যুক্তং শূন্যং চাভাব উচ্যতে।
অভাবঃ স সমুদ্দিষ্টো যত্র ভাবাঃ ক্ষয়ং গতাঃ ॥

সকলপ্রকার ভেদের উপশম হয় বলিয়া ঐ পদ পরম স্থির ও বিশ্বাতীত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহা বিশ্বময়ও বটে, কারণ, এই সত্তামাত্ররূপী শূন্য সকল ভাবকে তিলে তিলে অংশে অংশে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। ব্যাপকই ব্যাপ্যরূপে স্ফুরিত হইতেছে—ব্যাপ্য উহা হইতে আলাদা কোন জিনিস নহে। একমাত্র মহাপ্রকাশই স্থূল উপাধির সম্বন্ধবশতঃ স্থূল হয় অর্থাৎ আপন স্বাতন্ত্র্যবলে ইহা স্থূল আভাসরূপে ভাসিত হয় এবং স্থূল বলিয়া কথিত হয়। ঐ একই বস্তু সূক্ষ্মরূপেও স্থিত আছে। যে মহাযোগীর বোধ এই পর্যন্ত আরূঢ় হইয়াছে সে দৃঢ় প্রতিপত্তির দ্বারা উহা অবলম্বন করিয়া তন্ময় হয়।[৩৩] যে সকল শূন্যকে ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে হয় তাহাদের নাম—

(১) অধঃশূন্য=হৃদয়, যাহাতে প্রপঞ্চের উদয় হয় নাই।
(২) মধ্যশূন্য=কণ্ঠ, তালু, ভ্রূমধ্য, ললাট ও ঊর্ধ্বরন্ধ্রস্থান—ইহাদের মধ্যে নিজ হইতে অধোবর্তী প্রমেয়ের উপশম হয়।
(৩) ঊর্ধ্বশূন্য=ইহা শক্তিস্থান। এখানে নাদান্ত পর্যন্ত সকল পাশের ক্ষয় হয়।
(৪-৬) ব্যাপিনী, সমনা ও উন্মনাশূন্য।

এই ছয়টি শূন্য চল বলিয়া হেয়। পরতত্ত্বের তুলনায় উন্মনাতেও কিঞ্চিৎচলত্ব আছে। পরতত্ত্ব বা ত্যক্তশূন্য অচল বলিয়া উপাদেয়। নিম্নবর্তী শূন্যসকলের অধিষ্ঠাতাও পরমশিবই বটে। তাই ঐগুলি সম্যক্‌রূপে শুদ্ধ না হইলেও তৎতৎ সিদ্ধিপ্রদানে সমর্থ।

উপসংহার

দীক্ষা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান প্রায় সকল কথাই বলা হইল। তবে অবান্তর অনেক বিষয়ই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় উপেক্ষা করা হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে ক্রিয়াবতী, বর্ণাত্মিকা, কলাবতী ও বেধময়ী দীক্ষার কথা বলা হইয়াছে (শারদাতিলক পঞ্চম অধ্যায়)। ক্রিয়াবতী দীক্ষা বাহ্য। বর্ণময়ী দীক্ষার প্রভাবে শিষ্যের দিব্যদেহ প্রাপ্তি ঘটে। গুরু শিষ্যের শরীরে তৎতৎ

৩৩ নিম্ন অধিকারীর এই সূক্ষ্ম অর্থে আস্বাদন প্রাপ্তি হয় না বলিয়া ত্যাগাদি প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

স্থানে বর্ণসকল ন্যাস করেন ও প্রতিলোমে সংহার করেন। ইহাই বর্ণময়ী দীক্ষা। কলাবতী দীক্ষা ইহা হইতে ভিন্ন। ইহাতে কলার উপযোগ করা হয়। বেধদীক্ষার তত্ত্বটি এইপ্রকার: গুরু শিষ্যের দেহে মূলাধারে চতুর্দল-কমলে ত্রিকোণের মধ্যে বলয়ত্রয়যুক্ত তড়িৎকোটিসমপ্রভা চিদ্‌রূপা শৈবীশক্তি কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবেন যেন ঐ শক্তি ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া মধ্যপথে পরমশিব পর্যন্ত উত্থান করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মূলাধারের চারিটি বর্ণ ব্রহ্মাতে উপসংহৃত হইতেছে ও ব্রহ্মা ষড়্‌দলময় স্বাধিষ্ঠানে যুক্ত হইতেছেন। তারপর স্বাধিষ্ঠানের ছয়টি বর্ণ বিষ্ণুতে উপসংহৃত হইতেছে ও বিষ্ণু দশদলময় নাভি-কমলে যুক্ত হইতেছেন। অনন্তর মণিপুরের দশটি বর্ণ রুদ্রে সংহৃত হইতেছে। এইপ্রকারে সর্বান্তে সদাশিবকে 'হ-ক্ষ'ময় দ্বিদলে যুক্ত করিবে। পরে ঐ দুইটি বর্ণকে বিন্দুতে সংহার করিবে। বিন্দুই শিব। তখন আর কোন বর্ণ নাই। বিন্দুকে যোগ করিবে নাদে, নাদকে নাদান্তে এবং নাদান্তকে উন্মনীতে। উন্মনীকে যোগ করিতে হয় গুরুবক্ত্রে। কলা, নাদ, নাদান্ত, উন্মনী ও গুরুবক্ত্র এইসব ভ্রূ-মধ্যের উপরে চক্রসংস্থান। তাই সহস্রারকে কেহ কেহ দ্বাদশান্ত বলেন।

এইভাবে শিষ্যের জীবাত্মার সঙ্গে শক্তিকে শিবে বেধ করিতে হয়। শক্তি ব্যতীত বেধক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। বেধের ফলে শিষ্য ছিন্নপাশ হইয়া ভূপতিত হয়। পরে দিব্যবোধ প্রাপ্তি ঘটে। ফলে 'তৎক্ষণাৎ' শিষ্য 'সর্ববিৎ' হয়—সাক্ষাৎ শিবভাব প্রাপ্ত হয়।

কেহ কেহ সহজ, আগন্তুক ও প্রাসঙ্গিক ভেদে পাশকে তিন প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন (প্রয়োগসার)। বেধদীক্ষাপ্রসঙ্গে রাঘবভট্ট বলিয়াছেন যে সোমানন্দ বেধ দ্বারা উৎপলাচার্যকে শিবাত্মক করিয়াছিলেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শারদা-তিলককার লক্ষ্মণ এই উৎপলাচার্যের শিষ্য।

ষড়ন্বয়মহারত্ন গ্রন্থে আণবীদীক্ষার দশটি প্রকারভেদের বর্ণনা আছে। শাক্তেয়ীদীক্ষা একপ্রকার, শাম্ভবীও একপ্রকার। আণবীর দশটি ভেদের নাম—স্মার্তী, মানসী, যৌগী, চাক্ষুষী, স্পার্শিণী, বাচিকী, মান্ত্রিকী, হৌত্রী, শাস্ত্রী ও আভিষেচিকী।[৩৪]

৩৪ স্মার্তী—গুরু বিদেশস্থ শিষ্যকে স্মরণ করিয়া ক্রমশঃ তাহার পাশত্রয় বিশ্লেষ করেন ও লয়যোগাঙ্গবিধানে তাহাকে পরমশিবে যোজন করেন।
মানসী—শিষ্যকে নিজের নিকটে বসাইয়া মনে মনে তাহাকে আলোচন দ্বারা তাহার মলত্রয় মোচন।

মধ্যযুগে বৌদ্ধগণের মধ্যে কেহ কেহ দীক্ষা সম্বন্ধে ততটা অনুকূল মত পোষণ করিতেন না। প্রসিদ্ধি আছে, আচার্য ধর্মকীর্তি নাকি দীক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া কিছু লিখিয়াছিলেন। ইহাও প্রসিদ্ধি আছে, সুবিখ্যাত তান্ত্রিক আচার্য খেটপাল ধর্মকীর্তির মত খণ্ডন করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ধর্মকীর্তির মূলগ্রন্থ যেমন পাওয়া যায় না, খেটপালের প্রতিবাদ গ্রন্থও তেমনি পাওয়া যায় না (দ্রষ্টব্য—বর্তমান লেখক-রচিত 'তান্ত্রিক বাঙ্‌ময় মেঁ শাক্তদৃষ্টি', পৃ. ৪১)।

যোগী = যোগোক্ত ক্রমে গুরু শিষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার আত্মাকে নিজের আত্মাতে যুক্ত করেন। ইহা যোগদীক্ষা।

চাক্ষুষী = 'শিবোহং' ভাবে সমাবিষ্ট হইয়া গুরু করুণাদৃষ্টিতে শিষ্যকে দেখেন। তাই ইহার নাম চাক্ষুষী দীক্ষা।

স্পর্শিনী = গুরু স্বয়ং পরমশিবরূপে নিঃসন্দেহে শিবহস্ত দ্বারা শিষ্যের মস্তকে মন্ত্রসহ স্পর্শ করেন। তাই এই নাম।

বাচিকী = গুরুবক্তুকে নিজ বক্তু মনে করিয়া শ্রদ্ধার সহিত গুরুবক্তু প্রয়োগে দিব্য মন্ত্রাদি দিবেন (মুদ্রান্যাসাদি সহ)।

মান্ত্রিকী = মন্ত্রন্যাসযুক্ত অবস্থায় গুরু স্বয়ং মন্ত্রতনু হইয়া মন্ত্রদান করিবেন।

হৌত্রী = কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে অগ্নিস্থাপন করিয়া লয়যোগের ক্রমে প্রতি অধ্বার শুদ্ধির জন্য হোম করিবেন।

শাস্ত্রী = যোগ্য ভক্ত শুশ্রূষু অর্চনশীল শিষ্যকে শাস্ত্রদান। ইহাও একপ্রকার দীক্ষা।

আভিষেচিকী = শিব ও শিবাকে কুম্ভে পূজন করিয়া শিবকুম্ভাভিষেক দীক্ষা সিদ্ধ হয়।

তান্ত্রিক সাধনার দৃষ্টিভঙ্গী

দীক্ষার প্রসঙ্গ এতক্ষণ আলোচিত হইল। তান্ত্রিক মতে দীক্ষার পরেই যথা
সাধনা আরম্ভ হয়। এখন তান্ত্রিক সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য দেখানোর চেষ্টা ক
হইতেছে। কোনো সাধনার বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথম উহা
দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। দৃষ্টি হইতেই লক্ষ্যের নিদে
বুঝিতে পারা যায়। যতক্ষণ লক্ষ্য নির্দিষ্ট না হয় ততক্ষণ সাধনার চেষ্টা বৃ
কালক্ষেপ মাত্র জানিতে হইবে। কারণ, লক্ষ্য ও উহার প্রাপ্তির উপায় জানি
ঐ উপায়ের অনুশীলন করারই নামান্তর সাধনা। সুতরাং তান্ত্রিক সাধন
রহস্য বুঝিতে হইলে তান্ত্রিক দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। দৃ
পূর্ণ ও অপূর্ণভেদে দুইপ্রকার। অপূর্ণ দৃষ্টিতে যাহা লক্ষ্য মনে হয় পূ
দৃষ্টির বিকাশ হইলে তাহা আর লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য বলি
প্রতীত হয় না। তখন মনে হয় উহা প্রকৃত লক্ষ্যের এক অংশ মাত্র। তা
হইলেও আলোচনার জন্য আমাদিগের পক্ষে উভয় দৃষ্টিরই মর্যাদা রক্ষ
আবশ্যক। সাধনার পরিপক্বতার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ দৃষ্টি পূর্ণ দৃষ্টিে
পর্যবসিত হয়।

বৌদ্ধগণ যেমন বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ নামক ত্রিরত্ন স্বীকার করেন তদ্রূ
বেদবাদী তান্ত্রিক আচার্যগণ শিব, শক্তি ও বিন্দু এই তিন রত্ন স্বীকার করেন।

১ কামিক, রৌরব, স্বায়ম্ভুব, মৃগেন্দ্র প্রভৃতি আগমে এবং অঘোরশিব, সদ্যোজা
রামকণ্ঠ, নারায়ণকণ্ঠ প্রভৃতি আচার্যগণের গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ উপলব্ধ হয়। ইহ
মূলে ভেদদৃষ্টি বিদ্যমান। বর্তমান আলোচনার মূলে এই দৃষ্টিই গৃহীত হইয়াছে
অভেদবাদী আগম-আচার্যগণের গ্রন্থে কোনো কোনো বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভিন্নপ্রকার বিব
দৃষ্ট হয়। ইহার মূল কারণ দৃষ্টিভেদ ভিন্ন অপর কিছু নহে। শাক্তগণ প্রধান
অদ্বৈতবাদী। শৈব সম্প্রদায়ে দ্বৈত ও অদ্বৈত দুইপ্রকার দৃষ্টিই দেখিতে পাওয়া যায়
প্রসিদ্ধি আছে, শিবের ঈশানাদি পঞ্চ মুখ হইতেই সমস্ত মূল তন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছিল
উহার মধ্যে ভেদপ্রধান শিবতন্ত্র দশটি, ভেদাভেদপ্রধান রুদ্রতন্ত্র আঠারটি এবং অভেদপ্র
ভৈরবতন্ত্র চৌষট্টিটি। ঈশান, তৎপুরুষ এবং সদ্যোজাত এই তিন মুখের প্রত্যেকটির দুই
অবস্থা আছে—একটির নাম উদ্ভূত, অপরটির নাম উদ্ভবোন্মুখ। এইপ্রকার পৃথক্ পৃথ
তিনটি মুখ হইতে ছয় তন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার পর দুই দুই মুখের মিলন হই

ইঁহারাই সকল তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা ও উপাদানরূপে প্রকাশমান। শুদ্ধ তত্ত্বময় কার্যাত্মক শুদ্ধ জগতের উপাদান বিন্দু এবং কর্তা শিব ও করণ শক্তি। অশুদ্ধ তত্ত্বময় জগতেও পরম্পরাতে শিব ও শক্তি কর্তা ও করণ এবং নিবৃত্তি প্রভৃতি পঞ্চকলার মাধ্যমে বিন্দু আধার। বিন্দুর অপর নাম মহামায়া। ইহাই ক্ষুব্ধ হইয়া বিচিত্র সুখময় ভুবন ও ভোগ্যাদিরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ শুদ্ধ জগৎ উৎপাদন করে। ভোগার্থী সাধক ভৌতিক দীক্ষার প্রভাবে এই আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে সাধক প্রথম হইতেই মহামায়ার রাজ্যের সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা রাখে না সে নৈষ্ঠিক দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শক্তির সহিত নিত্যমিলিত শিবস্বরূপ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া থাকে।

বিন্দুক্ষোভের ফলে উহার পরিণামস্বরূপ যেমন একদিকে শুদ্ধ দেহ, ইন্দ্রিয়, ভোগ ও ভুবনরূপী শুদ্ধ অধ্বার উৎপত্তি হয়, তেমনি অপরদিকে শব্দেরও উৎপত্তি হয়। শব্দ সূক্ষ্মনাদ, অক্ষরবিন্দু ও বর্ণ ভেদে তিনপ্রকার। সূক্ষ্মনাদ অভিধেয় বুদ্ধির কারণ—ইহাই বিন্দুর প্রথম প্রসার। ইহা চিন্তন-শূন্য। অক্ষরবিন্দু সূক্ষ্মনাদের কার্য ও পরামর্শজ্ঞানস্বরূপ। ইহা ময়ূরাণ্ডরসের[২] ন্যায় অনির্বচনীয়। বর্ণাত্মক স্থূল শব্দ শ্রোত্রগ্রাহ্য। ইহা বায়ু ও আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। কালোত্তর তন্ত্রে আছে—

স্থূলং শব্দ ইতি প্রোক্তং সূক্ষ্মং চিন্তাময়ং ভবেৎ।
চিন্তয়া রহিতং যৎ তু তৎ পরং পরিকীর্তিতম্ ॥

বিন্দু জড় হইলেও শুদ্ধ। পঞ্চরাত্র অথবা ভাগবত সম্প্রদায় অন্তর্গত বৈষ্ণব আগমে যাহাকে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলে তাহারই নামান্তর বিন্দু। পরমেশ্বরের সঙ্গে বিন্দু অথবা মহামায়ার কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে দুইপ্রকার মত প্রচলিত আছে—

(অর্থাৎ ঈশান + তৎপুরুষ, ঈশান + সদ্যোজাত, এবং সদ্যোজাত + তৎপুরুষ হইতে) তিন তন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। পুনরায় তিনের পরস্পর মিলন হইতে একটি তন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। এইপ্রকারে তন্ত্রসংখ্যা মোট দশটি ; ইহারা ভেদপ্রধান। অষ্টাদশ ভেদাভেদ তন্ত্রের উদয়ও এইভাবে বুঝিতে হইবে। এইগুলি পূর্ববর্ণিত তিন মুখের সহিত বামদেব ও অঘোর নামক দুই মুখের ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মিলন হইতে অথবা কেবল বামদেব ও অঘোর এই দুই মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইখানে বর্ণিত শিবজ্ঞান ও রুদ্রজ্ঞান ঊর্ধ্বস্রোতের অন্তর্গত। অভেদজ্ঞান অথবা ভৈরবাগম শিবের দক্ষিণমুখ অথবা যোগিনীবক্তু হইতে উদ্ভূত হয়। ইহা শিবশক্তির সংযোগাত্মক ও অন্বয়স্বভাববিশিষ্ট।

২ যেপ্রকার ময়ূরের অণ্ডের রসে উহার পাখার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ অভিন্নভাবে অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে, সেইপ্রকার অক্ষরবিন্দুতে স্থূল বাণীর সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য অব্যক্তভাবে অভিন্নরূপে থাকে। ইহাই ময়ূরাণ্ডরসন্যায়।

(ক) একটি প্রসিদ্ধ মত এই যে সমবায়িনী ও পরিগ্রহরূপা দুইটি শক্তি শিবের আশ্রিত। তন্মধ্যে সমবায়িনী শক্তি চিদ্‌রূপা, অপরিণামিনী, নির্বিকারা ও স্বাভাবিকী। ইহাই আগম শাস্ত্রের ছত্রিশ তত্ত্বের অন্তর্গত শক্তিতত্ত্ব। ইহা শিবস্বরূপে নিত্য সমবেত থাকে। শিব ও শক্তি উভয়ের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। পরিগ্রহ শক্তি অচেতন ও পরিণামশীলা; ইহার নাম বিন্দু। বিন্দু শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে দুইপ্রকার। সাধারণতঃ শুদ্ধরূপকেই বিন্দু বা মহামায়া বলা হয়। অশুদ্ধ রূপের নাম মায়া। উভয়েই নিত্য। অশুদ্ধ অধ্বার উপাদানকারণ মায়া এবং শুদ্ধ অধ্বার উপাদানকারণ মহামায়া। ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব ও কলাদিকঞ্চুক অশুদ্ধ অধ্বার অন্তর্গত। এই সব মায়ারই কার্য। অবশ্য পুরুষ অথবা আত্মা নিত্য এবং এইসব হইতে পৃথক্। কিন্তু উহাতেও পুংস্ত্বনামক আবরণ থাকে। মায়ার ঊর্ধ্বস্থিত তত্ত্ব শুদ্ধ অধ্বার অন্তর্গত।

(খ) দ্বিতীয়মত এই যে, একমাত্র বিন্দুই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অধ্বার উপাদান। এই মতে মায়া নিত্য নহে কিন্তু কার্যরূপা। মহামায়া অথবা বিন্দুর তিনটি অবস্থা—পরা, সূক্ষ্মা ও স্থূলা। পরাবস্থার নাম 'মহামায়া', 'পরামায়া', 'কুণ্ডলিনী' ইত্যাদি। ইহা পরমকারণস্বরূপ ও নিত্য। সূক্ষ্ম এবং স্থূল এই দুইটি অবস্থা কার্য বলিয়া অনিত্য। মহামায়া বিক্ষুব্ধ হইলে উহা হইতে শুদ্ধধাম এবং ঐ সকল ধামে স্থিতিশীল মন্ত্র (বিদ্যা) ও মন্ত্রেশ্বর (বিদ্যেশ্বর) বর্গের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি রচিত হয়। অর্থাৎ শুদ্ধ জগতের সংস্থান ও দেহাদি সব সাক্ষাৎভাবে মহামায়ার কার্য। এই সকল বিশুদ্ধ, মায়াতীত ও উজ্জ্বল-স্বরূপ। মহামায়ার সূক্ষ্ম ও দ্বিতীয় অবস্থার নাম 'মায়া'। কলাদিতত্ত্ব-সমূহের অবিভক্ত স্বরূপকে মায়া বলে। কলাদি সম্বন্ধবশতঃই দ্রষ্টা আত্মা ভোক্তা পুরুষরূপে পরিণত হন। মায়া হইতে তত্ত্ব ও ভুবনাত্মক কলাদি এবং প্রকৃতি প্রভৃতি সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হয়। সমস্ত অশুদ্ধ অধ্বার মূল কারণ 'মায়া'। আগমে একদিকে যেমন মায়াকে 'জননী' বলা হইয়াছে অপরদিকে তেমনই ইহাকে 'মোহিনী' বলা হইয়াছে। মহামায়ার স্থূল বা তৃতীয় অবস্থার নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। ইহা সাক্ষাৎভাবে কিংবা পরম্পরাক্রমে ভোক্তাপুরুষের বুদ্ধি প্রভৃতি ভোগসাধন এবং সমস্ত ভোগ্যবিষয়ের উৎপাদিকা। কলাদিতত্ত্বের সম্পর্কবশতঃ পুরুষ ভোক্তারূপ ধারণ করে। উহার ভোগ্য এ ভোগসাধনের সৃষ্টির জন্য মহামায়া প্রকৃতিরূপ স্থূল অবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বিন্দু শিবস্বরূপে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না; ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাই প্রচলিত মত। এই মতে বিন্দু পরিণামী বলিয়া "জড়"। এইজন্য

চিদাত্মক পরমেশ্বরের স্বরূপের সহিত ইহার সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না। শিবের সহিত বিন্দুর সমবায় স্বীকার করিলে চিৎস্বরূপ শিবের অচেতনত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। শ্রীকণ্ঠাচার্য বলেন—

'স হি তাদাত্ম্যসম্বন্ধো জড়েন জড়িমাবহঃ।
শিবস্যানুপমাখণ্ডচিদ্‌ঘনৈকস্বরূপিণঃ ॥'৩

কিন্তু তান্ত্রিক ভেদবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ বিন্দুসমবায়বাদীও ছিলেন। তাহাদিগের মতে শিবের সমবায়িনী শক্তি দুই প্রকার—একটি দৃক্‌শক্তি বা জ্ঞানশক্তি এবং অপরটি ক্রিয়াশক্তি বা কুণ্ডলিনী। ক্রিয়াশক্তির দ্বিতীয় নাম কুণ্ডলিনী। মায়া ইহা হইতে সর্বপ্রকারে ভিন্ন। মায়া শিবস্বরূপে সমবেত হয় না। পরমেশ্বরের জগৎবিষয়ক জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির দ্বারা মায়িক জগতের রচনা উপপন্ন হয়। জ্ঞানশক্তি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের গ্রহণে চরিতার্থ হয়। কিন্তু ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত বস্তুনির্মাণরূপ ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান ও ক্রিয়া-রূপ এই দুইটি শক্তি পরমেশ্বরে অবিনাভূতরূপে বিদ্যমান থাকে।

বিন্দুর ক্ষোভ হইতে যেপ্রকারে শুদ্ধ জগৎ উৎপন্ন হয়, ঠিক সেইপ্রকার মায়ার ক্ষোভ হইতে অশুদ্ধ জগৎ উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর যখন আত্মসমবেত শক্তির দ্বারা বিন্দুকে স্পর্শ করেন তখন বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া বৈষম্য প্রাপ্ত হয়। বিন্দুর ক্ষোভ অন্য কোনোপ্রকারে ঘটিতে পারে না। সেইজন্য একমাত্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের শক্তির প্রভাবে শুদ্ধজগতের উৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু মায়ার ক্ষোভ সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বরের শক্তির দ্বারা ঘটিতে পারে না।

তন্ত্রমতে সৃষ্টি, পালন, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ এই পাঁচটি কার্যের মুখ্য কর্তা একমাত্র পরমেশ্বর ; ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি বাস্তবিক কর্তা নহেন। এইজন্য সর্বত্র পরমেশ্বরকে পঞ্চকৃত্যকারী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই সকল কৃত্য সম্পাদন করিবার জন্য শুদ্ধ অধ্বা আবশ্যক হয়। তাই বিন্দুক্ষোভের কারণ আছে। পরমেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি বস্তুতঃ এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও উপাধিভেদবশতঃ তাহাতে আরোপিত ভেদও অবশ্যই আছে। যখন এই শক্তি অব্যক্ত থাকে, তখন উহা নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ, এবং সংবিদ্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ সময়ে বিন্দুও স্থির ও অক্ষুব্ধ থাকে, কারণ শক্তি সক্রিয় না হইলে বিন্দু ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। এই অবস্থাটি বিন্দুর স্বরূপাধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরের লয়াবস্থা।

৩ অর্থাৎ অনুপম এবং অখণ্ড চিদ্‌ঘনস্বরূপ শিবের পক্ষে জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ স্বীকার জড়ত্বের কারণ হইয়া পড়িবে, এইরূপ আশংকা আছে।

এইখানে একটি কথা বলা উচিত মনে হইতেছে। প্রচলিত মতে শক্তি এক বলিয়া উহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়াগত ভেদ নাই। যে ভেদ প্রতীত হয় তাহা ঔপাধিক। এইজন্য জ্ঞানও সর্বদা ক্রিয়ারূপ জানিতে হইবে। তাই সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে ক্রিয়াশব্দ প্রায়ই শক্তিবাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন এই শক্তি সমগ্র ব্যাপার হইতে উপরত হইয়া স্বরূপমাত্রে অবস্থিত হয় তখন শিবকে (পরমেশ্বরকে) শক্তিমান্ বলা হইয়া থাকে। ক্রিয়ারূপ শক্তি তখন মুকুলিত অবস্থায় শিবে অবস্থান করে। ইহাই পরমেশ্বরের পূর্বোক্ত লয়াবস্থা। কিন্তু যখন শক্তি উন্মেষপ্রাপ্ত হইয়া উদ্যোগপূর্বক বিন্দুকে কার্য উৎপাদনের জন্য উন্মুখ করে এবং কার্য উৎপাদন করিয়া শিবের জ্ঞানক্রিয়া সমৃদ্ধ করে, তখনকার ঐ অবস্থা শিবের ভোগাবস্থা নামে বর্ণিত হয়। পরমেশ্বরের ভোগ অথবা পরমানন্দ সুখ-সংবেদন বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন। কারণ, মলহীন চিৎ সত্তাতে উপাধিভূত আনন্দরূপী ভোগ হইতে পারে না। এই অবস্থাতে শক্তি সক্রিয় বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে শিবকেও সক্রিয় বলা হইয়া থাকে।

> "স তয়া রমতে নিত্যং সম্পদ্‌যুক্তঃ সদা শিবঃ।
> পঞ্চমন্ত্রতনুঃ শ্রীমান্ দেবঃ সকলনিষ্কলঃ ॥"[৪]

লয়াবস্থাতে শিবকে নিষ্কল এবং ভোগাবস্থাতে তাহাকে স-কলনিষ্কল বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুইটি ব্যতীত তাহার অধিকারাবস্থা নামে আর একটি অবস্থা আছে। ইহার বর্ণনা পরে করা হইবে। এই অবস্থাতে শিব স-কলভাবে বিরাজ করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, শিব বা পরমেশ্বরের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বাস্তবিক নহে, ঔপচারিক মাত্র। শক্তি অথবা কলার অবিকাশ দশা, বিকাশোন্মুখ দশা এবং পূর্ণবিকাশ দশা অনুসরণ করিয়া শিবের উক্ত ভিন্ন ভিন্ন দশা কল্পিত হইয়াছে। শিব ও শক্তির এই অবস্থাভেদের মূলে বিন্দুর অবস্থা-ভেদ বিদ্যমান। নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীত নামক কলাবর্গ বিন্দুরই পৃথক্ পৃথক্ নাম মাত্র। ইহাদের মধ্যে শান্ত্যতীত কলাকে বিন্দুর স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। ইহা অক্ষুব্ধ বিন্দু বা লয়াবস্থা। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ যাবতীয় ভোগাধিষ্ঠানই শান্তি প্রভৃতি চারিটি কলার পরিণামস্বরূপ। বস্তুতঃ এইস্থানে ভোগাধিষ্ঠান শব্দে শান্তি প্রভৃতি চারিটি কলার ভুবন বুঝিতে হইবে। শান্ত্যতীত কলা অথবা পরবিন্দু সমস্ত কলার কারণাবস্থা অথবা লয়াবস্থা। তাই শান্ত্যতীত ভুবনকে ঠিক ঠিক ভোগস্থান বলা চলে

৪ অর্থাৎ সেই পঞ্চমন্ত্রতনু স-কলনিষ্কল ভগবান সদাশিব উদ্‌যুক্ত হইয়া সর্বদা ঐ শক্তির সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

না। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হওয়ার জন্য কোন কোন আচার্য ইহাকেও ভোগস্থান রূপে গণনা করিয়াছেন। ইহা ভোগের বীজাবস্থা।

কলাত্মক শক্তিই শিবের দেহরূপে কল্পিত হয়। এইজন্য লয়াবস্থাতে বিন্দুর বিক্ষোভ না থাকিলেও কলার উদ্ভব থাকে না বলিয়া নিষ্কল শিবকে 'অশরীর' বলা হইয়া থাকে। ভোগাবস্থাতে শিবের অবস্থা সকল-নিষ্কল উভয়াত্মক। ঐ সময়ে তাঁহার দেহ পঞ্চমন্ত্রাত্মকরূপে বর্ণিত হয়। তন্ত্রমতে শক্তিই মন্ত্র। সেইজন্য ঐ দেহ পঞ্চশক্তিময় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

"মননাৎ সর্বভাবানাং ত্রাণাৎ সংসারসাগরাৎ।
মন্ত্ররূপা হি তচ্ছক্তিঃ মননত্রাণরূপিণী ॥"[৫]

এই মন্ত্ররূপা শক্তি মূলে এক ও অভিন্ন, কিন্তু উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অধিষ্ঠানবশতঃ কার্যভেদ হয় বলিয়া একই মূলশক্তি পঞ্চরূপে প্রতীত হয়। তদনুসারে বিন্দুভুবনের অথবা শান্ত্যতীত কলাভুবনের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিকে ঈশান মন্ত্র বলা হয় এবং শান্তি প্রভৃতি চারিটি ভুবনের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিকে তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, বামদেব এবং অঘোর মন্ত্র বলা হয়। এই সকল ভুবন ভোগস্থান। ঈশান প্রভৃতি পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা শক্তি দেহের কার্য করে সেইজন্য উহা 'শিবতনু' নামে প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক পক্ষে ইহা পারমার্থিক দেহ নহে। এই দেহ পঞ্চমূর্তি পরমেশ্বরের পঞ্চকৃত্য সম্পাদনে উপযোগী। বিন্দুর সমস্ত কলা কারণাবস্থাতে লীন থাকিলে অর্থাৎ পরবিন্দু অবস্থাতে বিন্দুর কোন বিভাগ থাকে না। ইহার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি শিবের পরামূর্তি। ইহা লয়াবস্থার কথা। যখন শিবকে অশরীর বলা হয় তখন ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করা হয়। তখন শক্তি লীন থাকে এবং বিন্দু অক্ষুব্ধ থাকে বলিয়া থাকিয়াও না থাকার সমান। একমাত্র শিবই তখন নিজ মহিমায় বিরাজ করেন। যখন বিন্দুর কলাসকল কার্যাবস্থাতে থাকে তখন তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিকে শিবের অপরামূর্তি বলা হয়। ভোগস্থান রূপে যে সকল কলা ও ভুবনের উল্লেখ পাওয়া যায় তন্মধ্যে নিবৃত্তিভুবন সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের। এই নিবৃত্তিভুবনের অধোবর্তি ভুবনের নাম সদাশিব ভুবন। ইহার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি শিবের অপরামূর্তি অথবা "সদাশিব তনু"। এই নামটি ঔপচারিক। সদাশিবভুবনের অধিষ্ঠানবশতঃ ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। দীক্ষা প্রভৃতির দ্বারা যে সকল জীব ভিন্ন ভিন্ন ভুবনে গমন করে তাহাদের মধ্যে সত্য সত্যই ভেদ আছে, কিন্তু শিব ও শক্তির ভেদ

৫ অর্থাৎ সমস্ত ভাবের মনন এবং সমস্ত সংসার হইতে ত্রাণ করার সামর্থ্যবশতঃ এই মননত্রাণরূপিণী শক্তিকে মন্ত্র বলা হয়।

বাস্তবিক নহে; ঔপচারিক বা কল্পিত। কারণ, কার্যভেদবশতঃ এই ভেদ অংগীকার করা হয়—

'অধিকারী স ভোগী চ লয়ী স্যাৎ উপচারতঃ।'

অর্থাৎ শিবের শক্তির দ্বারা শোভিত মহামায়া যে যে কার্য সম্পাদন করেন সেই কার্যের অধিষ্ঠাতা শিব ও শক্তিতে কার্যভেদ ও স্থানভেদবশতঃ উপচারনিবন্ধন তৎ তৎ সংজ্ঞার প্রয়োগ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যেমন— শান্তিভুবনের অধিষ্ঠান এবং উৎপাদনবশতঃ শক্তি ও শিবকে যথাক্রমে শান্তা ও শান্ত সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়; অন্যত্রও সেইরূপ জানিতে হইবে।

কিন্তু যঃ পতিভেদোঽস্মিন্ সঃ শাস্ত্রে শক্তিভেদবৎ।
কৃত্যভেদোপচারেণ তদ্ভেদঃ স্থানভেদতঃ॥

অধিকার অবস্থাপন্ন শিব 'স-কল' পদবাচ্য। তিনি বিন্দু হইতে অবতীর্ণ অণু সদাশিববর্গ দ্বারা আবৃত। এই সকল সদাশিব বস্তুতঃ পশুআত্মা, শিবাত্মা নহে। ইহাদের মধ্যে আণবমল কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে বলিয়া ইহাদের জ্ঞানক্রিয়া-রূপা শক্তি কিঞ্চিৎ সংকুচিতা। ইহারা শিবের ন্যায় পূর্ণরূপে অনাবৃত শক্তিসম্পন্ন নহে। ইহারা মুক্তপুরুষ হইলেও সর্বপ্রকারে মলহীন না হওয়ার জন্য পরামুক্তি অথবা শিবসাম্য প্রাপ্ত হয় নাই। সদাশিব ভুবনের অধিষ্ঠাতা বলিয়া পরমেশ্বরকেও সদাশিব বলা হইয়া থাকে। তিনি কিন্তু স্বয়ং শিবরূপী। তিনি পূর্বোক্ত অণুসদাশিববর্গকে নিজ নিজ ভুবনের ভোগে নিয়োজিত করেন এবং বিদ্যেশ্বর ও মন্ত্রেশ্বরবর্গকে আপন আপন সামর্থ্যানুসারে অশুদ্ধ অধ্বার অধিকার কার্যে নিযুক্ত করেন। এই দুইপ্রকার নিয়োজন কার্যই অধিকার অবস্থাস্থিত শিব বা সকলশিবের কার্য। ইহাই তাঁহার প্রেরকত্ব এবং প্রভুত্ব। এই সদাশিবরূপী শিবই সমগ্র জগতের প্রভুরূপে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ সমগ্র অধ্বার ঊর্ধ্বদেশে বিদ্যমান আছেন। যোগিগণ এইভাবে ধ্যান করিয়া থাকেন। মায়ার ঊর্ধ্বে শুদ্ধ অধ্বাতে অনেক ভুবন বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক ভুবনে তদনুরূপ দেহ, ইন্দ্রিয় এবং ভোগ্যাদিও আছে। এইগুলি বিশুদ্ধ বৈন্দব উপাদানে রচিত। ইহাদের মধ্যেও ভুবনের ঊর্ধ্ব-অধঃ বিভাগবশতঃ বুঝা যায় যে ক্রমিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যাতত্ত্বে যে বামা এবং জ্যেষ্ঠাদির ভুবন আছে তন্মধ্যে বামা ভুবন অপেক্ষা জ্যেষ্ঠা ভুবন শ্রেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠা ভুবন অপেক্ষা রৌদ্রী ভুবন শ্রেষ্ঠ। এই বিদ্যাতত্ত্বেই সাতকোটি মন্ত্র এবং তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী সাতটি বিদ্যারাজ্ঞী অবস্থান করেন। ঈশ্বরতত্ত্বে আটজন বিদ্যেশ্বর নিজ নিজ পুরে বিরাজ করেন। ইহাদের মধ্যে শিখণ্ডী সর্বাপেক্ষা নীচে এবং অনন্ত সর্বাপেক্ষা উপরে। এই আটটির মধ্যে পূর্ববৎ ক্রমোৎকর্ষ আছে। সদাশিবতত্ত্বও ঠিক এইপ্রকার বুঝিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে পশুআত্মা সম্পর্কে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। এইসকল আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য, বিভু এবং চৈতন্যাদি বিভিন্ন শিবধর্মময় হইলেও ইহারা সংসার অবস্থাতে এইসকল ধর্মের বিকাশ অনুভব করিতে পারে না। শিবের যেমন সর্ব জ্ঞান-ক্রিয়ারূপা চৈতন্যশক্তি আছে তেমনি জীব অথবা পশু আত্মারও আছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভেদ এই যে, এই সর্বজ্ঞত্ব সর্বকর্তৃত্বরূপা শক্তি শিবস্বরূপে যেমন সর্বদা অনাবৃত থাকে, পশুতে ঐসব শক্তি সর্বদা থাকিলেও অনাদিকাল হইতে পাশসমূহের দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে। মল, কর্ম ও মায়া এই তিনটি পাশের মধ্যে কোন কোন আত্মা একটি পাশের দ্বারা আবদ্ধ, কোনটি দুইটি এবং কোনটি তিনটি পাশের দ্বারাই আবদ্ধ। যেসকল আত্মাতে এই তিনটি পাশের বন্ধন আছে তাহাদিগকে 'স-কল' বলা হয়। যেসকল আত্মার মায়িক কলা প্রভৃতি প্রলয়াদি অবস্থাতে লীন হইয়া যায় এবং মল ও কর্ম ক্ষীণ হয় না তাহাদের শাস্ত্রীয় নাম 'প্রলয়াকল'। বিজ্ঞান প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে কর্মক্ষয় হইয়া গেলে যখন কেবল মল নামক একটি পাশ অবশিষ্ট থাকে তখন সেই অবস্থাতে আত্মাকে 'বিজ্ঞানাকল' বলা হয়। ইহার নামান্তর 'বিজ্ঞানকেবলী'। এই আত্মা মলের পরিপাকগত তারতম্যবশতঃ তিন প্রকার। সকলেই মায়াতীত এবং সকলেই কর্মবাসনা হইতে মুক্ত। কিন্তু কিঞ্চিৎ অধিকারমল থাকিয়া যাওয়ায় ইহারা শিবসাম্যরূপ পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না।

'উত্তীর্ণমায়াম্বুধয়ো ভগ্নকর্মমহার্গলাঃ।
অপ্রাপ্তশিবধামানঃ ত্রিধা বিজ্ঞানকেবলাঃ।।'

এই তিনপ্রকার বিজ্ঞানাকল আত্মার নাম ও পরিচয় সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে—

(ক) বিদ্যাতত্ত্বনিবাসী মন্ত্র ও বিদ্যা—ইহারা সংখ্যায় সাত কোটি। ইহারা সকলেই বিদ্যেশ্বরবর্গের আজ্ঞাধীন। ইহাদের বাসস্থান অথবা ভুবন বিদ্যাতত্ত্বে স্থিত। বিদ্যেশ্বরগণ পাশবদ্ধ সকল জীবের উদ্ধারের সময় এইসকল মন্ত্র ও বিদ্যাসংজ্ঞক বিজ্ঞানাকল আত্মা অথবা দেবতাকে নিজেদের অনুগ্রহকার্যের করণ-রূপে ব্যবহার করেন। এইসকল বিদ্যেশ্বর পঞ্চকৃত্যকারী বলিয়া তাহাদের মধ্যেও অনুগ্রাহকত্ব আছে। বামাদি বিদ্যাভুবনসকল উত্তরোত্তর সাজানো আছে। দেহ, ভোগ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির উৎকর্ষ এইসকল ভুবনে ক্রমশঃ অধিক। জ্ঞান, যোগ ও সংন্যাসাদি উপায়ের দ্বারা অথবা ভোগের দ্বারা কর্মরাশির ক্ষয় হইলে পর কর্মসকলের ফলভোগের সাধনভূত মায়িক, সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহের আত্যন্তিক বিশ্লেষ ঘটিয়া থাকে। ঐ সময়ে আত্মা কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়া মায়ার ঊর্ধ্বে শুদ্ধ বিদ্যাতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া অণুরূপে স্থিত হয়। তখন কর্ম মায়া কাটিয়া গেলেও

মল অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই মল নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত আত্মার পশুত্ব নষ্ট হয় না বলিয়া উহার শিবত্বলাভের সম্ভাবনা থাকে না। যতক্ষণ মল পরিপক্ব না হয় ততক্ষণ পশুত্বের নিবৃত্তি অসম্ভব। অতএব এইসকল আত্মা মায়াতীত এবং কৈবল্যভাব প্রাপ্ত হইলেও অপরামুক্তি পর্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে না, পরামুক্তি তো দূরের কথা। সৃষ্টির প্রারম্ভে এইসকল 'অণু'রূপী আত্মার মধ্য হইতে যাহাদের মল অল্পবিস্তর পরিপক্ব হয় তাহাদিগের উপর ভগবান্ স্বয়ংই কৃপা করেন। অর্থাৎ উহাদিগকে নিজ নিজ মলপাকের অনুরূপ জ্ঞানক্রিয়াশক্তি উহাদিগের মধ্যে উন্মীলিত করিয়া দেন এবং মন্ত্র ও মন্ত্রেশ্বরাদি পদে শুদ্ধ অধ্বাতে ভোগ ও অধিকার কার্যে নিয়োজিত করিয়া দেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত শুদ্ধ তাঁহারা একই সঙ্গে পরতত্ত্বে অথবা শিবতত্ত্বে নিয়োজিত হন। অবশিষ্ট আত্মার মলপাক থাকে না বলিয়া উহাদের আবরণ অত্যন্ত ঘনীভূত থাকে। উহারা বিজ্ঞানকৈবল্য অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্যরূপা সর্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তি এই অবস্থাতে সুপ্ত থাকে। এইজন্য কৈবল্য অবস্থাতেও তাহাদের পশুত্বের নিবৃত্তি হইয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না। এই কেবলী আত্মা কর্মহীন বলিয়া একদিকে যেমন মায়ার কার্যরূপ জগৎকে অতিক্রম করিয়া যায়, অপরদিকে তেমনি মহামায়া অথবা বিন্দুর কার্যরূপ বিশুদ্ধ জগতে এখন পর্যন্ত প্রবেশও করিতে পারে না। ইহারা মধ্যাবস্থাতে থাকিয়া যায়। আত্মা স্বরূপতঃ বিভু বলিয়া বিজ্ঞানকেবলিগণের এই মধ্যস্থতা ঔপচারিক মাত্র হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে কৈবল্য তন্ত্রসম্মত মুক্তি নহে।

(খ) ঈশ্বরতত্ত্ববাদী বিদ্যেশ্বর সংখ্যাতে আটটি। তন্মধ্যে 'অনন্ত' প্রধান। ঈশ্বরতত্ত্বে ইহাদের আটটি ভুবন আছে। ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর গুণের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ 'শিখণ্ডী' হইতে 'শ্রীকণ্ঠে' গুণগত বৈশিষ্ট্য আছে। ভোগ, দেহ ও করণাদি বিষয়ে ইহাদের ভুবন শিখণ্ডী ভুবন হইতে শ্রেষ্ঠ। এইপ্রকার শ্রীকণ্ঠ হইতে ত্রিমূর্তির শক্তি অধিক। এইসকল বিদ্যেশ্বরগণের মধ্যে অনন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরমসমর্থ। ইঁহার মল সর্বথা শান্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল অধিকারমলের কিঞ্চিৎ বাসনা রহিয়া গিয়াছে। ইহারা সকলেই সাক্ষাৎ শিব হইতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত। মলের উপশম, অধিকারমলের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ এবং স্বয়ং শিব হইতে অনুগ্রহ লাভ, এইসব বৈশিষ্ট্য মন্ত্রবর্গের মধ্যেও থাকে। কিন্তু বিদ্যেশ্বরগণ পঞ্চকৃত্যকারী বলিয়া জীবোদ্ধার ব্যাপারে অনুগ্রহের কর্তা হয় এবং মন্ত্রগণ অনুগ্রহের করণ। ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। এই সব বিদ্যেশ্বর সম্বন্ধে রৌরব আগমে বলা হইয়াছে—

"সৃষ্টিসংরক্ষণাদানভাবানুগ্রহকারিণঃ।
শিবার্ককরসম্পর্কবিকাশাত্মীয়শক্তয়ঃ ।।"

ইহা হইতে বুঝা যায়, ইহাদের আত্মশক্তিসকল শিবের অনুগ্রহরূপ সংসর্গ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

(গ) সদাশিবতত্ত্বস্থ ভুবনবাসী পশুসদাশিব অথবা সংস্কার্যসদাশিব অধিকারস্থ শিবের ন্যায় পঞ্চকৃত্যকারী। সদাশিব তত্ত্বে আশ্রিত হওয়ার দরুণ ইহারা সদাশিব নামে পরিচিত। ইহারা পরমেশ্বরের কৃপাতে শুদ্ধ অধ্বার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। শুদ্ধ অধ্বাতে বিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব এই তিন তত্ত্বের আশ্রয়ে ভোক্তৃবর্গের সহিত আঠারোটি মুখ্য ভুবন আছে। প্রত্যেক ভুবনে ঐ ভুবনের অধীশ্বর আছেন। এই সকল আত্মার মধ্য হইতে কেহ কেহ তত্তৎ ভুবনের অধিষ্ঠাতার আরাধনাবশতঃ এবং কেহ কেহ দীক্ষার প্রভাবে ভুবনে স্থান লাভ করিয়াছেন। সূক্ষ্ম স্বায়ম্ভুব আগমে আছে—

"যো যত্রাভিলষেদ্ ভোগান্ স তত্রৈব নিয়োজিতঃ।
সিদ্ধিভাঙ্ মন্ত্রসামর্থ্যাৎ ॥"

এই বিষয়ে স্বচ্ছন্দতন্ত্রেও বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়।

এখন প্রলয়াকল এবং সকল পশু আত্মা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে। প্রলয়ের সময় ঈশ্বর সকল মায়িক কার্য উপসংহার করিয়া অবস্থান করেন, ইহা প্রসিদ্ধ। দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল আত্মা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে বিশ্রাম দান করাই প্রলয়ের উদ্দেশ্য। প্রলয়ের অপর উদ্দেশ্য কর্মের পরিপাক সম্পাদন এবং অসংখ্য কার্যপরম্পরার উৎপাদন বশতঃ ক্ষীণশক্তি মায়ার শক্তি বৃদ্ধি করা। যে সকল কলাদি ভোগসাধন দ্বারা আত্মা বিষয়ভোগে সমর্থ হয় সেগুলি প্রলয়কালে বিলীন হইয়া যায়। এইজন্য আত্মা কর্ম ও মল এই দুইটি পাশে বদ্ধ হইয়া মায়ার মধ্যে অবস্থান করে। এই সকল আত্মাকে 'প্রলয়াকল' অথবা 'প্রলয়কেবলী' জীব বলা হয়। যদিও তখন পর্যন্ত ইহাদের কর্মক্ষয় হইতে পারে নাই তথাপি ইহারা প্রলয়ের প্রভাবে কলাদিশূন্য হইয়া কৈবল্য অবস্থার ন্যায় কোন এক অবস্থাতে বিদ্যমান থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহাদের কর্ম ও মল সম্যক্ প্রকারে পরিপক্ব হয় তাহাদিগকে অধিকার প্রদান করিবার অবসর তখন থাকে না।[৬]

৬ কর্মপাক ও মলপাক বিষয়ে বহু তত্ত্ব আলোচনার যোগ্য। মলপাক প্রধানতঃ শ্রীভগবানের শক্তির সম্পর্কবশতঃ হইয়া থাকে। কর্মপাকও কতকটা ইহারই অনুরূপ। কর্মের নানা ভেদ আছে। যে কর্ম ক্রমশঃ পক্ব হওয়ার যোগ্য, উহার ক্ষয় জীবের দেহ-

যে সকল জীবের মল, কর্ম ও মায়া পরিপক্ব হইতে পারে না তাহারা প্রলয়-কালে নবীন সৃষ্টির প্রারম্ভের পূর্ব পর্যন্ত মুগ্ধবৎ অবস্থাতে বিশ্রাম করিতে থাকে। পরে যখন তাহারা ভোগযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন পরমেশ্বর 'অনন্ত' নামক বিদ্যেশ্বরের মধ্যে নিজ শক্তির সঞ্চার করিয়া তাহার দ্বারা মায়াতত্ত্বকে ক্ষোভিত করেন এবং অশুদ্ধ জগৎ রচনা করেন। এই সৃষ্টিতে ঐ সকল অপক্বপাশ জীব কলাদি যাবতীয় ভোগসাধন প্রাপ্ত হইয়া 'সকল' পশুরূপে আবির্ভূত হয়। ইহাদের মধ্যে তিনপ্রকারের পাশই বিদ্যমান থাকে।

এই স-কল পশু ব্যতীত আরও একপ্রকার 'স-কল' জীব আছে। ইহাদিগের মল ও কর্ম পরিপক্ব হইয়া গেলে ইহারা সৃষ্টির আরম্ভে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া উহার দ্বারা মায়ার গর্ভে স্থিত জগতের অধিকার প্রাপ্তির জন্য অপর-মন্ত্রেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনন্তের কৃপাতে আতিবাহিক দেহ গ্রহণ করিয়া 'স-কল' নামে পরিচিত হয়। এই বিশ্বব্যাপারের সম্পাদক মায়ার গর্ভে স্থিত অধিকারিমণ্ডল। আতিবাহিক দেহও যে মায়িকদেহ তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বপ্রথম মায়া হইতে ঊর্ধ্বে স্থিত শুদ্ধজগতে যেসকল অধিকারীর বিষয়ে চর্চা করা হইয়াছে তাহাদিগের দেহ বৈন্দব অর্থাৎ মহামায়ারূপ উপাদান হইতে গঠিত। কিন্তু পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্তির সময় যে বৈন্দবদেহ উৎপন্ন হয়, তাহা এই সকল আধিকারিকগণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এইজন্য ইহা বিদ্যমান থাকিলেও ইহার দ্বারা সকল পশুর অধিকার এবং শাসনকার্য সম্পাদন হইতে পারে না। এইজন্য এই বৈন্দবদেহের অধিকরণরূপে একটি মায়িকদেহ আবশ্যক হয়। এই মায়িকদেহ ও পূর্বোক্ত বৈন্দবদেহ অভিন্নরূপে প্রতীত হয়। বৈন্দবদেহ শুদ্ধ ও স্বচ্ছ বলিয়া বোধময় এবং মায়িকদেহ আতিবাহিক হইলেও বস্তুতঃ মোহময়। তথাপি এই বৈন্দবদেহের সম্বন্ধবশতঃ নিজের স্বাভাবিক মোহময়তা ত্যাগ করিয়া বোধময়রূপে ভাসমান হয়। মন্ত্রবর্গ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এতদ্ব্যতীত এমন জীবও আছে যাহাদের মল পরিপক্ব না হইলেও পাপক্ষয় ও পুণ্যের উৎকর্ষবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভুবনে আধিপত্য লাভের যোগ্য শরীরপ্রাপ্তি ঘটে। এই সকল ভুবন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত এবং অঙ্গুষ্ঠ হইতে কালানল পর্যন্ত বিস্তৃত।

এখন পশু আত্মার আলোচনার পরে পাশ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

সম্বন্ধ হওয়ার পর ভোগের দ্বারা ঘটিয়া থাকে। আর যে সকল কর্ম একসঙ্গে পক্ব হয়, উহাদের ক্ষয় শ্রীভগবানের অনুগ্রহবশতঃ ঘটিয়া থাকে। ঐগুলিকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে হয় না।

আত্মা পাশের সম্বন্ধবশতঃ পশুভাব প্রাপ্ত হয় এবং সংসার অবস্থা অনুভব করে। পাশ অচেতন বলিয়া চেতনের অধীন, পরিণামশীল এবং চৈতন্যের প্রতিবন্ধক। সাধারণতঃ মল, কর্ম ও মায়া এই তিনপ্রকার পাশের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে মলই প্রধান। শুদ্ধ আত্মচৈতন্যরূপা সম্বিৎশক্তি মলহীন বলিয়া স্বরূপের প্রকাশক। ইহা সর্বদা অভিন্নরূপ এবং পরিণামহীন। তন্ত্রমতে ঘটপটাদি বাহ্য ভেদ অসত্য নহে, কিন্তু সত্য। এই সকল বাহ্য পদার্থের সান্নিধ্যবশতঃ বৌদ্ধজ্ঞানে বিভিন্ন আকার উৎপন্ন হয় এবং ঐসকল আত্মার বোধে আরোপিত হয়। কিন্তু অর্থভেদের সান্নিধ্যবশতঃ বৌদ্ধজ্ঞানে ভেদ হইলেও ঐ জ্ঞানের আশ্রয়ভূত আত্মশক্তি অথবা গ্রাহকচৈতন্য সর্বদা একরূপেই ভাসমান হয়। উহা নিত্য ও নির্বিকার। এই আত্মসংবিৎকে পৌরুষজ্ঞান বলে। পৌরুষজ্ঞান হইতে বৌদ্ধজ্ঞানের পার্থক্য ভান না থাকিলেই জ্ঞানে নানাত্ব ভ্রমের আবির্ভাব ঘটে। ইহার মূল কারণ পশুত্বের হেতুভূত মল; অন্য কিছু নহে।

"সা তু সংবিদবিজ্ঞাতা তৈস্তৈর্ভাবৈর্বিবর্ত্ততে।
মলোপরুদ্ধদৃক্‌শক্তের্নরস্যেবোরুরাট্ পশোঃ॥"

মল নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত পশুত্ব দূর হইতে পারে না এবং শিবত্বও অভিব্যক্ত হইতে পারে না। শুধু জ্ঞানের দ্বারা মল নাশ হইতে পারে না। পূর্বে দীক্ষাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে দ্বৈতমতে মল দ্রব্যরূপ। তাই যেমন চক্ষুর ছানী চিকিৎসকের অস্ত্রোপচাররূপ ক্রিয়ার দ্বারা নিবৃত্ত হয় তদ্রূপ ঈশ্বরের দীক্ষাত্মক ব্যাপার দ্বারা মলনিবৃত্তি হইতে পারে। দ্বৈতদৃষ্টিতে মলনিবৃত্তির অন্য কোন উপায় নাই। স্বায়ম্ভুব আগমে আছে—"দীক্ষৈব মোচয়ত্যূর্ধ্বং শৈবং ধাম নয়ত্যপি"—দীক্ষাই মলনাশ করে ও আত্মাকে শিবলোকে লইয়া যায়। চিৎ ও অচিৎ-এর অবিবেক মল হইতে উদ্ভূত হয়। তাই মল নিবৃত্ত না হইলে পূর্ণ বিবেকের উদয় হইতে পারে না। এই অবিবেক হইতেই বিবর্ত বা অধ্যাস উৎপন্ন হয়।

মলই আণব পাশ। আত্মার নিত্য ও ব্যাপক চিৎশক্তি যদি আণব পাশ দ্বারা অবরুদ্ধ না হইত, তাহা হইলে সংসারাবস্থাতে ভোগনিষ্পত্তির জন্য কলাদি দ্বারা নিজের সামর্থ্য উত্তেজিত করার প্রয়োজন হইত না। মল এক হইলেও উহার শক্তি নানা। ঐ সকল শক্তির মধ্যে এক একটি শক্তি দ্বারা এক এক আত্মার চিৎক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়। এইজন্য মল এক হইলেও একজনের মলনিবৃত্তির সঙ্গে সকলের মলনিবৃত্তির প্রসঙ্গ এবং একজনের মোক্ষপ্রাপ্তির সঙ্গে সকলের মোক্ষলাভের আশংকা উঠে না। মলের এই সকল শক্তি আপন রোধ ও অপসারণ ব্যাপারে স্বাধীন নহে, এই সব ভগবৎশক্তির অধীন।

এইজন্য ভগবৎশক্তিও উপচারবশতঃ নানারূপে ব্যবহৃত হয়। মলের শক্তিসকল আপন আপন অধিকারের সময় চৈতন্যকে রুদ্ধ করিয়া থাকে। ঐ সময় ভগবৎশক্তি ঐ সকল শক্তির পরিণাম সম্পাদন করিয়া উহাদের নিগ্রহ-ব্যাপারকে অনুসরণ করিয়া থাকে। তখন উক্ত ভগবৎশক্তির নাম দেওয়া হয় রোধশক্তি। কিন্তু যখন ভগবৎশক্তি সর্বানুগ্রহশীল নিত্য উদ্যোগময় সদাশিবের ঈশান নামক মস্তক হইতে নির্গত হইয়া মোক্ষপ্রকাশিকা জ্ঞানপ্রভা দ্বারা অণুবর্গের হৃদয়কমলকে উন্মীলিত করে, তখন উহার নাম হয় অনুগ্রহশক্তি। যতক্ষণ মলের অধিকার সমাপ্ত না হয় ততক্ষণ মুক্তি হইতে পারে না। মলের এই অধিকারসমাপ্তি নিজের পরিণামসাপেক্ষ। যদিও মলের পরিণামপ্রাপ্তির যোগ্যতা আছে তথাপি উহা অচেতন বলিয়া সর্বদা সকলপ্রকারে চিৎশক্তির অধীন। উহা নিজে নিজে পরিণত হইতে পারে না। তাই বলা হয় যে পরমেশ্বরের শক্তির প্রভাবেই মল পরিণামপ্রাপ্ত হয়। ইহা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত।

কর্মপাশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার আবশ্যক নাই। ইহাকে ধর্মাধর্ম, কর্ম, অদৃষ্ট, বীজ প্রভৃতি নামে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কর্মসন্তান অনাদি এবং সূক্ষ্মদেহের ঊর্ধ্বে বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থান করে।

মায়াপাশ মায়াতত্ত্ব হইতে ভিন্ন জানিতে হইবে। সৃষ্টির আরম্ভকালে যখন মন্ত্রেশ্বর মায়াতত্ত্বকে ক্ষোভিত করেন তখন মায়া ক্ষুব্ধ হইয়া কলা, বিদ্যা প্রভৃতি তত্ত্বরূপে সাক্ষাৎভাবে এবং পরম্পরাক্রমে পরিণত হয়। কলা হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ত্রিশটি তত্ত্বের সমষ্টিই মায়ার স্বরূপ। পুর্যষ্টক, সূক্ষ্মদেহ প্রভৃতি একপ্রকারে মায়ারই নামান্তর বলা যায়।[৭] ইহা প্রত্যেক আত্মার পক্ষে পৃথক পৃথক্ এবং মোক্ষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ আত্মার ভোগসাধনরূপে কর্মানুসারে যাবতীয় অধোবর্তী ভুবনসমূহে পর্যটন করিতে থাকে। সুতরাং মায়াতত্ত্ব এবং মায়া নামক পাশ এক নহে।

কলাদিতত্ত্বের সমষ্টিরূপা মায়া সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দুইপ্রকার। সাধারণ মায়া অত্যন্ত বিস্তৃত এবং সমস্ত আত্মার ভোগ্যরূপা ভুবনাবলীর আধারভূত। ইহা বিন্দুর বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি নামক কলার মধ্যে নিশ্চলবৎ অবস্থান করে। বিদ্যাকলাতে মায়া, কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা

---

৭ সাংখ্য ও বেদান্তসম্মত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর হইতে এই সূক্ষ্মশরীর কোন কোন অংশে ভিন্ন। তন্ত্রোক্ত কলাদিতত্ত্বের স্থান সাংখ্য অথবা বেদান্তে না থাকার দরুণ সূক্ষ্মশরীরের লক্ষণে ভেদ দৃষ্ট হয়। পরন্তু ইহা অর্থাৎ এই শরীর জীবনের ভোগসাধন মধ্যে প্রধান। এই কথা সর্ববাদিসম্মত।

(অবিদ্যা), রাগ ও প্রকৃতি এই সাতটি ভুবনাধার আছে। ইহাদের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র ভুবন হইতে বামদেব নামক ভুবন পর্যন্ত সাতাশটি ভুবন অবস্থিত আছে। প্রতিষ্ঠাকলাতে ত্রিগুণ হইতে জল পর্যন্ত তেইশটি তত্ত্বময় ভুবনাধার আছে, যাহাতে শ্রীকণ্ঠভুবন হইতে অমরেশ ভুবন পর্যন্ত ছাপ্পান্নটি ভুবনের সন্নিবেশ রহিয়াছে। নিবৃত্তিকলাতে কেবল পৃথ্বীতত্ত্ব আছে—ইহা ভদ্রকালীপুর হইতে কালাগ্নিভুবন পর্যন্ত একশ-আট ভুবনের আধার। এই সাধারণ মায়ার বিশাল রাজ্যে প্রত্যেক আত্মার ভোগসাধনভূত সংকোচবিকাশশীল অসংখ্য সূক্ষ্মদেহময় তত্ত্বসমষ্টি চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে। এইগুলির নাম অসাধারণ মায়া বা পুর্যষ্টক। তত্তৎ ভুবন হইতে উৎপন্ন স্থূলদেহের সঙ্গে যখন এইসকল সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধ হয় তখন উহাদের মধ্যে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করিবার যোগ্যতা উৎপন্ন হয়।

মায়াতত্ত্ব নিত্য, বিভু ও এক। কিন্তু ইহাতে বিচিত্র শক্তি আছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ইহা ঈশ্বরশক্তি দ্বারা যুক্ত হইয়া কলা, কাল ও নিয়তি এই তত্ত্বগুলি উৎপাদন করে। ইহাদের মধ্যে কলাতত্ত্ব মলশক্তিকে কিঞ্চিৎ অভিভূত করিয়া আত্মার চৈতন্যশক্তিকে কিঞ্চিৎ উদ্বুদ্ধ করে। ইহার ফলে উহার দ্বারা আত্মস্বরূপ অনুবিদ্ধ হওয়ার দরুণ আত্মাতে নিজ ব্যাপারের জন্য অল্পমাত্রায় কর্তৃত্বভাবের বিকাশ হয়। যদিও মল আত্মাকে পরাভূত করে না, তথাপি উহার শক্তিরোধ অবশ্যই করে। শক্তিই করণ। তাই কলাতত্ত্ব আত্মশক্তির মলরূপ আবরণকে কিঞ্চিৎ অপসারণ করিয়া ও আত্মার কর্তৃত্বকে কিঞ্চিৎমাত্রাতে উদ্বুদ্ধ করিয়া আত্মাকে তাহার প্রাক্তন কর্মের ফলভোগ করিতে সাহায্য করে। বিষয় দ্বারা বুদ্ধিতত্ত্বের উপরঞ্জনই আত্মার ভোগ। ইহা একপ্রকার সংবেদন, যাহার স্বরূপ প্রবৃত্তির মধ্যে অভিন্নরূপে ভাসিত হয়।

অনন্ত নামক বিদ্যেশ্বরের দ্বারা মায়ার ক্ষোভ হইয়া থাকে, এ-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক আচার্যগণ মায়ার ক্ষোভে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না, তবে তাঁহার প্রয়োজকত্ব স্বীকার করেন। কারণ তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অনন্ত প্রভৃতির কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। কিরণাগমে লিখিত আছে—

'শুদ্ধেঽধ্বনি শিবঃ কর্তা প্রোক্তোঽনন্তোঽসিতে প্রভুঃ।'

মায়া যে এইপ্রকারে বিচিত্র ভুবনাদিরূপে এবং নানাপ্রকার দেহ ইন্দ্রিয়াদিরূপে অর্থাৎ কর্মফলভোগের সাধনরূপে পরিণত হয়, ইহা নানা বন্ধনযুক্ত 'স-কল' পশুর জন্যই হইয়া থাকে। এই সকল পশুতে, অনাত্মাতে আত্মাভিমানরূপ মায়াময় বন্ধন, সুখ, দুঃখ, মোহের হেতুভূত বিপর্যয় ও অশক্তি প্রভৃতি ভাব-প্রত্যয়াত্মক কর্মময় বন্ধন এবং পশুত্বপ্রাপ্তির মূল হেতু অনাদি আবরণময়

আণব বন্ধন থাকে। তন্ত্রমতে শরীরি ও অশরীরি আত্মার কর্তৃত্বে ভেদ আছে। এইজন্য পরমেশ্বরের নিজশক্তির দ্বারা ক্রিয়মাণ বিন্দু বা মহামায়ার ক্ষোভ এবং নিজশক্তির দ্বারা প্রেরিত 'অনন্তে'র দ্বারা ক্রিয়মাণ মায়ার বিক্ষোভ, এই দুইটি ব্যাপার সর্বথা একপ্রকার নহে। শিবের নিজশক্তি শুদ্ধা সংবিৎ অর্থাৎ বিশুদ্ধ নির্বিকল্পজ্ঞান। কিন্তু অনন্তের নিজশক্তি সবিকল্প জ্ঞান অর্থাৎ বিকল্প বিজ্ঞান।

শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলে কর্তৃত্ব হইতে পারে না, এমন কোন কথা নাই। কারণ, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে অশরীর আত্মারও নিজের দেহের স্পন্দনাদি বিষয়ে কর্তৃত্ব আছে। আত্মাতে মলপ্রভৃতির সম্বন্ধ থাকিলেই কর্তৃত্বপ্রকাশের জন্য শরীরাদির প্রয়োজন হয়। শিব মলহীন বলিয়া তাঁহার কর্তৃত্বে শরীরাদির অপেক্ষা থাকে না। মায়াধিষ্ঠাতা অনন্ত সর্বথা নির্মল নহে, কারণ তাঁহাতে অন্য মল না থাকিলেও অধিকারমল থাকে। তাঁহার শরীর বিন্দু বা মহামায়ার উপাদানে গঠিত, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অনন্ত প্রভৃতিতে সবিকল্প জ্ঞান কিপ্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা জানিবার বিষয়। তন্ত্রের মত এই—'ইহা ঘট' এইপ্রকার পরামর্শস্বরূপ শব্দোল্লেখ হইয়া আত্মাতে সবিকল্প জ্ঞান উৎপন্ন হয়—

সবিকল্পকবিজ্ঞানং চিতেঃ শব্দানুবেধতঃ।[৮]

অর্থাৎ চেতনে শব্দানুবেধ হইতেই সবিকল্প জ্ঞান জন্মে। এইজন্য অনন্তের বিকল্প-বিজ্ঞানেও শব্দোল্লেখ অবশ্য থাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কিপ্রকারে হইতে পারে? আমরা যে সময়ের আলোচনা করিতেছি তখন অশুদ্ধ জগতের উৎপত্তিই হয় নাই। কারণ, মায়া ক্ষুব্ধ হইলে পর ইহার পরিণামে অশুদ্ধ জগৎ উৎপন্ন হয়। এইজন্য তান্ত্রিকগণ স্থূলে আকাশকে এই শব্দের অভিব্যঞ্জকরূপে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর-কর্তৃক মহামায়া অথবা বিন্দুর ক্ষোভ হইলেই শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহামায়াই কুণ্ডলিনী বা পরব্যোমস্বরূপা। শব্দ ইহারই পরিণামস্বরূপ। পঞ্চভূতের মধ্যে আদিভূত আকাশ যেমন অবকাশদান ও স্থূলশব্দের অভিব্যঞ্জন দ্বারা চন্দ্রসূর্যাদি জ্যোতির্মণ্ডলে ভোগ ও অধিকার সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ

৮ চিন্তা অথবা thinking-এর সঙ্গে ভাষা অথবা language-এর সম্বন্ধ সকলেই স্বীকার করেন। শব্দোল্লেখ অতিক্রম না করিতে পারিলে চিন্তারাজ্য বা বিকল্পভূমি ভেদ করা যায় না। এইজন্য যোগী স্মৃতি-পরিশুদ্ধির অনুশীলন করিয়া থাকেন। বৌদ্ধগণও শব্দাত্মক জ্ঞানকে কল্পনা বলিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষ বলেন না।

বিন্দুনামক পরমাকাশও অবকাশদান ও শব্দব্যঞ্জনের দ্বারা শুদ্ধজগৎ নিবাসী শিবগণের অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্ব ও কর্তৃত্বসম্পন্ন বিদ্যেশ্বরগণের ভোগ ও অধিকারের কারণ হইয়া থাকে।

বিন্দু, পরা, পশ্যন্তী প্রভৃতি নিজ শব্দাত্মিকা বৃত্তির সম্বন্ধ দ্বারা 'এই ঘট লাল' এইপ্রকার পরামর্শরূপ বিকল্পের উল্লেখপূর্বক সবিকল্প জ্ঞান উৎপাদন করে। জাত্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট সবিকল্প জ্ঞান শব্দানুবিদ্ধ হইয়া উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষানুভব। ইহাকে পূর্বানুভূত বাসনাত্মক সংস্কার অথবা ভাবনারূপে গ্রহণ করিবার কোনই কারণ নাই। অধ্যবসায় বুদ্ধির কার্য। এইজন্য কেহ কেহ এই সবিকল্পক অনুভবকে বুদ্ধির কার্য বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু তান্ত্রিক দৃষ্টিতে অধ্যবসায় বুদ্ধির পরিণাম হইলেও বিকল্প জ্ঞানের উদ্ভব বিন্দুর কার্য শব্দের সহকারিতা হইতেই হইয়া থাকে। মায়ার ঊর্ধ্বে বুদ্ধির স্থান নাই, ইহা সত্য কথা। কিন্তু বিদ্যেশ্বর প্রভৃতি শুদ্ধ জগৎবাসীদের বিকল্পানুভব বুদ্ধিজনিত নহে; উহার একমাত্র নিমিত্ত বাক্-শক্তির প্রভাব। অনন্ত কিপ্রকারে বিকল্পজ্ঞানের দ্বারা মায়াকে বিক্ষুব্ধ করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন তাহা পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই সবিকল্প জ্ঞান হইতে অনন্তের কর্তৃত্বের উপপাদন অন্য প্রক্রিয়াতেও হইতে পারে। কিন্তু এইস্থলে উহার বিবরণ আবশ্যক মনে হইতেছে না।

বিন্দুর শব্দাত্মিকা বৃত্তি 'বৈখরী', 'মধ্যমা', 'পশ্যন্তী' ও 'পরা' ভেদে চারি প্রকার।[১] চিদণু অথবা জীবমাত্রের মধ্যে এই সকল বৃত্তি বিদ্যমান থাকে।

১ এই চারটি বৃত্তি পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইতেছে :—১। 'বৈখরী'—ইহা শ্রোত্রগ্রাহ্য অর্থবাচক স্থূল শব্দ। কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে আহত হইলে পর বায়ু বর্ণের আকার ধারণ করে। সাধারণতঃ এই শব্দ প্রাণের বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার উদ্ভব আকাশ এবং বায়ু মানা হইয়াছে। ২। 'মধ্যমা'—ইহা প্রাণবৃত্তির অতীত এবং শ্রোত্রের অবিষয়। ইহা অন্তঃসংজল্পরূপে অথবা চিন্তারূপে ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে। ইহারই নামান্তর পরামর্শজ্ঞান। ইহা শুদ্ধবুদ্ধির পরিণাম ও ক্রমবিশিষ্ট। ইহাই স্থূল শব্দের কারণ। ৩। 'পশ্যন্তী'—ইহার নামান্তর অক্ষরবিন্দু। ইহার সম্বন্ধে আগে কিছু বলা হইয়াছে। ইহা স্বয়ংপ্রকাশ, অবিভক্ত, বর্ণময় ও ক্রমহীন। ৪। 'পরা' অথবা 'সূক্ষ্মা'—কোন কোন স্থানে ইহাকে নাদও বলা হয়। ইহাই অভিধেয় বুদ্ধির বীজ। ইহার স্বরূপ জ্যোতির্ময় এবং প্রত্যেক পুরুষে ভিন্ন ভিন্ন। সুষুপ্ত অবস্থাতেও ইহা নিবৃত্ত হয় না। পরাবাক্ হইতে পুরুষ বা আত্মার স্বরূপ পৃথক্‌রূপে সাক্ষাৎ করিতে পারিলেই পুরুষের ভোগাধিকার নিবৃত্ত হয়। ইহা মুখ্য বিবেকজ্ঞান। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার উদয় না হয় ততক্ষণ শব্দানুবিদ্ধ জ্ঞানের অতীত বিশুদ্ধ নির্বিকল্প জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় নাই।

এইসকল বৃত্তির ভেদবশতঃ কাহারও জ্ঞান উৎকৃষ্ট, কাহারও মধ্যম এবং কাহারও নিকৃষ্ট মনে করা হয়। এই সকল বৃত্তি অতিক্রম করিতে পারিলে সাধক শিবত্ব লাভ করিতে পারে, তৎপূর্বে নহে।

দুই

শৈব অথবা শাক্ত অদ্বৈত সিদ্ধান্তের মধ্যে অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। এই পর্যন্ত আমরা যে দ্বৈতদৃষ্টির আলোচনা করিয়াছি উহা হইতে অদ্বৈত দৃষ্টির মতভেদ কোন কোন অংশে আছে, কিন্তু উহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক, সামান্যভাবে দুইচারিটি কথা প্রসঙ্গত বলিতেছি। এই মতানুসারে আত্মা চিৎ অর্থাৎ প্রকাশের স্বরূপ। উহার বিমর্শরূপা শক্তি উহা হইতে অভিন্ন। এই শক্তি বাক্‌রূপা।[১০] পরাবস্থায় ইহাকে 'পূর্ণাহন্তা' নামে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ইহার স্বরূপ প্রকাশময় মহামন্ত্রাত্মক, যাহার গর্ভে 'অ'কার হইতে 'হ'কার পর্যন্ত সমস্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে। পরাবাক্ পশ্যন্তী প্রভৃতি ক্রম ধরিয়া পর পর ভিন্ন ভিন্ন ভূমি সকল প্রকাশিত করিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে আত্মা নিজের শক্তির দ্বারাই মোহিত হইয়া নিজের পঞ্চকৃত্যকারী স্বরূপ বিস্মৃত হয়।[১১] ইহার মূলে আছে উহার স্বেচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্য। পুনর্বার যখন

সাংখ্যসম্মত সত্ত্বপুরুষ অন্যতা খ্যাতি বা বিবেকখ্যাতি হইতে তন্ত্রপ্রসিদ্ধ আত্মার স্বরূপস্থিতি হইতে পারে না। এইজন্য সাংখ্যোক্ত কৈবল্যকে আগমে কোনস্থানে মোক্ষরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে এই অবস্থায় আত্মার পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না এবং শিবত্বের অভিব্যক্তিও হয় না। এইপ্রকার কেবলী আত্মাতে পরাবাকের 'সম্বন্ধ' থাকিয়া যায়। দীক্ষার প্রভাবে মল নিবৃত্ত হইলে পর আত্মা ও পরাবাকের স্বরূপগত অবিবেক দূর হইয়া যায়।

১০ দ্বৈতমতে পরাবাক্ বিন্দুর বৃত্তিবিশেষের নাম। ইহাকে অতিক্রম করিলে মুক্তি হয়। বিন্দু শুদ্ধ হইলেও জড়। কিন্তু অদ্বৈতমতে পরাবাক্ পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রশক্তিরই নামান্তর এবং ইহা চিদ্‌রূপা। পূর্ণাবস্থাতে ইহা আত্মা এবং পরমেশ্বরের অভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকে।

১১ বস্তুতঃ মায়িক দশাতেও আত্মার পঞ্চকৃত্যকারিত্ব পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয় না। যে পুরুষ ভক্তিসহকারে নিজের পঞ্চকৃত্যকারিত্ব স্বভাব দৃঢ় ভাবনার সহিত সর্বদা পরিশীলন করিতে পারে, তাহার পরমেশ্বর ভাব অভিব্যক্ত হয়। সে জগৎকে নিজ স্বরূপের বিকাশ জানিয়া জীবন্মুক্ত পদে আরোহণ করিতে পারে। ঐ সময়ে সে সকল জাগতিক পদার্থকেই নিজ আত্মার সহিত অভিন্নরূপে বোধ করিতে থাকে। তখন তাহার সব বন্ধন কাটিয়া যায়।

স্বেচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ শক্তিপাতের প্রভাবেই উহার বল উন্মীলিত হয়, তখন উহা পূর্ণ সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বকর্তৃত্বাদিরূপ নিজ পারমেশ্বরী স্বভাবে সর্বদার জন্য স্থিতি লাভ করে।

আণব প্রভৃতি তিনপ্রকার মল বস্তুতঃ সংকুচিত জ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহার দ্বারা যে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞেয় পদার্থের ভান হয় উহা বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞান হইতে পৃথক্ কিছু নহে। 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্যন্ত বিস্তারশীল মাতৃকাচক্র বা বর্ণসমষ্টির দ্বারা যাবতীয় জ্ঞান অধিষ্ঠিত। বর্ণমালা হইতে সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি হয়। এইজন্য তন্ত্রে বর্ণকে বিশ্বজননী মাতৃকারূপে বর্ণনা করা হয়। এই সকল মাতৃকা যতক্ষণ জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হয় ততক্ষণ ইহারা বন্ধনের কারণ হয়। কিন্তু সম্যক্প্রকারে জ্ঞানের বিষয় হইলে ইহা হইতে পরাসিদ্ধি-লাভ ঘটিয়া থাকে। মলাত্মক জ্ঞানত্রয় নির্বিকল্প অথবা সবিকল্প, উভয় অবস্থাতে শব্দানুবিদ্ধ থাকে। মাতৃকাবর্গের প্রভাবে তত্তৎ জ্ঞান তত্তৎ শব্দের অনুবেধ দ্বারা হর্ষ, শোক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের আকার ধারণ করিয়া অষ্টবর্গ, নিবৃত্তি প্রভৃতি পঞ্চকলা এবং কলা প্রভৃতি ছয় অধ্বার অধিষ্ঠাত্রী ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তিরূপে ভাসমান হয়। অম্বিকা প্রভৃতি শক্তিমণ্ডলের প্রভাবও ইহাদের উপর পতিত হয়। মাতৃকাগণের অধিষ্ঠানবশতঃই জ্ঞানে অর্থাৎ পূর্ণাহন্তাতে অভেদানুসন্ধান লুপ্ত হইয়া যায় এবং জ্ঞানসমূহ প্রতিক্ষণে বহির্মুখ হইয়া বন্ধন উৎপন্ন করে। অম্বা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও বামা এই চারিটি শক্তি যাবতীয় শক্তির মূল কারণ। অকারাদি মাতৃকাকে কলা, দেবী, রশ্মি নামে অভিহিত করা হয়। এইগুলি স্থূলবর্ণরূপে এবং পদ, বাক্য প্রভৃতির যোজনা হইতে নানাপ্রকার লৌকিক এবং অলৌকিক শব্দরূপে পরিণত হয়। এই সকল কলার প্রভাবে পশুদিগের জ্ঞান শব্দানুবিদ্ধ হয় বলিয়া বলা হয় যে পশু কলাবর্গের অধীন অথবা ভোগ্য। ইহাদিগের প্রভাবে যে জ্ঞানাভাস অথবা আণব, মায়ীয় ও কার্মমল উৎপন্ন হয়, উহা দ্বারা পশু আত্মার নিজ বিভব অথবা ঐশ্বর্য লুপ্ত হইয়া যায়। "আমি কৃশ", "আমি স্থূল", এইপ্রকার জ্ঞানাভাসকে মায়ামল বলে। এইরূপ "আমি যজ্ঞাদি কর্মের কর্তা", এইপ্রকার জ্ঞানাভাসকে কার্মমল বলা হয়।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন : যখন অনাবৃত প্রকাশই জগতের স্বভাব, তখন বন্ধনের আবির্ভাব কোথা হইতে হয়? অদ্বৈতমতে চিৎপ্রকাশ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। এই প্রশ্নের সমাধানপ্রসঙ্গে আচার্যগণ বলেন যে পরমেশ্বর নিজ স্বাতন্ত্র্যশক্তির দ্বারা সর্বপ্রথম নিজ স্বরূপের আচ্ছাদনকারিণী মহামায়াশক্তিকে অভিব্যক্ত করেন। উহার প্রভাবে আকাশবৎ স্বচ্ছ আত্মাতে সংকোচের আবির্ভাব হয়। এই সংকোচ অনাশ্রিত বা শিবতত্ত্ব হইতে মায়াপ্রমাতা পর্যন্ত সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। পরমেশ্বরের

স্বাতন্ত্র্যের হানিই সঙ্কোচের স্বরূপ। বাস্তবিকপক্ষে ইহা অভিন্ন পরমেশ্বর-ভাবের অস্ফুরণমাত্র। ইহারই নাম অপূর্ণম্মন্যতা অথবা আণব মল। ইহারই নামান্তর অজ্ঞান। এই প্রসঙ্গে পৌরুষ অজ্ঞান ও বৌদ্ধ অজ্ঞানের ভেদ আলোচনা করা আবশ্যক। অদ্বৈত আগম মতে ইহার নাম 'অখ্যাতি'; যাহা আত্মাতে অনাত্মভাবের অভিমানমাত্র। এই অজ্ঞানাত্মক জ্ঞান যে বন্ধন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অনাত্মাতে আত্মাভিমানরূপ অজ্ঞানমূলক জ্ঞানও বন্ধন। এইজন্য আণবমল দুইপ্রকার বলা হয়—

১। চিদাত্মাতে স্বাতন্ত্র্যের অপ্রকাশ অর্থাৎ অপূর্ণম্মন্যতা। এই মল বিজ্ঞানাকল পশুতে থাকে।

২। স্বাতন্ত্র্যসত্ত্বেও দেহাদি অনাত্মাতে অবোধাত্মক আত্মাভিমান।

বিশ্বের কারণ মায়া, ইহারই নামান্তর যোনি। উহা হইতে কলাদি পৃথিবী পর্যন্ত তত্ত্বসমূহ আবির্ভূত হয়। এই সকল তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন ভুবন, দেহ, ইন্দ্রিয়াদি রচিত হয়। এইগুলিকে মায়ামল বলে। ইহাকে আশ্রয় করিয়া যে শুভাশুভ কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই কার্মমল। কলাদি তত্ত্ব আণবমলের ভিত্তিতে সংলগ্ন হইয়াই পুরুষকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। এইজন্য এইগুলি মলপদবাচ্য।

তিনটি মল এবং কলাসমূহের অধিষ্ঠাত্রী মাতৃকাশক্তি। ইহাতে অভেদ জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী অঘোরা শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে ভিতরে বাহিরে আত্মভাবের স্ফূর্তি হইয়া থাকে; এবং ভেদজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী ঘোরা শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে বহির্মুখভাব এবং স্বরূপের আবরণ ঘটিয়া থাকে।

পরাবাক্ প্রসরণের পর, প্রথমতঃ ইচ্ছারূপে, তাহার পর মাতৃকারূপে পরিণতি লাভ করে। এই সকল মাতৃকাই বর্ণমালা। স্বরবর্ণে বীজ অথবা শিবাংশ এবং ব্যঞ্জনবর্ণে যোনি অথবা শক্ত্যংশ প্রবল থাকে। এই সকল বর্ণ তত্ত্বৎ প্রমাতাতে সবিকল্প এবং নির্বিকল্প উভয় অবস্থাতেই আন্তর পরামর্শ দ্বারা স্থূল এবং সূক্ষ্ম শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকে। এইপ্রকার বর্ণাদি দেবতাগণের অধিষ্ঠানবশতঃ রাগ, দ্বেষ, দুঃখ, সুখ, ভয় প্রভৃতি স্ফূর্ত হয়। তখন সংকোচহীন স্বতন্ত্র চিদ্ঘন আত্মার স্বরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পরিচ্ছিন্ন হয় এবং পরতন্ত্র দেহাদিময় ভাবের আবির্ভাব হয়। এই সকল মহাঘোরা পশুমাতৃকা শক্তি ভেদজ্ঞান উৎপাদন করে এবং ব্রহ্মগ্রন্থিকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। এইগুলি পশুদিগের অধঃপতনের মূল কারণ। তত্ত্বলাভ করার পরেও যতদিন সাধক সঠিক সম্যক্‌রূপে প্রমাদহীন না হয় ততদিন

এই সকল শক্তির দ্বারা শব্দানুবেধের মাধ্যমে মোহগর্তে পতিত হইবার আশংকা থাকিয়া যায়।[১২]

তিন

প্রকাশ ও বিমর্শ সম্বন্ধে দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলা হইতেছে। সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারের মূলে প্রকাশ ও বিমর্শ উভয়ের সত্তাই বিদ্যমান থাকে ইহা সকলে জানেন। স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষবশতঃ পরাশক্তি যখন অন্তর্লীন অবস্থা ত্যাগ করিয়া অভিব্যক্ত হয় তখনই বিশ্বরূপ চক্রের আবর্তন হইতে থাকে। বস্তুতঃ শক্তি অথবা বিমর্শেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; প্রকাশে উহার উপচারমাত্র হয়। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে তত্ত্বমাত্রই শক্তির স্বাতন্ত্র্য-উল্লাসের একটি অবস্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্য শিবতত্ত্বকেও তত্ত্ব বলিয়া শক্তিশ্রেণীতে গণনা করা হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে প্রকাশ-বিমর্শ একহিসাবে পরম বিমর্শেরই উপভেদমাত্র। এইজন্য তত্ত্বের বিচারপ্রসঙ্গে প্রকাশ ও বিমর্শ উভয়েই বিমর্শাত্মক বা শক্ত্যাত্মক বলিয়া উভয়ের মধ্যে অংশ কল্পনা করা হইয়া থাকে।

বামকেশ্বর তন্ত্রমতে প্রকাশের চারিটি অংশ আছে এবং উহার সহিত অবিনাভূত বিমর্শেরও চারিটি অংশ আছে। প্রকাশের চারিটি অংশের নাম— অম্বিকা, বামা, জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী। বিমর্শের চারিটি অংশের নাম—শান্তা, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। অম্বিকা ও শান্তার সামরস্য অবস্থাতে শান্তাভাবাপন্নাপরাশক্তি পরাবাক্ নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই অবস্থাটি আত্মস্ফুরণের অবস্থা।

> "আত্মনঃ স্ফুরণং পশ্যেৎ যদা সা পরমা কলা।
> অম্বিকারূপমাপন্না পরাবাক্ সমুদীরিতা॥"[১৩]

এই আত্মস্ফুরণের অবস্থাতে সমগ্র বিশ্ব বীজরূপে অর্থাৎ অস্ফুটরূপে আত্মসত্তাতে বিদ্যমান থাকে। ইহার পর শান্তা হইতে ইচ্ছার উদয় হইলে উহা অব্যক্ত বিশ্বশক্তির গর্ভ হইতে নির্গত হয়। ইচ্ছাশক্তি তখন বামাশক্তির সহিত তাদাত্ম্য

১২ "জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥"

অর্থাৎ দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদিগের চিত্তকেও বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহমধ্যে ফেলিয়া দেন।

১৩ যে সময় পরাশক্তি নিজের স্ফুরণ নিজেই দেখেন সেই সময় তিনি অম্বিকারূপ প্রাপ্ত হইয়া পরাবাক্‌রূপে বর্ণিত হন।

লাভ করেন ও পশ্যন্তীবাক্ নামে পরিচিত হন। ইহার পর জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব ঘটে। জ্ঞানশক্তি জ্যেষ্ঠার সঙ্গে অভিন্ন। ইহার নামান্তর মধ্যমা বাক্। এই শক্তি সৃষ্ট বিশ্বের স্থিতির কারণ। জ্ঞানের পর ক্রিয়াশক্তি রৌদ্রীর সঙ্গে এক হইয়া 'বৈখরী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। প্রপঞ্চাত্মক বাগ্‌বৈচিত্র্য বৈখরীরই স্বরূপ।

এই চারিপ্রকার বাক্ পরস্পর মিলিত হইয়া মূল ত্রিকোণ অথবা মহাযোনিরূপে পরিণত হয়। শান্তা ও অম্বিকার সামরস্যরূপা পরাবাক্‌ই এই ত্রিকোণের মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্র। ইহা নিত্য স্পন্দময়। পশ্যন্তী ইহার বামরেখা, বৈখরী দক্ষিণরেখা ও মধ্যমা সরল অগ্ররেখা। মধ্যস্থ মহাবিন্দুই অভিন্ন শিব-শক্তির আসন। এই ত্রিকোণমণ্ডল চিৎকলার প্রভাবে সমুজ্জ্বল। ইহার বাহিরে ক্রমবিন্যস্তরূপে শান্ত্যতীত, শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি এই পাঁচকলার আভাময় স্তর বিদ্যমান আছে। এই সকল স্তরের সমষ্টিই জগতের রূপ। অতএব ভূপুর হইতে মহাবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র বিশ্বচক্রই ঐ মহাশক্তির বিকাশ।[১৪]

মধ্য ত্রিকোণ বিন্দু-বিসর্গময়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রত্যেকটি রেখাই পঞ্চস্বরময়। পঞ্চদশ স্বরাত্মক এই ত্রিকোণমণ্ডলের বিন্দুস্থান বিসর্গ ('অঃ') কলা দ্বারা আক্রান্ত। এই ত্রিকোণের স্পন্দন হইতে অষ্টকোণ কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা রৌদ্রীশক্তির রূপ ও শান্ত্যতীত কলার দ্বারা উজ্জ্বল। ইহার প্রত্যেক স্তরই প্রকাশ ও বিমর্শময় অর্থাৎ শব্দও অর্থময়। তৎতৎ বর্ণ (বাচক) ও তৎতৎ তত্ত্বের (বাচ্য) তাদাত্ম্য তৎতৎ চক্রাংশে প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। সমস্ত চক্রে 'অকার' হইতে 'ক্ষকার' পর্যন্ত বর্ণমালা এবং শিব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত তত্ত্বসমূহ অভিব্যক্ত হয়। সাধক যখন কুন্ডলিনী জাগরণের পরে উত্তরোত্তর উপরের দিকে উত্থান করে অথবা ইষ্ট দেবতার স্বরূপভূত চক্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, তখন বস্তুতঃ এই বিশ্বচক্রের মধ্যেই তাহার যাত্রা চলিতে থাকে। অকুল হইতে মহাবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত মহামার্গের মধ্যে যেসকল অবান্তর চক্র আছে তাহাদের সমষ্টিই বিশ্বচক্র। ইহাতে অকুল

---

১৪ তান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেবতামাত্রের যান্ত্রিক রূপ বাসনাভেদে জগতেরই রূপ। প্রত্যেক যন্ত্রে সর্বাপেক্ষা বাহিরে যে চতুষ্কোণ অঙ্কিত হয় তাহার নাম ভূপুর। উহাই বিশ্বনগরের প্রাকারস্বরূপ। পূর্বাদি কোন মার্গ অবলম্বন করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে হয়। পরে ক্রমশঃ ভিতরের দিকে অগ্রসর হওয়াই সাধন মার্গের উৎকর্ষ। এই সকল যন্ত্রে সর্বত্রই মধ্য অর্থাৎ কেন্দ্রে যে বিন্দু থাকে, উহাই অন্তিম ভূমির সূচক। এই ভূমিতে সর্বশক্তিসমন্বিত পরমেশ্বরের অপরোক্ষ অনুভব অথবা সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে।

হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত অংশ 'স-কল'; আজ্ঞাচক্র হইতে ঊর্ধ্বে বিন্দু হইতে উন্মনা পর্যন্ত অংশ 'স-কল-নিষ্কল' এবং উন্মনার পর মহাবিন্দু অংশ 'নিষ্কল'।[১৫] বস্তুতস্তু এই মহাবিন্দুই বিশ্বের হৃদয়—ইহাই বিশ্বাতীত পরমেশ্বর অথবা শিবশক্তির আবির্ভাবস্থান বা আসন।

বস্তুতঃ মহাবিন্দু সদাশিব, যাহার উপর চিৎকলা অথবা চিৎশক্তি স্বাতন্ত্র্যময়রূপে খেলা করেন। এই খেলা পরাবাক্ বা পরামাত্রার বিলাস। শুক্ল ও রক্তবিন্দুরূপে প্রকাশ-বিমর্শময় কামকলাক্ষরের পরস্পর সংঘট্টবশতঃ চিৎকলার

---

১৫ যোগমার্গের সকলাংশে সর্বপ্রথম অকুল বা বিষুবৎ স্থান আছে। ইহার অষ্টদলের পরে ষড়্দলবিশিষ্ট কুলপদ্ম অবস্থিত। ইহার পরবর্তী সমস্ত পথই কুলমার্গ নামে প্রসিদ্ধ। ষড়্দল কমলের উপর মূলাধার ও তাহার উপর শক্তি বা হৃল্লেখার স্থান। ইহা অনঙ্গাদি দেবতাবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও আধারকমল হইতে ২১ আঙ্গুল উপরে নীলবর্ণ কর্ণিকামধ্যে প্রতিষ্ঠিত। হৃল্লেখা হইতে দুই আঙ্গুল উপরে স্বাধিষ্ঠানকমলের স্থান। ইহার পর ক্রমশঃ মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, লম্বিকাগ্র (অষ্টদল কমল) ও অন্তে আজ্ঞাচক্র। অগ্নি সূর্য ও চন্দ্রের বিম্বও এই সকল মার্গে দৃষ্টিগোচর হয়। মূলাধারে অগ্নিবিম্ব, অনাহতে সূর্যবিম্ব ও বিশুদ্ধে চন্দ্রবিম্বের দর্শন হয়। আজ্ঞাচক্রের উপরে বিন্দু হইতে উন্মনা পর্যন্ত ভূমির নাম এই—বিন্দু, অর্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিকা বা ব্যাপিনী, সমনা ও উন্মনা। এই পর্যন্ত যে মার্গ তাহা স-কল-নিষ্কল। বিন্দুভেদ করার পরেই অর্ধচন্দ্রাদি কলা ক্রমশঃ উপলব্ধিগোচর হয়। উন্মনা পর্যন্ত পৌঁছিবার পর কালের কলা, তত্ত্ব, দেবতা ও মন সর্বথা নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাকেই তন্ত্রশাস্ত্রে নির্বাণাত্মক রুদ্রবক্ত্র নামে বর্ণনা করা হয়। এই অন্তিম ভূমি সর্বথা নিরাকার, উচ্চারহীন, শূন্যময় ও বিশ্বাতীত। ইহার পর মহাবিন্দুই নিষ্কল ভূমির স্বরূপ। ইহার দ্বিতীয় নাম সাদাখ্য অথবা সদাশিবরূপী আসন। ইহারই উপর তত্ত্বাতীত শিব ও শক্তির লীলা হইয়া থাকে। এই সকল যোগমার্গ চক্রবেধক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। উপাসনার ক্রম হইতেও ইহার ভেদ প্রদর্শিত হইতে পারে। শ্রীচক্রে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ তত্ত্বাতীত অবস্থার দিকে যাত্রার মার্গে তিনটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়—(১) চতুষ্কোণ হইতে ত্রিকোণ চক্র, (২) বিন্দু হইতে উন্মনা পর্যন্ত এবং (৩) মহাবিন্দু। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ পূর্বোক্ত স-কল-নিষ্কল ও নিষ্কলমার্গ হইতে সর্বথা অভিন্ন ও প্রথম বিভাগ পূর্বোক্ত স-কল মার্গেরই নামান্তর। কিন্তু উভয়ে বাসনাভেদবশতঃ উহাদের স্থান ও উপাধির মধ্যে ভেদ দেখা যায়। অতএব ভূপুর, ষোড়শদল, অষ্টদল, চতুর্দশকোণ, বাহ্য দশকোণ, অষ্টকোণ, ও ত্রিকোণ এই অংশ সুষুম্না মার্গে নিম্নতম অকুল হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত অবস্থিত। ইহার পর বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভিন্ন বাসনা না থাকার দরুণ অগ্রবর্তী ভূমিতে কোন ভেদ প্রতীত হয় না।

অভিব্যক্তি হয়।[১৬] মহাবিন্দুর স্পন্দন হইতে তিনটি বিলীন বিন্দু পৃথক্ পৃথক্ হইয়া রেখারূপে পরিণত হইয়া মহাত্রিকোণের আকার ধারণ করে। ইহা হইতেই শিব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বের আবির্ভাব হয়।

এই মহাত্রিকোণে চারিটি পীঠ আছে। প্রত্যেক পীঠেই বিশ্বের রূপ ভাসমান হয়। স্বরূপে উহার ভান হয় বীজরূপে, বাহিরে হয় সৃষ্টিরূপে। পীঠশব্দ প্রকাশ ও বিমর্শের মাত্রাসকলের সাম্যাবস্থা দ্যোতন করে। যেমন অম্বিকা ও শান্তাশক্তির সামরস্যের নাম কামরূপ পীঠ, তদ্রূপ অন্যান্য পীঠও জানিতে হইবে। কামরূপ পীঠ পীতবর্ণ চতুষ্কোণ আকারে আধারস্থানে দৃষ্ট হয়। ইহার নামান্তর মন। যখন ইহাতে বিন্দু-চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয় তখন ইহাকে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বলে। বস্তুতঃ এই পীঠ মহাত্রিকোণের অগ্নিকোণস্বরূপ। এইপ্রকার ত্রিকোণের অন্য দুইকোণ পূর্ণগিরি ও জালন্ধর পীঠ নামে প্রসিদ্ধ। ঐস্থানে প্রতিফলিত চৈতন্য ইতরলিঙ্গ ও বাণলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। এই দুইটি বুদ্ধি ও অহংকারের নামান্তর। দেহমধ্যে ইহাদের নাম হৃদয় ও ভ্রূমধ্য। মধ্যবিন্দুকে উড্ডীয়ান বা শ্রীপীঠ বলে। ইহা চিত্তস্বরূপ। ইহাতে প্রতিবিম্বিত জ্যোতিকে পরলিঙ্গ বলে। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটি লিঙ্গ নির্দিষ্টসংখ্যক বর্ণ দ্বারা বেষ্টিত থাকে। কিন্তু পরলিঙ্গ সর্ববর্ণ দ্বারাই বেষ্টিত। এই পরলিঙ্গই পরমপদ হইতে প্রথম স্পন্দরূপে উদিত হয়।

শিবশক্তি-যামলের অহংপরামর্শ পূর্ণ ও স্বাভাবিক—এইজন্য ইহাকে পূর্ণাহন্তা বলে। ইহা নির্বিকল্পক জ্ঞানস্বরূপ। স্বাতন্ত্র্যবশতঃ ইহাতে বিভাগের আবির্ভাব হয়। পূর্ণাহন্তা বা পরাবাক্ বিভাগদশাতেও পশ্যন্ত্যাদি

---

১৬ তত্ত্বাতীত অবস্থাতে শিব ও শক্তির সামরস্য বিদ্যমান থাকে। তখন বিশ্ব শক্তিগর্ভে অন্তঃসংহৃতভাবে অর্থাৎ শক্তির সঙ্গে অভিন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন পরাশক্তি স্বেচ্ছাবশতঃ নিজের স্ফুরণ নিজেই দেখেন তখনই বিশ্বের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাতে দৃষ্টিই সৃষ্টি। অনুত্তর দশাতে স্বরূপে অভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকিলেও বিশ্ব দৃষ্ট হয় না। এইজন্য ঐ অবস্থা সৃষ্টি ব্যাপার নহে। এই দৃষ্টি বা সৃষ্টি ব্যাপারে শিব থাকেন তটস্থ। তাঁহার স্বরূপভূতা স্বাতন্ত্র্যশক্তিই সব কার্য করিয়া থাকেন। শিব অগ্নিস্বরূপ, সম্বর্তানল বা প্রলয়ানল স্বরূপ। শক্তি সোমস্বরূপ, বিবর্ত চন্দ্রস্বরূপ। উভয়ের সাম্যই তান্ত্রিক ভাষাতে 'বিন্দু' নামে অভিহিত হয়। এই বিন্দুরই দ্বিতীয় নাম 'রবি' অথবা 'কাম'। ইহার ক্ষোভ বা সাম্যভঙ্গ হইলে পর সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। সাম্যাবস্থাতে অগ্নি ও চন্দ্ররূপী রক্ত ও শুক্রবিন্দু ('অ'-'হ') সূর্যরূপে অভিন্ন থাকে—ক্ষুব্ধ হইলে পর চিৎকলার আবির্ভাব হয়। অগ্নির তাপে যেমন ঘৃত বিগলিত হইয়া বহিতে থাকে তদ্রূপ প্রকাশস্বরূপ অগ্নির সম্পর্কে বিমর্শরূপা শক্তির স্রাব হয়। এই প্রকারে শ্বেত ও রক্তবিন্দুর মধ্য হইতে চিৎকলার নিঃসরণ হয়। চৈতন্যের অভিব্যক্তির ইহাই রহস্য।

তিনরূপ ধারণ করে। ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর ভেদে তিন তিন অবস্থা আছে। পরমতত্ত্ব নিরংশ প্রকাশস্বরূপ হইলেও উহার মুখ্য তিন-শক্তির ভেদবশতঃ এইপ্রকার বিভাগ হইয়া থাকে। মুখ্য তিনশক্তি এইপ্রকার—

(১) পরা বা অনুত্তরা—ইহার নাম চিৎশক্তি।

(২) পরাপরা—ইহার নাম ইচ্ছাশক্তি।

(৩) অপরা—ইহার নাম উন্মেষরূপা জ্ঞানশক্তি।

এই তিনটির অভিন্নস্বরূপই পরমেশ্বরের পূর্ণশক্তি। ইহার মধ্যে অনুত্তর অথবা চিৎ = 'অ'; ইচ্ছা = 'ই'; এবং উন্মেষ অথবা জ্ঞান = 'উ'। এই তিনটি শক্তিই 'অ', 'ই', 'উ' নামক ত্রিকোণ। ক্ষোভবশতঃ শক্তিবর্গের সংখ্যা হয় ছয়। 'অ' ক্ষুব্ধ হইলে হয় 'আ', 'ই' ক্ষুব্ধ হইলে হয় 'ঈ', 'উ' ক্ষুব্ধ হইলে হয় 'ঊ'। 'আ' আনন্দের, 'ঈ' ঈশনের ও 'ঊ' ঊণত্বের বাচক। আনন্দাদি শক্তিনিচয় ক্ষুব্ধ হইলেও নিজস্বরূপ হইতে স্খলিত হয় না। তাই ইহারা মলিন হয় না। এইজন্য এইসকল শক্তি পরস্পর সংঘট্ট বশতঃ অন্যান্য শক্তিকে প্রকট করিতে পারে। এই ছয়টি স্বরই বর্ণসন্ততির মূল। ইহাদিগকে ষড়্দেবতা বলে—কোন কোন স্থানে সূর্যের মুখ্য ষড়্রশ্মিও বলে। এই ছয়শক্তির পরস্পর সংঘট্টকে ক্রিয়াশক্তি বলে, যাহা হইতে দ্বাদশ শক্তির বিকাশ ঘটে। ঋ ঋৃ ৯ ঃ এই চারিটি নপুংসক। ইহাদের মধ্যে সৃষ্টির কারণতা নাই। সম্পূর্ণ শক্তিপুঞ্জ উক্ত দ্বাদশ শক্তিরই অন্তর্গত। ইহাই প্রধান শক্তিচক্র, যাহার সহিত অধিষ্ঠাতৃরূপে সম্বন্ধ থাকার দরুণ শিবকে পূর্ণশক্তি বলা হয়।[১৭] এই শক্তিগুলি সবই প্রক্ষীণমল শুদ্ধ ও উদ্রিক্ত চৈতন্য। ইঁহাদের জ্ঞানক্রিয়াত্মক সামর্থ্যে কোনপ্রকার আবরণ নাই। চৌষট্টি যোগিনী এই দ্বাদশশক্তি হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহাদের সমষ্টি অঘোরা শক্তি। ঘোরা ও ঘোরতরা শক্তি ইহা হইতেই আবির্ভূত হয়। সৃষ্ট্যাদিক্রমে এই দ্বাদশশক্তির পৃথক্ পৃথক্ রূপ আছে। অনাখ্যাক্রমেও ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। যে ক্রমে সৃষ্টি প্রভৃতি উপাধি নাই তাহার নাম অনাখ্যা। ইহার তাৎপর্য এই যে নিরুপাধিক স্বরূপ-সৃষ্টিতেও এই বিভাগ বিদ্যমান আছে।

এই যে স্বরূপগত উপাধিহীনতার কথা বলা হইল ইহা দুইপ্রকারে সম্ভব ঃ (১) উপাধিবর্গের অনুল্লাসবশতঃ এবং (২) উপাধির উপশমবশতঃ। উপাধির উপশম পাক হইতেই হইয়া থাকে। তান্ত্রিক আচার্যগণ মধুরপাক ও হঠপাক ভেদে দুইপ্রকার পাক স্বীকার করেন। যাঁহারা গুরু প্রভৃতির আরাধনা

১৭ এই বারোটিকে কোন কোন স্থানে কালিকা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "শ্রীসার" শাস্ত্রে ইহাদের নাম দ্বাদশ যোগিনী।

করিয়া সময়ী ও পুত্রকাদি দীক্ষা সম্পাদন করার পর নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মে নিষ্ঠা রাখেন, তাঁহারা দেহান্তে সৃষ্ট্যাদি উপাধি হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এইসকল উপাধির প্রশমন স্বভাবতঃ হয় না। তাহার জন্য শাস্ত্রীয় উপদেশাদি আবশ্যক হয়। এই উপায়ে ধীরে ধীরে দেহপাতের পর উপাধিনাশে সমর্থ হন। পরমেশ্বরের শক্তিপাত তীব্র না হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাঁহাদের উপর ভগবৎকৃপার মাত্রা অধিক পতিত হয় তাঁহারা কেবল একবার উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই উপাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই ক্রমে সৃষ্টি প্রভৃতি তিনটি উপাধিই চিদগ্নিতে সর্বদা ভস্ম হইয়া যায়। অর্থাৎ এইসব লোক অচিদ্‌ভাব ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তির স্ফুরণরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। ইহার ক্রম এই: জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনের পর এইপ্রকার পাক হইতে সৃষ্ট্যাদি পদার্থগত ভেদ কাটিয়া যায়। ঐ সময়ে বিশ্ব অমৃতময় হয় অর্থাৎ বোধের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। এই অমৃতরূপ বিশ্বকে পূর্ববর্ণিত (অ, আ, প্রভৃতি) দ্বাদশশক্তি বা করণেশ্বরী ভোগ করে, অর্থাৎ তাহারা পরবোধ বা পরমেশ্বরের সঙ্গে অভিন্নরূপে পরামর্শন করে। কারণ, এই সকল শক্তি অঘোরাশক্তির প্রকাশরূপা। এই ভোগের ফলে ঐ সকল শক্তি (করণেশ্বরী) বা দেবী তৃপ্তি-লাভ করেন। তখন ইহাদের মধ্যে অন্যের প্রতি অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না। তখন উহারা হৃদয়স্থ দ্যোতনমাত্রস্বরূপ পরপ্রকাশ বা পরমতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে স্ফুরিত হইতে থাকে। এইসকল শক্তি পরমেশ্বরের স্বরূপে বিদ্যমান ও তাঁহার সহিত অভিন্ন। কিন্তু এইপ্রকার অভেদ সত্ত্বেও কৃত্য, ক্রিয়াবেশ, নাম ও উপাসনাভেদে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভাসিত হয়। এইসকল শক্তির সংকোচ ও প্রকাশ উভয়ই হয়। এইজন্য ইহারা সংখ্যাতে দ্বাদশ হইলেও একদিকে যেমন সকলে মিলিয়া এক হইতে পারে, তেমনি অন্য দিকে কোটি কোটি ভিন্নরূপেও আবির্ভূত হইতে পারে।

চার

স্বরূপদৃষ্টিতে আত্মা সর্বভাবের অতীত বলিয়া ইহা সর্বভাবের মধ্যে সর্বাত্মক হইয়াও সর্বদা সর্বত্র নিজ-স্বভাবে স্বয়ংরূপে অবস্থিত। তাই ইহা নির্বিকার, দ্বন্দ্বাতীত, নির্দোষ ও সমরস। কিন্তু ব্যবহারভূমিতে ও প্রতিভাস ক্ষেত্রে ইহার অবস্থাগত ভেদ লক্ষিত হয়। এই সকল অবস্থা বা দশার অবান্তর বিভাগ অসংখ্য, কিন্তু ইহাদের মুখ্য বিভাগ জাগ্রৎ-আদিভেদে পাঁচ প্রকার বলিয়াই সর্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে। এই পাঁচটি অবস্থার মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন

ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা সকলেরই সুপরিচিত। অন্য দুইটিকে জ্ঞানের উদয় ও পরিণতি না হওয়া পর্যন্ত কেহই স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে কোন অবস্থাই বিশুদ্ধ আত্মার নহে, কিন্তু দেহাদি-সংসৃষ্ট আত্মার, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই পরিদৃষ্ট অবস্থাসকল কি প্রকারে উদিত হয়? সাধারণ দৃষ্টিতে অতি স্থূলভাবে এই ভেদের উপপাদন প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-গত বৈশিষ্ট্য হইতেই এই সকল দশার উদয় হইয়া থাকে। আত্মা বলিতে এখানে দেহ-বিশিষ্ট জীবাত্মার কথাই বুঝিতে হইবে, বিদেহী কেবলাত্মার কথা নহে। আত্মা ও মনের সংসর্গ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংসর্গ এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংসর্গ যে অবস্থাতে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলা হয়। কিন্তু যে অবস্থাতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু অবশিষ্ট দুইটি সম্বন্ধ পূর্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার প্রচলিত নাম স্বপ্নাবস্থা। যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না, তা'ছাড়া মন ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধও থাকে না, একমাত্র আত্মা ও মনের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সুষুপ্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অজ্ঞান-আচ্ছন্ন জীব নিরন্তর এই তিনটি অবস্থার আবর্তন অনুভব করিয়া থাকে। এই আবর্তন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় আবশ্যক। যতদিন তাহা না হয়, অর্থাৎ যতদিন আত্মার সম্যক্ জ্ঞান উদিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই আবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ব্যষ্টিভাবে ইহা যেমন সত্য, সমষ্টিভাবেও তেমনি সত্য। মৃত্যুর পর লোকান্তর গমন বা জন্মান্তর পরিগ্রহ, এমনকি প্রলয়াদির ব্যাপার, সবই এই নিয়মের অধীন।

সুষুপ্তি দশাতেও আত্মার সহিত মনের সংযোগ থাকে। ইহা অনাদি সংযোগ এবং মূল অজ্ঞান হইতে প্রসূত। সুষুপ্তিকালে মন পুরীতৎ নাড়ীর মধ্যে অর্থাৎ বেষ্টনের অভ্যন্তরে হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করে। ঐটি আকাশ স্থান। ওখানে কোন প্রকার নাড়ী নাই এবং বায়ুরও কোন স্পন্দন অনুভূত হয় না। সুষুপ্তিকালে মন হৃদয়মধ্যে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে বলিয়া ঐ সময় কোন প্রকার লৌকিক জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, মন মনোবহা নাড়ীতে সঞ্চরণ না করিলে লৌকিক জ্ঞান আবির্ভূত হয় না। নাড়ীমাত্রই বায়ু-ঘটিত সংস্থান—সমগ্র মানবদেহ নাড়ীজালে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু দেহের মধ্যে একমাত্র ঐ হৃদয়স্থ দহরাকাশই নাড়ী-শূন্য, বায়ু-শূন্য এবং মনের

ক্রিয়া-শূন্য স্থান। দেহের সর্বত্রই মনের সঞ্চরণ এবং বায়ুর ক্রিয়া সম্ভবপর, কিন্তু হৃদয়ে বায়ু, মন প্রভৃতি কিছুই ক্রিয়া করে না। মন যখন হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় তখন ওখানে স্তব্ধ হইয়া বিদ্যমান থাকে—উহা মনের লয়াবস্থা। মনের ক্রিয়া না থাকাতে ঐ সময়ে বিলক্ষণ আত্ম-মনঃ-সংযোগ ঘটিতে পারে না বলিয়া জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার লৌকিক বিশেষগুণের উদ্ভব হয় না।

কিন্তু যখন গুরুকৃপাতে এবং নিজের প্রাক্তন শুভাদৃষ্টের পরিপাকবশতঃ অলৌকিক জ্ঞানের উদয় হয় তখন ঐ অনাদি আত্ম-মনঃ-সংযোগের হেতুভূত অজ্ঞানটি কাটিয়া যায়। তখন ঐ আত্ম-মনঃ-সংযোগও থাকে না। তখন হৃদয়াকাশ নবোদিত জ্ঞান-সবিতার স্নিগ্ধ কিরণমালায় আলোকিত হয়। এই অবস্থাটিকে স্থূলভাবে আত্মার তুরীয় দশার পূর্ব সূচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই অবস্থার উদয় হইলে ও ইহা স্থায়ী হইলে ইহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই সমভাবে অনুস্যূত থাকে। ইহা পূর্ণাবস্থা হইলেও ইহার উন্মেষ প্রথমেই সাধারণতঃ পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তাই জ্ঞানের উদয়ের পরেও জাগ্রৎ প্রভৃতি অজ্ঞান-দশা কিছু সময় পর্যন্ত বহাল থাকে। তবে উহা ক্রমশঃই অধিকতর হীনশক্তি হইয়া পড়ে। দেহ থাকা পর্যন্ত অথবা প্রারব্ধের বল ভোগের দ্বারা কাটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সাধারণতঃ এইভাবেই চলিতে থাকে। প্রারব্ধ কাটিয়া গেলে দেহাভিমান আভাসরূপেও থাকে না। জাগ্রৎ-আদি অবস্থা-ভেদও থাকে না। তখন একই অবিচ্ছিন্ন স্থিতি বিদ্যমান থাকে। ঐ সময়ে তুরীয় অবস্থা তুরীয়াতীত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বস্তুতঃ ঐটি নিত্যাবস্থা হইলেও তুরীয় অবস্থার উদয় ও পরিপাক না হইলে উহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না। জাগ্রৎ-আদি তিনটি পৃথক্ দশা যতদিন থাকে ততদিন পর্যন্ত চতুর্থ বা তুরীয় নামের সার্থকতা—যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ জ্ঞানের অর্থ আছে। কিন্তু যখন জাগ্রৎ-আদি পৃথক পৃথক্ অবস্থা থাকে না, অজ্ঞানও থাকে না, তখন ঐ তুরীয়ই তুরীয়াতীত বা স্বরূপস্থিতি নামে পরিচিত হয়।

জাগ্রৎ অবস্থাতে ইন্দ্রিয়সকল বহির্মুখ থাকে ও রূপ-রসাদিময় বিষয় পঞ্চকের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া উহাদিগকে গ্রহণ করে। এইভাবে আমাদের বাহ্য-জগতের জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতে এই বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ক্লান্তিবশতঃ ইন্দ্রিয়ের বহিরুন্মুখভাব তখন উপশম প্রাপ্ত হয়—ইন্দ্রিয় তখন অন্তর্মুখ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ হইলেও মন তখনও বহির্মুখ থাকে, অর্থাৎ ঐ সময়ে ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখ না থাকিলেও মনের ইন্দ্রিয়ামুখী প্রবণতা

নিবৃত্ত হয় না। ইহারই ফলে স্বপ্নানুভবের উদয় হয়। ইহা সংস্কার-জন্য জ্ঞান। তা'ছাড়া, ঐ সময়ে মন দেহের মধ্যেই মনোবহা নাড়ী অবলম্বন করিয়া অন্তঃস্থিত বায়ুমণ্ডলে সঞ্চরণ করে ও নানাপ্রকার দর্শন স্পর্শনাদির অনুভব করে। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড অভিন্ন বলিয়া এই সঞ্চার একদিকে যেমন ব্যষ্টির মধ্যে হয়, অপরদিকে তেমনি সমষ্টির মধ্যেও হইতে পারে। সূক্ষ্ম পদার্থের জ্ঞানও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার পর যখন ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনও ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন মনের ইন্দ্রিয়মুখী গতি নিবৃত্ত হয় ও মন উপরত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে চায়। ঐ সময়ে স্বভাবতঃ উহা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার লাভ করে। মন বহির্মুখ না হইয়া অন্তর্মুখ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যায়, কারণ হৃদয়াবচ্ছিন্ন আকাশ পরিমিত রূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে সর্বব্যাপক। মন যখন সেখানেই থাকুক না কেন, উহা নিত্যই তাহার সন্নিহিত থাকে। তথাপি মন সব সময়ে উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। মন বাহ্য-উন্মুখ ভাব হইতে বিরত হইয়া অন্তর্মুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ আকাশে অর্থাৎ হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ-পথ প্রাপ্ত হয়। একবার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পর মনের আর সঞ্চরণ করিবার সামর্থ্য থাকে না, কারণ ঐ আকাশে চলিবার কোন পথ নাই। তাই মন নিশ্চল হইয়া ঐখানে অবস্থান করে। কিন্তু আশ্চর্য এই—মন ক্লান্ত হইয়া নিশ্চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়গুহাতে প্রবিষ্ট হইলেও মনের দিকে আত্মার উন্মুখ-ভাব নষ্ট হয় না। সেইজন্যই উভয়ের মধ্যে সংযোগ বিদ্যমান থাকে। যতদিন অনাদি অবিদ্যা প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে নিবৃত্ত না হয় ততদিন আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার এই মনের অভিমুখতা নিবৃত্ত হইতে পারে না। এইজন্যই মন কিয়ৎকালের জন্য সুষুপ্তিতে স্থির হইলেও এই স্থিতি দীর্ঘকাল থাকে না। পূর্ব-সংস্কারের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে বহির্মুখ হয় এবং পূর্ববৎ নাড়ী-মার্গে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করে। পূর্ব-সংস্কারের উদ্বোধনের প্রকৃত হেতু কাল। সুতরাং বুঝিতে হইবে সুষুপ্তি অবস্থাতেও মন কালাতীত হইতে পারে নাই। সেই জন্যই মন স্থির হইলেও সুষুপ্তিতে জ্ঞানের উদয় হয় না। জাগতিক জ্ঞান মনের ক্রিয়া-সাপেক্ষ। হৃদয়াকাশে সেইজন্য লৌকিক জ্ঞানের উদয় সম্ভবপর নহে। যে সময় মন স্থির হয় ও সঙ্গে সঙ্গে লোকোত্তর জ্ঞানের প্রকাশ জাগিয়া উঠে, সেই সময়েই তুরীয় অবস্থার উন্মেষ জানিতে হইবে। সুষুপ্তিতে যে স্থিরতা তাহা তামসিক। ঐ অবস্থায় সত্ত্ব থাকিলেও উহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব নহে, সুতরাং বিশুদ্ধ সত্ত্বের উদয় ও বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত মূল অজ্ঞানকে কাটান যায় না এবং লোকোত্তর জ্ঞানেরও আবির্ভাব হয় না। গুরু-কৃপাতে যদি আত্মার মনোমুখী দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয় অথবা ততোধিক গুরুকৃপাতে

যদি ঐ দৃষ্টি পরমাত্মমুখী দৃষ্টিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে পূর্ববর্ণিত অনাদি অজ্ঞান কাটিয়া যায় ও আত্ম-মনঃ-সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ সময় মন নিষ্ক্রিয় এবং চেতন-ভাবাপন্ন হয়। ইহারই নাম মনের জাগরণ, মনের উদ্ধার বা মনের ত্রাণ অর্থাৎ জ্ঞানের উন্মেষ। আমরা যে তুরীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ইহারই নামান্তর। ইহার পর এই চেতন ও শুদ্ধ মনও আর থাকে না। তাহাই তুরীয়াতীত। তখন একমাত্র আত্মাই আপন স্বরূপে বিরাজ করেন এবং নিজের সহিত নিজে ক্রীড়া করেন।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা প্রচলিত সাধারণ দৃষ্টির কথা। কিন্তু বিজ্ঞানদৃষ্টিতে আরও অনেক রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এ সম্বন্ধে যাহা কিছু উপলব্ধি করেন, তাহার কিয়দংশ সাধারণ জিজ্ঞাসুর ঔৎসুক্য নিবৃত্তি ও জ্ঞান সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

যাঁহারা দেহ-বিজ্ঞানে নিষ্ণাত, তাঁহারা বলেন যে আমাদের এই মানব-দেহ সর্বময়—ইহাতে সব কিছু আছে। শুধু তাহাই নহে, সব কিছুর অতীত যাহা তাহাও ইহাতে আছে। পিণ্ড যে শধু ব্রহ্মাণ্ড হইতে অভিন্ন তাহা নহে—ব্রহ্মাণ্ডাতীত বা বিশ্বাতীত সত্যও পিণ্ডের আশ্রয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই দেহ-চক্রকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহাকে সাংকেতিক যন্ত্ররূপে নিরীক্ষণ করিলে ইহাকে এক দৃষ্টিতে চতুরস্র বা চতুষ্কোণ রূপে এবং অন্য দৃষ্টিতে ষট্‌কোণ রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই তিনটি দশা জীবভাবসংসৃষ্ট, তাই এই তিনটিকে জীব-দশা বলা চলে। তুরীয় অবস্থার নাম শিব-দশা। এই দেহকে আশ্রয় করিয়া তিনটি জীব-দশা ও একটি শিব-দশা অর্থাৎ মোট চারিটি দশা প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাকে চতুরস্র রূপে কল্পনা করা হয়। কিন্তু তুরীয় অবস্থার অবান্তর ভেদও কল্পনা করা যাইতে পারে। কারণ, এই অবস্থাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির উপাধিগত সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর। এই ঔপাধিক সম্বন্ধের দৃষ্টিকোণ হইতে তুরীয়কেও তিন প্রকার মনে করা চলে। এই ভাবে দেখিতে গেলে জীব-দশা তিনটি বলিয়া জীব ত্রিকোণ-পদ-বাচ্য এবং শিব দশাও তিনটি বলিয়া শিবও ত্রিকোণ-পদ-বাচ্য। দেহচক্রে এই উভয় দশার পরস্পর মিলন রহিয়াছে। সেইজন্য দেহচক্রকে সাংকেতিক ভাবে ষট্‌কোণ বলিয়া বর্ণনা করা চলে।

অতএব তুরীয়কে এক দশা মনে করিলে দেহ চতুরস্র নামে অভিহিত হয়। আর যখন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি জীবাবস্থার সহিত জাগ্রৎ-আদি উপাধি-সম্পন্ন শিবাবস্থারূপে তুরীয়কে তিন প্রকার ধরিয়া যোগ করা যায়,

তখন এই দেহকে ষট্‌কোণ বলা হইয়া থাকে। দেহচক্রের একটি নাভি বা মধ্যবিন্দু আছে। তাহাই সমগ্র চক্রটিকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। যাহাকে আমরা তুরীয়াতীত অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করি উহাই তাহার স্বরূপ—উহাই দেহচক্রের কেন্দ্র।

জাগ্রৎ একটি সক্রিয় অবস্থা—ঘটপটাদি বাহ্য পদার্থের অনুসন্ধানই ইহার স্বরূপ। সুপ্তি অবস্থা নিবৃত্ত হইলে এইপ্রকার যে বাহ্য অর্থের অনুসন্ধান উদিত হয়, ইহাই জাগ্রৎ। ইহাতে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে। কিন্তু সুপ্তি অবস্থাতে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে না—উহা জড়ত্বপ্রধান নিষ্ক্রিয়াবস্থা। এই উভয় অবস্থার অন্তরালে আর একটি অবস্থা আছে। তাহার নাম স্বপ্ন। সুপ্তি নিবৃত্ত হওয়ার পূর্বে নানাপ্রকার মানসিক ভেদময় বিকল্প-জ্ঞানের উদয় হয়—উহাই স্বপ্ন নামে পরিচিত। জীবের সংসারদশা বিশ্লেষণ করিলে এই তিনটি দশার সহিতই আমরা পরিচয় লাভ করিয়া থাকি। যাহাকে সুপ্তি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাই সংসারের বীজ দশা, যাহাকে স্বপ্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সংসারের উন্মেষ দশা এবং যে দশাকে আমরা জাগ্রৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি তাহা সংসারের গাঢ় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা। আত্মার সংস্কারের ক্রমিক আধিক্য অনুসারে পর পর এই তিনটি অবস্থার নির্দেশ করা হইল।

কিন্তু তুরীয় অবস্থা এই তিনটি অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। এই তিনটি অবস্থার মধ্যে পরস্পর ভেদ-সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতে ইহাদের যে কোন দুইটি অবস্থা একসঙ্গে প্রকাশিত হইতে পারে না, পর পর হয়। অর্থাৎ যখন জাগ্রৎ থাকে তখন স্বপ্ন বা সুষুপ্তি থাকে না, যখন স্বপ্ন থাকে তখন জাগ্রৎ বা সুষুপ্তি থাকে না, এবং যখন সুষুপ্তি থাকে তখন জাগ্রৎ বা স্বপ্ন থাকে না। কিন্তু তুরীয় অবস্থা এই প্রকার নহে। কারণ উহা উক্ত তিন অবস্থার প্রত্যেকটির সহিত ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান থাকে। তুরীয় জাগ্রতে থাকে, স্বপ্নে থাকে এবং সুষুপ্তিতেও থাকে। তুরীয়ের প্রকাশের জন্য অন্য কোন অবস্থা নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক নহে। চিৎ এর অনুসন্ধানই তুরীয়ের বৈশিষ্ট্য। উক্ত তিনটি অবস্থার প্রত্যেকটি চিৎ হইতে উদ্ভূত—তাই চিৎ উহাদের কারণ ও উহারা চিতের কার্য। কার্যে যেমন কারণ ব্যাপকরূপে বর্তমান থাকে, তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে তুরীয় ব্যাপকরূপে বিদ্যমান থাকে। তুরীয় অবস্থা শুদ্ধ ও নির্মল হইলেও উহাতে জাগ্রৎ প্রভৃতি ভিন্ন অবস্থার কলঙ্ক স্পর্শ হয়। ইহা স্পর্শ মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা সত্য। কিন্তু তুরীয়াতীত অবস্থাতে এই স্পর্শও থাকে না।

পরম শিবের প্রাণস্বরূপা পরা শক্তি মাতৃকা মহাযন্ত্রের বাচ্য। এই মহাশক্তি পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট—ইহার স্বরূপ জাগ্রৎ প্রভৃতি পঞ্চ অবস্থার দ্বারা গঠিত। মূর্তির অবয়বের দিক্ হইতে বিচার করিলে জাগ্রৎ অবস্থাকে ইহার শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে, কারণ দক্ষিণ পার্শ্ব ক্রিয়াপ্রধান এবং জাগ্রৎ অবস্থাও ক্রিয়াপ্রধান। সুষুপ্তিকে বাম পার্শ্ব মনে করা যাইতে পারে, কারণ ইহা অনেকাংশে নিষ্ক্রিয়। স্বপ্ন অবস্থা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যবর্তী—ইহা দেবীর জঘন বা গুহ্য প্রদেশ বলিয়া কল্পিত হয়। বিকল্প-সমূহ এই অংশ হইতেই উদ্ভূত হয়। সুপ্তি নিবৃত্ত হওয়ার পর যে বিষয়জ্ঞান হয় তাহা জাগ্রৎ, এবং সুপ্তি নিবৃত্ত না হইলেও যদি অর্থজ্ঞান হয় তবে উহা স্বপ্ন বলিয়া জানিতে হইবে। তুরীয় অবস্থা দেবীর মুখরূপে কল্পিত হয়। জাগ্রৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ দশাতে যে জড় ভাব প্রকট হয় তাহাকে গ্রাস করিবার সামর্থ্য একমাত্র তুরীয়েই আছে। মুখ যেমন চর্বণ ও ভক্ষণ কার্য করিয়া থাকে তেমনি চিদনুসন্ধান-প্রধান তুরীয় অবস্থাও জড়ত্বকে গ্রাস করিয়া থাকে।

তুরীয়াতীত অবস্থা দেবীর হৃদয়রূপে পরিকল্পিত। ইহাই সকল অবস্থার প্রাণভূত। বাস্তবিক পক্ষে তুরীয়াতীত অবস্থা সাক্ষাৎ মহাশক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতে অবস্থার বিচার প্রসঙ্গে তুরীয়াতীত অবস্থারই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। যদিও তুরীয় ও তুরীয়াতীত উভয় দশাতেই চিদ্ভাবের প্রকাশ থাকে, তথাপি তুরীয় অবস্থাতে সংসার-কলঙ্কের ক্ষীণ আভাস থাকিয়া যায়, কিন্তু তুরীয়াতীতে তাহাও থাকে না। পরম শিবের অবস্থা ষষ্ঠ দশা রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য—ইহা অখণ্ড ও ব্যাপক। কিন্তু তাহা হইলেও পরমশিব হইতে পরা শক্তির উৎকর্ষই কীর্তিত হইবার যোগ্য, কারণ পরম শিবের সত্তা চিৎ-সারভূতা বিমর্শরূপা পরা শক্তির অধীন। এইজন্য শিব-শক্তিতে বস্তুতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও শক্তিরই প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হয়।

এই যে বিভিন্ন দশার বর্ণনা করা হইল ইহাদের সহিত 'অ'-কারাদি বর্ণ সমূহের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কালিদাস রঘুবংশের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শক্তি ও শিবের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য উপমাচ্ছলে বাক্ বা শব্দ এবং অর্থের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। সৃষ্টি-প্রসঙ্গে শব্দই যে অর্থরূপে বিবর্তিত হয় ইহা ভর্তৃহরি বলিয়াছেন। বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধন-শাস্ত্রে সর্বত্র এই শব্দ ও অর্থের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা কীর্তিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় যোগিগণও ইহা জানিতেন এবং এই বিষয়ে অনেক গুহ্য তত্ত্ব তাঁহাদের সাধন-সাহিত্যে উপলব্ধ হয়।

শব্দ-অধ্বার বা ধারার মূলে বর্ণ। বর্ণ হইতে মন্ত্র, পদ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। অর্থ-অধ্বার মূলে কলা, যাহা হইতে তত্ত্ব, ভুবন প্রভৃতি কার্যবর্গের ক্রমিক স্ফুরণ হয়; উভয় ধারার পরস্পর সম্বন্ধ প্রতি স্তরেই বিদ্যমান।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বর্ণকে আত্মিক দশার জ্ঞাপক বা ব্যঞ্জক বলিয়া মনে করিতে পারি। সুতরাং তদনুসারে দশা ও বর্ণের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে বলা চলে। বর্ণ দ্বারাই দশাগুলির অভিব্যক্তি হয়, ইহাই তাৎপর্য। যে নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া উভয়ে এই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে, তাহা উভয়ের সাদৃশ্য। ক্রমশঃ আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

'অ' হইতে বিসর্গ পর্যন্ত স্বরবর্ণ সুষুপ্তি অবস্থার দ্যোতক। 'ক' কার হইতে 'ম' কার পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শবর্ণ জাগ্রৎ অবস্থার দ্যোতক। 'য', 'র', 'ল' ও 'ব' এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণ স্বপ্নাবস্থার পরিচায়ক। 'শ', 'ষ' ও 'স' —এই তিনটি উষ্মবর্ণ তুরীয় বাচক এবং কূটাক্ষর 'ক্ষ' তুরীয়াতীত রূপে কল্পিত হয়। আপাততঃ ইহার বিচার তুরীয়ের সহিতই করিতে হইবে। যাহাকে তুরীয় বলা হইল তাহা জাগ্রৎ অবস্থাতে আবির্ভূত সুষুপ্তির নামান্তর। ইহারই পারিভাষিক সংজ্ঞা যোগনিদ্রা।

বর্ণসকল উচ্চারণ করিতে হইলে যে প্রযত্ন আবশ্যক হয় তাহার বৈশিষ্ট্য অবস্থাসকলের বৈশিষ্ট্যের ঠিক অনুরূপ। উচ্চারণগত সঙ্কোচ ও বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইল। স্পর্শবর্ণের উচ্চারণে স্পৃষ্ট প্রযত্ন আবশ্যক হয়—ইহা জাগ্রৎ অবস্থার দ্যোতক। এই প্রযত্নে সঙ্কোচভাব প্রধান থাকে। কিন্তু বিবৃত প্রযত্নে সঙ্কোচভাব কাটিয়া যায়—উহাতে প্রসারের প্রাধান্য থাকে। স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিবৃত প্রযত্নের দ্বারাই হইয়া থাকে। স্বরবর্ণ সুষুপ্তি অবস্থার জ্ঞাপক, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্বরবর্ণ নাদকল্প। এইজন্য তাহাকে নাদরূপেই গ্রহণ করা হয়। স্পর্শবর্ণ সৃষ্টি ও প্রলয়বিষয়ক। স্পৃষ্টতা প্রযত্ন বলিতে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানের নিম্ন ও উর্ধ্বভাগের সংঘটন বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম সঙ্কোচ গ্রহণ। বিবৃততাপ্রযত্নের উদ্দেশ্য এই যে ইহা দ্বারা পূর্বোক্ত সংঘটিত কণ্ঠাদি ভাগদ্বয়ের পুনরায় বিঘটন করা হয়। ইহার নামান্তর সঙ্কোচ ত্যাগ। জাগ্রৎ অবস্থায় ঘট-পটাদি অর্থের গ্রহণ হয়। এই অবস্থায় আত্মাতে সঙ্কোচ ভাবের উদয় হয়। সুষুপ্তি অবস্থা বিশ্রামের অবস্থা—তখন আত্মাতে পূর্ণভাব প্রকাশিত হয়।

যদিও বর্ণই দশার অভিব্যঞ্জক তথাপি সঙ্কোচ গ্রহণ ও সঙ্কোচ ত্যাগমূলক অবস্থাসাদৃশ্য বর্ণের প্রযত্নসাপেক্ষ। এইজন্য প্রযত্নকে উপচারবশতঃ অবস্থা-ব্যঞ্জক বলিয়া ধরা হয়। স্বপ্ন অবস্থার জ্ঞাপক অন্তঃস্থ বর্ণগত ঈষৎস্পৃষ্টতা প্রযত্ন। এই উচ্চারণ প্রযত্নে স্পৃষ্টতাই প্রধান—তবে গৌণভাবে বিবৃততা

ইহাতে আছে। এইজন্য ইহাকে মিশ্র প্রযত্ন বা ঈষৎস্পৃষ্ট প্রযত্ন বলা হয়। তুর্যদশার জ্ঞাপক উষ্মবর্ণগত ঈষৎবিবৃততা প্রযত্ন। এই বিবৃততা-প্রযত্ন স্পৃষ্টতার সহিত মিশ্রিত বলিয়া ইহা সমগ্র নহে—ইহা সংকীর্ণ বা ঈষৎ।

অতএব সুষুপ্তির পূর্ণতা সমগ্র বা পূর্ণ। কারণ ইহা নির্বিকল্প পদ—ইহা বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়বর্গের বিশ্রামস্বরূপ। বিকল্পের অভাবই পূর্ণত্বের বোধক। জাগ্রতের অপূর্ণতা ঠিক এইপ্রকার সম্যক্ বা পূর্ণ। কারণ, ইহা সংসার পদ ও গাঢ় বিকল্পের উদয় স্থান। ইহা ঘট-পটাদির অনুসন্ধানাত্মক—ইহাতে বিশ্রান্তির স্পর্শ পর্যন্ত নাই। এই বিকল্পদ্বয়ই জাগ্রৎ অবস্থাকে মহাসংকোচময় রূপে পরিণত করিয়াছে। তুরীয় অবস্থা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মিশ্রণ বলিয়া জানিতে হইবে। যদিও তুরীয় অবস্থাতে চিদ্-বিশ্রান্তি ব্যাপক ভাবে আছে এবং চিদ্-বিশ্রান্তিই সুষুপ্তি, তথাপি ঐ ব্যাপ্তির অনুসন্ধান হয় চৈত্য বর্গে বা জড় বস্তুতে। কাজেই বিকল্প-স্পৃষ্টতাও জাগ্রতের অনুবর্তী থাকে। স্বপ্নও মিশ্ররূপ—ইহা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সমবায় রূপ। তুরীয়ে পূর্ণতা অসমগ্র। কিন্তু স্বপ্নে সংকোচ অসমগ্র।

পাঁচ

অদ্বৈত সুফী সাহিত্যে পরমাত্মার তিনটি যাত্রার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম যাত্রা পরমাত্মা হইতে বহির্মুখ গতিতে অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া এবং জীবভাব ধারণ করিয়া মনুষ্যভাবের প্রাপ্তি পর্যন্ত। দ্বিতীয় যাত্রা মনুষ্যভাব হইতে জ্ঞান প্রাপ্তির পরে অবিদ্যার নিবৃত্তি সাধনপূর্বক পুনরায় সচেতন ভাবে নিজ ভাব বা পরমাত্মভাবের প্রাপ্তি এবং সোহংরূপে সম্যক্ প্রকারে বোধস্বরূপে নিজের পরিচয় পর্যন্ত। এই দুইটি যাত্রার কথা অধ্যাত্ম সাহিত্যে সর্বত্রই প্রচলিত আছে। প্রথম যাত্রা অজ্ঞানের যাত্রা। দ্বিতীয় যাত্রা জ্ঞানের যাত্রা। পরমাত্মা অজ্ঞানকে গ্রহণ করেন, জীবভাব ধারণ করেন এবং চরমে মনুষ্যদেহ অবলম্বন করেন—ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য চৈতন্যের বিকাশ সম্পাদন, যাহার জন্য দেহধারণ ও চৌরাশী লক্ষ যোনির মধ্য দিয়া দেহের ক্রমবিকাশ আবশ্যক হয়। এই ক্রমবিকাশের ফলে দেহের ও চৈতন্যের বিকাশ পূর্ণ হইয়া মানবীয় সত্তার অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয়। তখন মানব নিজেকে নিজে পূর্ণরূপে সচেতন ভাবে জানিবার অবসর প্রাপ্ত হয়, কারণ তখন অহংভাবের বিকাশ হয়। কিন্তু অবসর প্রাপ্ত হইলেও নিজেকে নিজে অহংরূপে জানিতে পারে না। তাহার কারণ, ক্রমবিকাশের ফলে বিকশিত

জ্ঞানের উপরে সংস্কারের ঘনীভূত আবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আবরণ অপসারিত না হইলে আত্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। আবরণের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন বুদ্ধি প্রভৃতির প্রাকৃত সত্তা হইতে অহংবোধ মুক্ত হইয়া যায় এবং চরমস্থিতিতে উহা 'আমি' বর্জিত হইয়া নিজেকেই নিজে প্রকাশ করে।

এই দুইটি যাত্রার ফলে আত্মা নিজের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বকর্তৃত্ব ও অন্যান্য যাবতীয় ভাগবত গুণের প্রকাশ অনুভব করে ও নিজের ভগবৎ-সত্তাতে জ্ঞান-পূর্বক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরমাত্মা সম্বন্ধে বস্তুতঃ বোধ ও অবোধ পৃথক্‌ভাবে গৃহীত হয় না। কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে বুদ্ধির সৌকর্যের জন্য বলা হয় যে, তাহাতে যেমন এক পক্ষে বোধ ও অবোধের কোন ভেদ নাই, অপর পক্ষে তেমনই তাহাতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌ও স্পষ্টভাবে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে যেটি অবোধের দিক্‌ সেটি নিত্য সুষুপ্ত বা জড়ভাব বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য। এই সুষুপ্তিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই জড়ভাব খণ্ডিত হইয়া জড়রূপ ধারণ করে এবং চিদ্ভাবের উন্মেষ জীবরূপ ধারণ করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়। এই পথে চিতের সঙ্গে অর্থাৎ জীবভাবের সঙ্গে জড়ের সম্বন্ধ—অর্থাৎ অচেতন দেহের সংযোগে জীবের অগ্রগতিতে মনুষ্যদেহ ধারণ পর্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। চৈতন্যের ক্রমবিকাশ বা ক্রমজাগরণই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও নিয়ামক। পক্ষান্তরে অন্য যেটি বোধের দিক্‌—সেটি নিত্য জাগ্রত স্থিতিরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহা নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ চৈতন্যের অবস্থা, মহাসুষুপ্ত হইতে ইহা পৃথক্‌। এই অবস্থায় আত্মা স্বভাবতঃ নিজেকে অনাবৃতচেতন পরমাত্মা ও অনন্ত শক্তিসম্পন্নরূপে বোধ করিয়া থাকে। পূর্বের অবস্থাটি প্রকৃতির পরমাবস্থা—এই অবস্থাটি পুরুষের পরমাবস্থা ; মূলে কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমাবস্থায় অহংবোধের উদয় হয় না, বস্তুতঃ কোন বোধেরই উদয় হয় না—মহাসুষুপ্ত ভঙ্গের পর সেই বোধের উদয় ও পুষ্টি লাভ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় অহংবোধ পূর্ণাহংরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

সুফীগণ বলেন, এই দ্বিতীয় যাত্রার পর কোন কোন ক্ষেত্রে একটি তৃতীয় যাত্রার সন্ধানও প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি, ভগবৎ সত্তা নিজ স্বরূপ হইতে বাহির হইয়া আসে। অপরটি, বাহির হইতে এই সত্তা অন্তর্মুখ হইয়া নিজ স্বরূপে প্রবেশ করে। নিজ স্বরূপে প্রবিষ্ট হওয়ার পর ঐ স্বরূপের মধ্যেই ভিতরে ভিতরে যে পরম অব্যক্তের দিকে যাত্রা তাহাই তৃতীয় যাত্রা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যাহাকে পরমশিবের পৃষ্ঠভূমি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সন্ধান

এই তৃতীয় যাত্রার পথেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই যাত্রার একটি সীমা আছে। যদিও এই যাত্রা অনন্ত তথাপি মনুষ্যদেহে অবস্থিত হইয়া এই যাত্রার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে একটি পরম অব্যক্তের দ্বারে আসিয়া স্তম্ভিত হওয়া অপরিহার্য। অতি সূক্ষ্মদর্শী খ্রীষ্টীয় অধ্যাত্মবিৎ যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ এইজন্যই God হইতে Godheadকে পৃথক্ করিয়া বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানদৃষ্টির নির্মলতার তারতম্যানুসারে কেহ অল্প দূরে যাইয়াই মৌন অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কেহ অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন। কারণ, অব্যক্ত চিরদিন অব্যক্তই থাকে। তাহাকে ব্যক্ত করিবার যতই চেষ্টা করা যাক্ না কেন তথাপি চরমস্থিতিতে অব্যক্ত অব্যক্তই থাকিয়া যায়—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্র, অতীব গুহ্য হইলেও, এই তৃতীয় যাত্রার সন্ধান দিতে বিরত হন নাই। বিশেষতঃ, তান্ত্রিক শাস্ত্র গুহ্যতত্ত্বের প্রতিপাদক বলিয়া এই মার্গে অধিক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য শাস্ত্রেও স্থানবিশেষে ইহার পরিচয় যে না পাওয়া যায় তাহা নহে।

সাধারণ দৃষ্টিতে পরমশিবাবস্থাই পূর্ণত্বের প্রতিপাদক চরম অবস্থা বলিয়া আগমশাস্ত্রে গৃহীত হইয়া থাকে। কারণ, এই অবস্থায় শিব ও শক্তিভাবের সামরস্য বা সাম্য আত্মপ্রকাশ করে। শিবভাব অভিব্যক্ত প্রকাশের ভাব—ইহাই পরম প্রকাশ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সব কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং সব কিছু না থাকিলেও যাহা স্বপ্রকাশ বলিয়া নিরন্তর নিজের মধ্যেই নিজে প্রকাশমান থাকে। এই প্রকাশের যেটি আত্মবিশ্রান্তি অর্থাৎ অহংরূপে বিমর্শন তাহাই শক্তি। শক্তির স্ফুরণ হইতেই বিশ্বের উদয় ঘটিয়া থাকে—শুধু তাহাই নহে, বিশ্বের স্থিতি ও লয়ও শক্তির স্ফুরণসাপেক্ষ। সুতরাং শক্তির উন্মেষ অবস্থায় এই সমগ্র প্রকাশের মধ্যে বিশ্বের আভাস দৃষ্টিগোচর হয়। এই আভাস অহংরূপে গৃহীত হউক্ অথবা ইদংরূপে গৃহীত হউক্ তাহা পৃথক্ কথা—কিন্তু এই আভাসের সত্তাই মহাপ্রকাশকে সাভাস প্রকাশরূপে নির্দেশ করে। আভাস না থাকিলে ঐ প্রকাশ নিরাভাসরূপে প্রকাশমান হয়। যাহাকে লোকদৃষ্টিতে সৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা এই মহাপ্রকাশরূপী পূর্ণ অহংএর স্বাতন্ত্র্যকল্পিত ইদংরূপী বাহ্য সত্তামাত্র। এই বাহ্য সত্তা সর্বপ্রথম শূন্যরূপে অর্থাৎ শূন্যাতিশূন্যরূপে প্রকাশিত হইয়া ক্রমশঃ স্তরে স্তরে অনন্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

আমরা এই বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পূর্ণ পরমশিবসত্তার অন্তরালে বা পৃষ্ঠভূমিতে কি আছে তাহাই শাস্ত্র ও গুরুশক্তির সহায়তায় কিঞ্চিৎ ধারণা

করিতে চেষ্টা করিব। ইহা আপাততঃ গুহ্যতত্ত্বের আবরণ উন্মোচন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যাহা প্রকৃত গুহ্যতত্ত্ব তাহার আবরণ উন্মোচন করা যায় না। ইহা শুধু পরমশিব অবস্থার অন্তর্গত কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম স্তরের বিশ্লেষণ মাত্র। এই বিশ্লেষণে যে ক্রম উপলব্ধিগোচর হয় তাহা কালগত ক্রমে নহে, বোধের ক্রমমাত্র। এই ক্রম না ধরিলে দেহবন্ধ চৈতন্য নিজের অন্তরস্থিত অনন্ত বৈচিত্র্যের কিয়দংশ সচেতন ভাবে ধারণা করিতে পারে না।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এ কথা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। বস্তুতঃ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি ভাব অভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটি একটি বিশিষ্ট অর্থের দ্যোতক। সৎভাব অসদ্ভাব হইতে পৃথক্ হইয়া সন্মাত্ররূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে, আবার চিদ্ভাবের সহিত অভিন্নরূপেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। তদ্রূপ চিদ্ভাব আনন্দের অতীত পরমসত্তায় বিরাজ করিতে পারে, এবং পক্ষান্তরে উহা আনন্দের সহিত অভিন্ন হইয়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। পূর্ণতত্ত্বের যেটি গভীরতম স্থিতি, সেখানে সৎ, চিৎ ও আনন্দ কল্পিত হইতে পারে না। এই গভীরতম সন্মাত্র স্থিতি হইতে ইহারই আত্মপ্রকাশরূপে একটি কলা বা শক্তি নির্গত হয়, যাহাকে তান্ত্রিকগণ চিৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই চিদ্ভাব এক হিসাবে দেখিতে গেলে পূর্ণ সত্যের বহিরঙ্গভাবের আদি প্রকাশ। তান্ত্রিক সাহিত্যে এই চিদ্ভাবকে 'অনুত্তর' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সৎ হইতে নিজ সত্তা চিদ্রূপে বহির্গত হইলে চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু যে বহির্মুখ স্পন্দন চিদ্ভাবের প্রকাশক সেই স্পন্দন চিদ্ভাবের মধ্যেও পূর্ববৎ কার্য করিয়া থাকে। তাহার ফলে চিৎ নিজ সত্তা হইতে আংশিক ভাবে বহির্গত হইয়া আনন্দরূপে স্থিতিলাভ করে। কিন্তু এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে, যাহা শুদ্ধ সন্মাত্র তাহা এক পক্ষে নিঃস্পন্দ হইলেও অপর পক্ষে স্পন্দনরহিত নহে। এই স্পন্দন বহিঃস্পন্দন—যাহার প্রভাবে সৎ চিদ্রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার অন্তঃস্পন্দন আমরা ধরিতে পারি না। অন্তঃস্পন্দন স্বীকার করিলেও তাহা আলোচনার যোগ্য নহে। চিৎ প্রভৃতির প্রত্যেকটির স্থিতির মধ্যে অন্তঃ-স্পন্দন ও বহিঃস্পন্দন দুই-ই সমরূপে বিদ্যমান আছে। সেজন্য চিৎ যেমন স্পন্দনবশতঃ আনন্দের অভিমুখ তেমনি অন্য দিকে উহা সৎএরও অভিমুখ। অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ এই দুইটি বৃত্তি মানব চিত্তের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি ; ঠিক সেই প্রকার পরমসত্যের ভিতরেও চিৎ ও আনন্দ এই উভয়াংশের এই দ্বিবিধ স্পন্দন গৃহীত হয়। চিৎ হইতে বহিঃস্পন্দনের ফলে যখন দ্বিতীয় চিৎ আবির্ভূত হয় তখন বহির্মুখ প্রথম চিৎ ঐ দ্বিতীয় চিতের মধ্যে নিজেকে অর্থাৎ নিজের প্রতিবিম্বকে দেখিতে পায় এবং দেখিয়া উহা

নিজ সত্তা বলিয়া চিনিতে পারে। উহারই শাস্ত্রীয় নাম আনন্দ। দর্পণে যেমন নিজের স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা পৃথক্ মনে হইলেও নিজ সত্তা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়—তদ্রূপ চিৎ হইতে বিশিষ্ট চিৎসত্তাতে চিৎ যখন নিজেকে দেখিতে পায় তখন উহাকে আনন্দ বলিয়া অনুভব করে। বস্তুতঃ উহা পৃথক্ কিছু নহে। নিজেরই সত্তামাত্র। সৎ হইতে যেমন চিৎ পৃথক্ নহে, কিন্তু তথাপি পৃথক্, সেইরূপ চিৎ হইতে আনন্দ পৃথক্ নহে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাকে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি চিৎএর শাস্ত্রীয় নাম অনুত্তর। বর্ণমালার প্রতীক 'অ'। সর্ববর্ণের অগ্রভূত 'অ' বর্ণের দ্বারা অনুত্তরকেই লক্ষ্য করা হয়। সেরূপ 'আ' এই বর্ণটি আনন্দের প্রতীক। এই সৎ চিৎ ও আনন্দ অখণ্ডভাবে গৃহীত হইলে এক অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে নিজের নিকট নিজে প্রকাশিত হয়। এই ব্রহ্মসত্তা নিরংশ হইলেও বুঝিবার সৌকর্যের জন্য ইহাতে কল্পিত দুই অংশ আছে। একটি সন্মাত্র, যাহা চিরদিন অব্যক্ত ও অব্যাকৃত—উহা চিরনিগূঢ় এবং সত্যের গভীরতম স্থিতি। উহাকেই আশ্রয় করিয়া উহার প্রকাশ চিদ্রূপে বিরাজমান— এই চিৎ বস্তুতঃ চিৎশক্তির স্বরূপ এবং ইহা যখন নিজের অভিমুখ হয় এবং অনুকূল সংবেদনরূপে প্রকাশমান হয় তখন ইহা আনন্দ নামে পরিচিত হয়। এই আনন্দ হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপ। চিৎ অবস্থা অনকূল-প্রতিকূল ভাববর্জিত, কিন্তু আনন্দ অবস্থা নিত্য অনুকূল ভাবময়, প্রতিকূল ভাব ইহাতে নাই। চিৎ সত্তাতে একই এক, দ্বিতীয় কেহ নাই। কিন্তু আনন্দ সত্তাতে একই দ্বিতীয় সাজিয়া নিজের সঙ্গে নিজে খেলা করিতেছে। যে অবস্থার কথা বলিতেছি উহা সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা, সৃষ্টির যাবতীয় সামগ্রীর অভিব্যক্তির পূর্বাবস্থা। এই আনন্দ হইতেই আমরা যাহাকে সৃষ্টি বলি তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য শ্রুতি বলেন—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'। যুগলভাব ভিন্ন আনন্দ হয় না এবং আনন্দভাব ভিন্ন সৃষ্টি হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'স একাকী ন অরমত। তদাত্মানং দ্বিধা অকরোৎ' ইত্যাদি। 'অ' হইতে 'আ' অভিব্যক্ত হওয়া আর এক হইতে দুই অভিব্যক্ত হওয়া—একই কথা। ইহাই আত্মরমণ—আত্মারাম অবস্থা, যাহার আস্বাদন ব্রহ্মবিদ্‌গণ করিয়া থাকেন।

ফোয়ারা হইতে যেমন জলকণিকা নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া নির্গত হইয়া থাকে তদ্রূপ এই আনন্দরূপ প্রস্রবণ হইতে নিরন্তর আনন্দের কণিকাসকল উচ্ছ্বসিত হইয়া বহির্মুখে ধাবমান হইতেছে। বস্তুতঃ বাহির বলিয়া কিছুই নাই, অথচ একটি কল্পিত বাহ্যসত্তা প্রতিভাসরূপে মানিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ উহা আনন্দসত্তার অভাবমাত্র, আর কিছু নহে। আনন্দের সূক্ষ্মকণা আনন্দের মূল প্রস্রবণ হইতে নির্গত হইলেই উহা একটি আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে,

নিজের অন্তঃস্থিত আনন্দসত্তাকে আর অনুভব করিতে পারে না। শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে ইহাই ইচ্ছার বিকাশ। ইহার প্রতীক 'ই'। আনন্দ যেখানে পূর্ণ আর অভাব যেখানে শূন্য, সেখানে ইচ্ছা বলিয়া কোন শক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না। ইচ্ছার যাহা বিষয় তাহাকেই ইষ্ট বলা হয়—ইহা অপর কিছু নহে, আনন্দই। কারণ, ইচ্ছামাত্রই আনন্দকে চায় এবং আনন্দকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছা চরিতার্থ হইয়া আপনাতে আপনি বিলীন হইয়া যায়। ইচ্ছা বস্তুতঃ আনন্দকে অন্বেষণ করিবার অথবা খুঁজিয়া বাহির করিবার শক্তি। বলা বাহুল্য, ইচ্ছা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্যই সমগ্র জগতের অন্তঃস্থলে সর্বত্র একটা অন্বেষণের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। অণু পরমাণু হইতে সূর্যমণ্ডল অথবা নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত, স্থূল হইতে কারণ জগৎ পর্যন্ত, সর্বত্রই প্রকটভাবেই হোক্ আর গুপ্তভাবেই হোক্ একটা অদৃশ্য আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অপর কিছু নহে, একটি হারাধন ফিরিয়া পাইবার জন্য আন্তরিক বাসনা। এই হারাধন ইচ্ছার বিষয়ীভূত আনন্দ, অপর কিছু নহে। আনন্দ না পাওয়া পর্যন্ত অন্বেষণের বিরাম নাই, তাই ইচ্ছারও তৃপ্তি নাই, তাই পূর্ণত্ব লাভ হয় না।

এই আনন্দরূপ ইষ্টবস্তু এখনও অমূর্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইচ্ছাশক্তি যখন ঘনীভূত হয় অথবা সংবেগে স্পন্দিত হয় তখন ঈশনশক্তির উদয় হয়। ইহার প্রতীক 'ঈ'। এই ঈশনশক্তিই ঐ শক্তির প্রাণ। বস্তুতঃ ইহা ইচ্ছা ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই ইষ্টবস্তু এখন এষণীয় অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয়ীভূত। ইহার পরাবস্থায় যখন এই গুপ্তধন প্রকট হইয়া উঠে তখন উহা জ্ঞেয়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তির আকার ধারণ করে। এই জ্ঞানশক্তির নামান্তর উন্মেষ, যাহার প্রতীক 'উ'।

উন্মেষরূপা জ্ঞানশক্তি নিজের বিষয় জ্ঞেয়সত্তাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইচ্ছা এবং এষণীয় যেমন পৃথক্ না হইলেও পৃথক্ বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় পৃথক্ না হইলেও পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়। জ্ঞানশক্তি 'উ'কারের দ্বারা বর্ণিত হয় এবং উহার বিষয় জ্ঞেয় 'ঊ'কারের দ্বারা বর্ণমালাতে গ্রথিত হইয়া থাকে। এই 'ঊ' বস্তুতঃ 'উ'রই ঘনীভূত অবস্থা। শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে ইহাকে ঊনতা বা ঊর্মি বলে।

জল হইতে বরফ যেমন স্বরূপতঃ অভিন্ন তদ্রূপ 'উ'কার হইতে 'ঊ'কার অভিন্ন এবং জল যেমন ঘনীভূত হইয়া বরফরূপ ধারণ করে তদ্রূপ জ্ঞানশক্তিও ঘনীভূত হইয়া জ্ঞেয়রূপ ধারণ করে। কিন্তু বরফ ঘনীভূত হওয়ার দরুণ জল হইতে পৃথক্ মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে জলই এবং জল হইতে উৎপন্ন হইয়া জলকে আশ্রয় করিয়াই বিদ্যমান থাকে। ঠিক সেইপ্রকার যাহাকে আমরা

জ্ঞেয় বলি অর্থাৎ যাহা জ্ঞানের বিষয়, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে—তাহা জ্ঞানেরই মূর্ত অবস্থা এবং জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হইয়া জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে—অবিদ্যাবশতঃ পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলে উহাকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ মনে হয় না। কিন্তু যে অবিদ্যার কথা এখানে বলা হইল, যাহার প্রভাবে জ্ঞান হইতে জ্ঞেয়কে পৃথক্ বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহা শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়াশক্তির নামান্তর। এই ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় পৃথক্ হইয়া যায়। আমাদের পূর্বের দৃষ্টান্তে জল হইতে উৎপন্ন বরফের টুকরা যতক্ষণ জলের মধ্যে ভাসিতে থাকে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে ক্রিয়াশক্তির ব্যাপার আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু যখন ঐ বরফের টুকরা জল হইতে অপসারিত হয়, যখন জল হইতে বরফ পৃথক্‌রূপে প্রতীতিগম্য হয়, তখন অবিদ্যারূপা ক্রিয়াশক্তির খেলা আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বর্ণমালাতে এই ক্রিয়াশক্তির প্রকাশক বর্ণ চারিটি—এ-ঐ-ও-ঔ। ক্রিয়াশক্তির অস্ফুট, স্ফুট, স্ফুটতর, স্ফুটতম এই চারিটি অবস্থা ঐ চারিটি স্বরবর্ণের দ্বারা দ্যোতিত হয়। ক্রিয়াশক্তির খেলা পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইলে ক্রিয়ার নিবৃত্তি ঘটে।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে স্পন্দনের বহির্মুখ সংবেগবশতঃ পর পর বিভিন্ন শক্তির অর্থাৎ কলার অভিব্যক্তি হইতেছে। স্থূল দৃষ্টিতে এই শক্তি বা কলাগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে—চিৎ আনন্দ ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া। প্রাচীন মহাজনগণ শিব অথবা পরমেশ্বরের পঞ্চমুখ কল্পনা করিয়া এই পঞ্চশক্তিরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই পঞ্চশক্তির মধ্যে চিৎ ও আনন্দ স্বরূপশক্তির অন্তর্গত। ইহারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত এবং আপেক্ষিক দৃষ্টিতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিনটি বহিরঙ্গা শক্তিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। এই বহিরঙ্গা শক্তি ত্রিকোণরূপী বিশ্বযোনি বা মহামায়া। মূলে কিন্তু পঞ্চশক্তিই শক্তি। যাহাকে স্বরূপ বলি তাহাও শক্তি। শক্তি নয় শুধু সেই সত্তামাত্র যাহা নিগূঢ়তম রূপে এই অন্তরঙ্গা শক্তিরও অন্তঃস্থলে বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্য শ্রুতি বলেন—'অস্তি ইতি ব্রুবতো অন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে'—এই বলিয়া সেই পরমশক্তির স্তব করিয়াছেন। এই যে শক্তিপ্রবাহ ইহা স্পন্দনের বহিঃপ্রবাহ। ইহা বলা বাহুল্য যে প্রতি স্থিতিতেই একটা অন্তঃপ্রবাহ আছে—যেমন সৃষ্টিমুখী গতি বহির্মুখ ও প্রলয়ের গতি অন্তর্মুখ, যেমন বহুর দিকে ঈক্ষণ বহির্মুখ কিন্তু স্বরূপের প্রতি ঈক্ষণ অন্তর্মুখ। সর্বত্রই এইরূপে বুঝিতে হইবে। অবশ্য যেখানে অন্তর্মুখ নাই বহির্মুখ নাই, এমন স্থিতিও আছে। এখানে তাহার সম্বন্ধে বলা হইবে না।

তাহা বাণীর অগোচর। অতএব 'অ' হইতে 'উ' পর্যন্ত যে ধারা, যাহাকে প্রবৃত্তিধারা বলা হইয়াছে তাহা শক্তির বহির্মুখ ধারা, কিন্তু ক্রিয়াশক্তির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বহির্মুখ ধারার অবসান হয় এবং ঐ সময় স্বভাবতঃই অন্তর্মুখ ধারার অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। প্রবৃত্তির ধারা এবার নিবৃত্তির ধারায় পরিণত হইল। তখন ঐসকল পৃথক্ পৃথক্ অবভাসমান শক্তি বা কলা অন্তর্মুখ স্পন্দনের ফলে একীভূত হইয়া সমষ্টিভাবাপন্ন হয়, যাহার নাম দেওয়া হয় বিন্দু। এই বিন্দু যাবতীয় কলার বা শক্তির একীভূত অবস্থার নামান্তর। বিন্দুর অভিব্যক্তি হইলে ইহা স্বভাবতঃই অনুত্তর অথবা 'অ'কারকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। কারণ, 'অ'কারই চিৎশক্তি বা অনুত্তর। উহাকে আশ্রয় করিয়াই অর্থাৎ উহার প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া সব কিছু প্রকাশিত হয়— 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'।

ইহারই নাম অংকার অর্থাৎ বিন্দুসংযুক্ত অনুত্তর। প্রথমে বহিঃস্পন্দনের বেগে যে আবির্ভাব হয় তাহা সন্মাত্র বা অব্যক্ত হইতে হইয়া থাকে। তাহার পর যে বহির্মুখ ধারার নির্গম হয় তাহা চিৎ বা 'অ'কার হইতে হইয়া থাকে। উহার অবসান 'ঔ'কারে, অর্থাৎ চিৎশক্তি হইতে ক্রিয়াশক্তি পর্যন্ত পঞ্চশক্তির আবির্ভাব সম্পূর্ণ হইল। এইবার অনুত্তর পঞ্চশক্তিসমন্বিত অর্থাৎ বিন্দুসংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। এইবার যে সৃষ্টি হইবে তাহা এই 'অং' হইতে, 'অ' হইতে নহে। প্রথম সৃষ্টি ছিল বৈন্দব সৃষ্টি। এইবার ঐ একবিন্দুই বিভক্ত হইয়া নিজেকে দুই বিন্দুতে পরিণত করে। ইহারই নামান্তর বিসর্গ—এখন যে সৃষ্টি হইবে তাহা বৈসর্গিক সৃষ্টি। এই বৈসর্গিক সৃষ্টি বস্তুতঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সৃষ্টি—তান্ত্রিক পরিভাষাতে ইহাই তত্ত্বসৃষ্টি। 'ক' হইতে 'হ' পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বিভিন্ন তত্ত্বের দ্যোতক। বলা বাহুল্য, এইগুলিও প্রতীক মাত্র। যখন এই তত্ত্বগুলি অভিব্যক্ত হইয়া তত্ত্বসৃষ্টির অবসান হয় তখন বুঝিতে হইবে হকার পর্যন্ত সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

বৈন্দব সৃষ্টির সময়ে যেমন কলা বা শক্তিগুলি বহির্মুখ বৃত্তির পর অন্তর্মুখগতিতে বিন্দুরূপ ধারণ করিয়া অকারে সংযুক্ত হইয়াছে, এই স্থলেও সেইরূপ 'অ'কার হইতে 'হ'কার পর্যন্ত সৃষ্টি প্রত্যাবর্তন ক্রমে 'অহং'ভাবে পর্যবসিত হইয়া থাকে। এইবার কলাসৃষ্টি ও তত্ত্বসৃষ্টির অবসানের ফলে অহংভাবের অভিব্যক্তি হইল। বলা বাহুল্য, ইহাই পূর্ণ অহং, কারণ ইহার প্রতিযোগী অন্য অহং আর নাই। সন্মাত্র অবস্থায় অহং নাই, ইহা বলা বাহুল্য। চিদানন্দ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ অবস্থাতেও অহং নাই এবং শক্তি বা কলাসৃষ্টি যেখানে সমাপ্ত হইয়াছে সেখানেও অহং নাই। তত্ত্বসৃষ্টি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে অহং-এর প্রথম অভিব্যক্তি। এই পূর্ণাহং-এর অন্তরালে সমস্ত তত্ত্ব রহিয়াছে,

সমস্ত শক্তিবর্গ রহিয়াছে—অর্থাৎ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ শক্তিবর্গ ও পরম অব্যক্ত গূঢ় সত্তাও রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই পূর্ণাহং পরম শিবাবস্থা, যাহার সঙ্গে অভিন্নভাবে পরমাশক্তি বিরাজ করিতেছে। আমরা যাহাকে সৃষ্টি বলি তাহা এই পরমশিব হইতেই হইয়া থাকে।

কিন্তু ইহার একটি সূক্ষ্ম অবস্থা আছে—একটি স্থূল অবস্থাও আছে। আমরা অনন্ত ভুবনরাজিকে বা সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি বলিয়া ধরিয়া থাকি—অহংভাব হইতে ইদংভাবের উদয় না হওয়া পর্যন্ত তাহা পাওয়া যায় না। যখন এই পূর্ণাহং হইতে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ ইদংভাবের প্রথম বিকাশ হয় তখনই বিশ্বসৃষ্টির সূচনা বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই ইদংভাবের আবির্ভাবের পূর্বে এক অহংই অনন্ত অহংরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা ঘটিয়া থাকে। ইহার পর ইদংভাবের স্ফুরণ হইলে সর্বপ্রথম সর্বশূন্যরূপ পরমাকাশের আবির্ভাব হয় এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া এই অনন্ত অহং দ্বিতীয়রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা ইদংসৃষ্টি। কিন্তু ইহা মহাসমষ্টিরূপ। এখনও কালের আবির্ভাব হয় নাই। কালের পূর্বাভাস মহাকালের মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং এই সৃষ্টিতেও প্রকৃত ক্রম নাই। একটা আন্তরক্রম আছে বটে—তাহা বস্তুতঃ ক্রম নহে; সুতরাং তখন অতীত অনাগত ও বর্তমান এই তিনকালের ক্রিয়া থাকে না, প্রচলিত কার্যকারণভাবও থাকে না। অনন্ত বৈচিত্র্য থাকে বটে, কিন্তু সকল সত্তার মধ্যেই সকল সত্তা অনুস্যূত থাকে। দেশগত ভেদও থাকে না, অথচ একটা ভেদের প্রতীতি প্রতিভাসমান হয় মাত্র। ইহার পর এই মহাসৃষ্টি হইতে খণ্ডসৃষ্টির আবির্ভাব হয়। সেইগুলি ঐশ্বরিক সৃষ্টি—তাহাতে কালগত, দেশগত, স্বরূপগত অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। সমষ্টি সৃষ্টি ও ব্যষ্টি সৃষ্টি ইহারই অন্তর্গত। মহাসমষ্টি সৃষ্টি ইহা হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্। মহাসমষ্টি সৃষ্টিতে সমষ্টি সৃষ্টির ন্যায় কর্ম-জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টি-প্রলয় প্রভৃতির ব্যাপার নাই।

এ পর্যন্ত যাহা বর্ণনা করা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে প্রচলিত ধারণা অনুসারে বিশ্বসৃষ্টি পরমশিব হইতেই হইয়া থাকে। ইহা যুক্তিযুক্ত ধারণা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরমশিব তত্ত্ব বুঝিতে হইলে তাহার অন্তরালবর্তী অবস্থাও বুঝা আবশ্যক। এই নিগূঢ় রহস্য মানবীয় ভাষার দ্বারা প্রকাশ্য নহে, তথাপি ভগবদুপদিষ্ট তন্ত্রশাস্ত্রের দৃষ্টি অনুসারে অতি সংক্ষেপে এই অন্তরাল অবস্থার একটা আভাস দিবার চেষ্টা করা হইল।

শক্তির জাগরণ

আমরা এতক্ষণ বিস্তারিতভাবে তান্ত্রিক সাধনার দৃষ্টিভঙ্গী বা পটভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। ইহা হইতে অন্ততঃ এইটুকু সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে তান্ত্রিক সাধনার মূল লক্ষ্য হইল পূর্ণত্বলাভ এবং এই পূর্ণত্বলাভের জন্য অপরিচ্ছিন্ন শক্তির সঙ্গে সর্বদা সংযোগ থাকা প্রয়োজন। শক্তির সংকোচের ফলেই জীবের অপূর্ণতা বা বন্ধন এবং শক্তির বিকাশেই তাহার পূর্ণতা বা মুক্তি। সদ্‌গুরু দীক্ষার মাধ্যমে জীবের এই প্রসুপ্তাশক্তিকে জাগাইয়া দেন—এ কথাও পূর্বে সদ্‌গুরুরহস্য ও দীক্ষারহস্যের আলোচনায় দেখান হইয়াছে। এখন এই শক্তির জাগরণ বলিতে কি বুঝায়, তাহার একটি সুস্পষ্ট ধারণা আবশ্যক এবং সেইজন্য তাহাই এখন আলোচনা করা যাইতেছে।

মনুষ্য জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এই প্রশ্ন মনুষ্যের জীবনে স্বাভাবিক জাগিয়া উঠে। মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপ কি ইহা জানিয়া সেই স্বরূপের উপলব্ধির চেষ্টা করা মনুষ্যের কর্তব্য। অনেকে মনে করেন, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিৎস্বরূপ আত্মা নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল বলা চলে। বিবেকজ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্য জড় হইতে অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে নিজেকে পৃথক্ বলিয়া চিনিতে পারে। এই স্বরূপটি দ্রষ্টার স্বরূপ। এইপ্রকারে নিজের স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইলে কর্মবীজ দগ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় দেহ থাকে না, অর্থাৎ দেহের বোধ পরিস্ফুটভাবে বিদ্যমান থাকে না—শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপ মাত্র স্বপ্রকাশ ভাবে বিদ্যমান থাকে। দেহবীজ দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে আর অভিনব দেহ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থাকে সাধারণতঃ বিদেহকৈবল্য নামে অভিহিত করা হয়। এই স্থিতিলাভের পর জন্মমৃত্যুর স্রোত হইতে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি পাওয়া যায়।

এইপ্রকার বিদেহ কৈবল্যলাভ মনুষ্যজীবনের পরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না, ইহাই অপর পক্ষের বক্তব্য। এই পক্ষের সমর্থক মনীষিগণ বলেন, মনুষ্য পরমেশ্বরের স্বভাববিশিষ্ট। জীব বস্তুতঃ শিব ভিন্ন অপর কেহ নহে। এই মতানুসারে মানুষ যতদিন পর্যন্ত অন্তর্নিহিত ভগবত্তাকে জাগাইতে না পারিবে ততদিন পর্যন্ত তাহার জীবনের উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য।

ভগবত্তা বলিতে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন শিবভাবকে বুঝিতে হইবে। শিব অর্থাৎ পরমেশ্বর লীলাপ্রসঙ্গে আপন স্বাতন্ত্র্যবলে নিজকে সংকুচিত করিয়া পশুভাব অর্থাৎ জীবভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব, এই সংকোচের ফলে পশু অবস্থায়, অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ষাড্‌গুণ্য পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি স্বরূপে সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা, বিভু, নিত্য ও আপ্তকাম হইলেও এই সংকোচের প্রভাবে অল্পজ্ঞ, অল্পকর্তা, পরিচ্ছিন্ন দেহ দ্বারা পরিমিত ও আয়ুবিশিষ্ট বলিয়া নির্দিষ্ট কালের অধীন এবং নানাপ্রকার বাসনারাশি দ্বারা কলঙ্কিত। জীব অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক। বিদেহ কৈবল্যে যদিও এই সীমাবদ্ধ গন্ডীভাব থাকে না, তথাপি অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানক্রিয়া শক্তির উন্মেষও হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল দিব্যগুণের পূর্ণবিকাশ না হইলে শুধু কৈবল্য লাভ করিলেই মনুষ্যের পূর্ণত্ব লাভ হইল, ইহা বলা চলে না। পূর্ণত্ব লাভের জন্য অপরিচ্ছিন্ন শক্তির নিত্য সংযোগ থাকা আবশ্যক। ভগবৎ শক্তি মূলে চিৎশক্তি ও আনন্দশক্তিরূপা হইলেও বস্তুতঃ ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ঐ মূল অব্যক্তশক্তিরই অভিব্যক্ত প্রকাশ মাত্র। ভগবানের অনন্ত শক্তি চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে প্রধানতঃ বিভক্ত। ইহার মধ্যে চিৎ ও আনন্দ তাঁহার স্বরূপের অন্তর্গত এবং ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও প্রমাতা-প্রমেয়ের সম্বন্ধ নিবন্ধন ইচ্ছাদিরূপে নিত্য সমবেত হইয়া বিরাজ করে। মূল শক্তি যে চিৎশক্তি তাহা বলাই বাহুল্য।

এই চিৎশক্তি মনুষ্যদেহে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম শক্তিরূপে বিরাজমান। আনন্দ এই চিতেরই স্বাভিমুখ বিশ্রাম মাত্র। স্বাতন্ত্র্যবশতঃ চিৎ যেমন আনন্দরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ আনন্দ বহির্মুখে উচ্ছলিত হইলে ক্রমশঃ ইচ্ছা, জ্ঞান ও সর্বান্তে ক্রিয়ারূপে পরিণতি লাভ করে। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, যাহাকে আমরা বর্ণমাতৃকা (letters of of alphabets) বলি তাহা এই সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবেরই শাব্দিক দ্যোতনা মাত্র। তদনুসারে 'অ' হইতেছে অনুত্তর বা চিৎশক্তি, আ—আনন্দশক্তি, ই—ইচ্ছাশক্তি, উ—উন্মেষ বা জ্ঞানশক্তি, এবং এ, ঐ, ও, ঔ—অস্ফুট, স্ফুট প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তি। ক্রিয়াশক্তির পর আর শক্তির বিস্তার হয় না। তখন উহা প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তরালবর্তী সকল শক্তিকে গুটাইয়া লইয়া সমষ্টিভাবে বিন্দু অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ বিন্দু অনুত্তর চিৎশক্তির সহিত যুক্ত হয়। বস্তুতঃ ইহা শিববিন্দু তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর ঐ বিন্দু নিজেকে বিভক্তবৎ করিয়া দুইটি বিন্দুরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। ইহাই বিন্দুর বিসর্গলীলা। এই বিসর্গলীলা প্রসঙ্গে তত্ত্ব ও ভুবনের সৃষ্টি হয় এবং শিববিন্দু বিসর্গের প্রভাবে হকার পর্যন্ত প্রসৃত হইয়া

অহংভাবের বিকাশ করে। ইহাই পূর্ণ অহন্তা। এই অহং-এর প্রতিযোগিরূপে ইদংভাবের বিকাশ তখনও হয় না। ইদংভাবই বিশ্বের প্রতীক। সর্বপ্রথম স্বাতন্ত্র্য প্রভাবে অহং হইতে পৃথক্ না হইয়াও পৃথক্‌ভাবে ইদং-এর প্রকাশ হয়। ইহাই মহাসমষ্টি সৃষ্টির পূর্বাভাস। ইদং-এর এই প্রথম রূপটিকে—মহাশূন্যেরও অতীত পরমশূন্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মহাসমষ্টি সৃষ্টি হইতে সমষ্টি এবং সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির উদয় ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত শূন্যের পর বুদ্ধি, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ক্রমশঃ সাজান রহিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়াই সৃষ্টির বহির্মুখী ধারা বহিয়া চলিয়াছে। বিষয়-সৃষ্টির মূলে প্রকৃতির সদৃশ-পরিণাম হইতে বিসদৃশ-পরিণামের উদ্ভব আছে জানিতে হইবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

দুই

পূর্বে যে চিৎশক্তি বা অনুত্তরের কথা বলা হইল, অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাই অকুল স্বরূপের আদিভূত কৌলিকী শক্তি। এই কুলশক্তি কুলকুণ্ডলিনী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা যে বিসর্গশক্তিরই সূক্ষ্মতম রূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিখিল বিশ্বের স্ফুরণ এই শক্তি হইতেই হইয়া থাকে। সৃষ্টি ভেদ, ভেদাভেদ এবং অভেদ এই তিন প্রকার। ভেদ সৃষ্টি স্থূল, ইহার নাম আণব বিসর্গ। ভেদাভেদ সৃষ্টি সূক্ষ্ম, ইহার নাম শাক্ত বিসর্গ। এবং অভেদ সৃষ্টি পরম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, ইহার নাম শাম্ভব বিসর্গ। এই তিনটির মধ্যে স্থূল বিসর্গটি সঙ্কুচিত জ্ঞানাত্মক চিৎএর বিসর্গ মাত্র। যে স্ফুরণে ভেদোন্মুখ অবস্থা জাগ্রত থাকে তাহাতে প্রমাতা প্রমেয় প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বই সৃষ্টির বিষয়রূপে প্রকাশ পায়। সূক্ষ্ম বিসর্গকে চিত্তের সংবোধ বলে। এই অবস্থায় চিত্ত নিজের নিষ্কল স্বরূপে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই অবস্থায় অখণ্ড প্রকাশের মধ্যে সমগ্র চরাচরের আহুতি হইতেছে এইরূপ মনে হয়। ইহাই শক্তির অবস্থা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিসর্গে চিত্ত থাকে না, উহা আনন্দাত্মক অভেদ অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্ত প্রলীন হইয়া যায় এবং সংবিৎ বা চৈতন্যমাত্র বিদ্যমান থাকে।

এই বিসর্গশক্তি অখণ্ড প্রকাশের পরাশক্তি নামে পরিচিত। ইহা পরপ্রমাতার সঙ্গে অভিন্নরূপে বর্তমান থাকে। অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ইহা ইচ্ছারূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। কামকলা বিজ্ঞানে ইহাকেই কামকলারূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কামকলার স্বরূপ তত্ত্বসৃষ্টির পূর্বাবস্থার কথা। এই ইচ্ছা যখন বাহিরের দিকে উন্মুখ হয় তখন ইহাকে বিসর্গ বলে। ইহার কারণ ক্ষোভ।

ক্ষোভের পূর্বাবস্থা 'অ', পরাবস্থা 'আ'। 'অ' চিৎশক্তি এবং 'আ' আনন্দশক্তি ধীরে ধীরে ক্রিয়া পর্যন্ত বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া এই বহিরুল্লাসে খেলা করিতে থাকে।

তিন

এই যে পরাশক্তি 'অ'এর কথা বলা হইল, ইহারই নামান্তর সপ্তদশী কলা অমা। ইহা নিত্যোদিত, কারণ ইহার তিরোধান কখনই হয় না, ইহাই অমৃতকলা। ইহাই অন্তঃকরণ প্রভৃতি ষোড়শকলার আপ্যায়ন করিয়া থাকে। বিসর্গ দুইটি। যেটি পর বিসর্গ—তাহাই আনন্দ বা 'আ' এবং যেটি অপর বিসর্গ—তাহাই 'হ'। এই দুইটি বিসর্গের স্ব-স্বরূপস্থ বা আত্মভূত দুইটি বিন্দু আছে। এই দুইটি বিন্দুর গতির দ্বারা অর্থাৎ দুইটি বিন্দু অবভাসন পূর্বক প্রসৃত হইয়া অমাকলা উল্লসিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'অ' তত্তৎরূপের অবভাসন পূর্বক ইচ্ছাপুরঃসর বহির্মুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় এই অমাকলা হইতে অভিন্ন। তথাপি অমাকলা তাহাদিগকে তত্তৎরূপে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ত প্রকাশরূপে প্রকাশিত করে।

এই অমাকলা যখন বিসর্গাত্মক হয় অর্থাৎ যখন ইহা বহির্মুখে থাকে না তখন ইহাকে শক্তিকুণ্ডলিনী বলা হয়। ইহা প্রসুপ্ত ভুজগাকার স্বাত্মমাত্রবিশ্রান্ত পরা সংবিৎ। বিসর্গের দুই প্রান্তে আছে দুইটি কুণ্ডলিনী। আদি কোটিতে যে কুণ্ডলিনী আছে তাহার নাম প্রাণকুণ্ডলিনী। কারণ, বহির্মুখে সংবিৎ এখানে প্রাণরূপেই প্রকাশিত হয়। অন্তিম কোটিতে যে কুণ্ডলিনী আছে তাহার নাম পরা কুণ্ডলিনী। ইহাই আত্মবিশ্রান্ত পরা সংবিৎ। ইহা অন্তরুন্মুখ। এই সপ্তদশী কলা শিব-ব্যোম, পরব্রহ্ম অথবা শুদ্ধাত্ম স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

যদি সংবিৎ ভিন্ন আর কিছু না থাকে তাহা হইলে পরাশক্তি কিসের সৃষ্টি বা সংহার করিয়া থাকেন ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা যে অবস্থার কথা বলিতেছি সেখানে মায়া, প্রকৃতি প্রভৃতি ভিন্ন উপাদানের কোন স্থান নাই। কারণ, আত্মা নিজ হইতে সৃষ্টি করেন, নিজের মধ্যেই করেন (কারণ, দেশ কালাদি তাহা হইতে ভিন্ন নহে) এবং নিজেকেই স্রষ্টব্য বিষয়রূপে বাহিরে নিক্ষিপ্ত করেন। যে কোন প্রমাতা বা প্রমেয় সৃষ্ট হউক্ না কেন, বস্তুতঃ সবই নিজস্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই স্বতন্ত্র পূর্ণ চৈতন্যশক্তি ক্রমশঃ 'অ' হইতে 'হ' পর্যন্ত স্ফুরিত হইয়া থাকে।

চার

মনুষ্যদেহে সুপ্তরূপে এই কুণ্ডলিনীশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সুপ্ত-শক্তি জাগ্রত হইয়া ক্রমশঃ ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হইতে থাকে। এই ক্রমিক উত্থানের কালে মনুষ্যের বিকাশের পরিপন্থী যাবতীয় বিকল্পজ্ঞান উপশম প্রাপ্ত হয়। চক্রের পর চক্র ভেদের ইহাই উদ্দেশ্য। কয়েকটি চক্রভেদ সম্পন্ন হইলে আত্মার তৃতীয় নেত্র মলশূন্য হইয়া স্বচ্ছ ও প্রসন্নরূপ ধারণ করে। বিকল্পসমূহের নিবৃত্তির ফলে নির্বিকল্পক স্বরূপ দর্শন আপনিই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ তখন জ্ঞাননেত্রের উন্মীলন হয় এবং শিবোহং রূপে আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়।

শিবরূপী আত্মা যখন সৃষ্টির আদিতে পশু সাজিয়াছিলেন তখন মাতৃকার সাহায্যেই নিজের স্বরূপ গোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতৃকাগুলি স্বভাবসিদ্ধরূপে 'অ' হইতে 'হ' পর্যন্ত উল্লসিত হয়। এই উল্লাসে কোন বৈষম্য থাকে না, ক্রম থাকে না, এবং বেগের মন্দতা বা তীব্রতাও থাকে না। ইহাই অহন্তারূপী মহাশক্তির প্রকাশ, যাহাতে সর্বশক্তির সমাবেশ রহিয়াছে। পশু সাজিবার সময় এই উল্লাস খণ্ড এবং বিষমভাবে হইয়া থাকে। সেইজন্য পশুগত অনন্তপ্রকার প্রকৃতির বিকাশ হয়। এই সব প্রকৃতিই পশুপ্রকৃতি। পশুস্থলে শিবভাব আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে পারতন্ত্র্য আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ শিব নিজ শক্তি দ্বারা ব্যামোহিত হইয়াই পশু সাজেন এবং পশুভাব ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই শিবভাবের উন্মেষ দেদীপ্যমান হয়। তন্ত্রে আছে—"শব্দরাশিসমুত্থস্য শক্তিবর্গস্য ভোগ্যতাম্। কলাবিলুপ্ত-বিভবো গতঃ সন্ সঃ পশুঃ স্মৃতঃ॥" ইহার তাৎপর্য এই—ভিন্ন ভিন্নরূপে স্ফুরণশীল অকারাদি নিজের অবয়বসমূহই কলাপদবাচ্য। আত্মার যে ঐশ্বর্য তাহার তাৎপর্য এই যে ইহাতে যাবতীয় বর্ণ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। পূর্বোক্ত কলার প্রভাবে বিষম স্ফুরণবশতঃ আত্মার এই স্বাভাবিক ঐশ্বর্য লুপ্ত হইয়া যায়। তখন এই আত্মা দৈন্য প্রাপ্ত হয় এবং নিজস্বরূপ হইতে সম্ভূত শক্তিবর্গের অধীন হইয়া পড়ে। পশু অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক।

কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইলে চিৎশক্তি নিজের সম্বিৎরূপ মাত্র প্রকাশ করে। ইহা অতি প্রবল অগ্নিস্বরূপ। ইহাকেই চিদগ্নি বলা হয়। গুরুকৃপা, ঈশ্বর-কৃপা, কালের পরিপাক, পুরুষকার অথবা অন্য কোন কারণে এই শক্তি জাগ্রত হইতে পারে। এই জাগরণের মূলে প্রাণ ও অপান শক্তির সাম্য স্থাপন বলিতে হইবে। প্রাণ ও অপান বলিতে এখানে যাবতীয় বিরুদ্ধ শক্তি বুঝিয়া লইতে হইবে। বিরুদ্ধ শক্তির সাম্যভাবের নামই সমান বায়ুর ক্রিয়ার ফলপ্রাপ্তি। এই সময় নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠে এবং সাধকের মন ও প্রাণ এই জাগ্রৎ

কুণ্ডলিনীরূপা অগ্নিশক্তির সহিত একীভূত হয়। এই একীভূত শক্তির দ্বারা দেহস্থিত ছয়টি চক্রের মধ্যে প্রত্যেকটি চক্রকে আয়ত্ত করিতে হয়। এই ছয়টি চক্র পঞ্চভূত ও চিত্তের প্রতীক। এই ছয়টি চক্রের ক্রিয়া হওয়া মানেই পঞ্চভূতের শোধন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত শোধন। পঞ্চভূত শুদ্ধ হইলে তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহার ফলে পঞ্চভূতের শুদ্ধি হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই ছয়টি চক্র ভৌতিক চৈত্য সংস্কারের বিকল্পজালের প্রসার ক্ষেত্র। এই চক্রগুলি জাগ্রৎ কুণ্ডলিনীরূপা চৈতন্যশক্তি দ্বারা আপূরিত করিতে হইবে। সৃষ্টিক্রমে বিন্দু, নাদ ও কলা অর্থাৎ মাতৃকা এই তিনটি স্তরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, প্রত্যেকটি দৈহিক চক্রই বহির্মুখে দেখিতে গেলে এক একটি কমলের আকার। ইহাতে কমলের দলরূপে মাতৃকা-বর্ণগুলি রশ্মির আকারে নিঃসৃত হইতেছে। ইহার পর একটা ব্যাপক ঢালা প্রকাশ ঊর্ধ্ববাক্‌রূপে নাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। সর্বাস্তে কমলের কর্ণিকা হইতে বিন্দুরূপে চক্রেশ্বর ও চক্রেশ্বরীর আসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

জাগ্রৎ চিৎশক্তি দেহ হইতে উত্থিত হইরা প্রত্যেকটি চক্রকে আক্রমণ করে। প্রথমে মূলাধার চক্রে এই আক্রমণ ঘটে। ইহার ফলে চক্রস্থিত চারিটি বর্ণ উক্ত চিদগ্নির প্রভাবে বিগলিত হইয়া প্রদক্ষিণ ক্রমে ধারা বহিতে থাকে। এই ধারা নিজ প্রভাবে পর পর চারিটি বর্ণকে জাগাইয়া এবং নিজের সহিত মিলিত করিয়া মধ্যবিন্দুর দিকে ক্ষিপ্র অথবা মন্দবেগে অগ্রসর হইতে থাকে। মধ্যবিন্দুতে প্রবিষ্ট হইলে নাদ উপসংহৃত হইয়া বিন্দুরূপে পরিণত হয়। প্রতি চক্রের বিন্দুটি অধঃ-ঊর্ধ্ববাহী মধ্যমার্গ বা শূন্য পথে বিরাজ করে। বর্ণ, নাদ ও বিন্দু প্রতি কমলেই বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথম কমলের বিন্দুটি সমস্ত কমল গ্রাস করিবার পর ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্ধ্ব আকর্ষণের ফলে উপরকার চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্বের ন্যায় উহার বর্ণ, নাদ ও বিন্দুকে গলাইয়া ও নিজের সঙ্গে একীভূত করিয়া পূর্ববৎ মধ্যনাড়ীর একীভূত বিন্দু পথে ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্ধ্ব আকর্ষণের ফলে ঊর্ধ্বদিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। পৃথক্ পৃথক্ বিন্দু তখন এক বিন্দুতেই পর্যবসিত হয়। এইভাবে ঐ বিন্দুও অন্য বিন্দুর সহিত অভিন্ন হইয়া জীবকল্যাণের জন্য ক্রমশঃ মধ্যনাড়ীর দিকে ধাবমান হয়। পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চচক্র ও মনোময় ষষ্ঠ চক্র বিধ্বস্ত হইয়া যায়। পঞ্চভূত ও যোগীর চিত্ত শুদ্ধ হইয়া নির্বিকল্প স্বচ্ছ প্রজ্ঞাতে ডুবিয়া যায়। তাহার পর আজ্ঞা চক্রের ঊর্ধ্বে দিব্যজ্ঞানের কেন্দ্র উন্মুক্ত হয়। ইহা বস্তুতঃ কুন্ডলিনীশক্তিরই উন্মেষপ্রাপ্ত অবস্থা।

ষট্‌চক্রভেদের পর ভ্রূমধ্যে নিম্নদেশ হইতে যাবতীয় বিকল্প তিরোহিত হইতে থাকে। তখন ললাটপ্রদেশে দেহাভিমান বর্জিত হইয়া পরম জ্যোতির অনুভবের

শক্তি জন্মে, এবং প্রতিদিন ঐ মহাজ্যোতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অন্তরতম ভাবে মহাশূন্যের মধ্যে সহস্রদল কমলের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রূমধ্যস্থ বিন্দু হইতে সহস্রারের মহাবিন্দু পর্যন্ত অনেকগুলি স্তর আছে। এই সকল স্তর ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া মহাশক্তি মহাবিন্দুস্থ পরম শিবকে আলিঙ্গন করেন। সুদীর্ঘকালের বিরহের পর শিবশক্তির এই মহামিলন সংঘটিত হয়। তখন কুণ্ডলিনীশক্তি কুণ্ডলভাব ত্যাগ করিয়া দণ্ডরূপ ধারণ করেন এবং অন্তে মহাবিন্দুতে পরমশিবের সহিত সামরস্য লাভ করেন। এই মিলনের ফলে যে অমৃতধারা নিঃসৃত হয় সেই সুশীতল ধারাতে মন ও প্রাণ অভিষিক্ত হয় ও ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সেই ধারা পান করিতে থাকে। সমান বায়ুর ক্রিয়ার পর উদান বায়ুর ক্রিয়ানিবন্ধন কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতি নিষ্পন্ন হয়। এই ঊর্ধ্বগতি বস্তুতঃ সহস্রারে পরিসমাপ্ত না হইয়া—ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ইহার পর আর ঊর্ধ্বগতি থাকে না। তখন ব্যান-শক্তির প্রভাবে নিজের খণ্ডসত্তা অনন্ত ব্যাপকরূপ ধারণ করে। ইহাই সংক্ষিপ্তভাবে আত্মার নিজস্বরূপে ফিরিয়া যাওয়ার ইতিহাস। বিশ্বপিতা, বিশ্বমাতা এবং সন্তান তখন একই মহাসত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহাই পরিপূর্ণ অদ্বৈত স্থিতি এবং নিজের পূর্ণতা লাভ।

কুণ্ডলিনী না জাগিলে এই মহাপথে চলা সম্ভবপর হয় না, পরম লক্ষ্যের প্রাপ্তি ত দূরের কথা। মনুষ্যজীবনের ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। শুধু খণ্ড কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যুর আবর্ত হইতে ঊর্ধ্বে স্থান লাভ মানুষের লক্ষ্য প্রাপ্তি নহে। নিজের সুপ্ত ভগবত্তা পূর্ণভাবে জাগিয়া না উঠা পর্যন্ত মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সফলতা কোথায়? কুণ্ডলিনী না জাগিলে চিৎ ও অচিতের দ্বন্দ্বভাব কাটিতে পারে না। বিবেক জ্ঞানপথে আরূঢ় হইবার একটি সোপান মাত্র, শক্তির সাধনা ব্যতীত শিবভাবের প্রাপ্তি দুর্ঘট এবং কুণ্ডলিনীর জাগরণ ব্যতীত শক্তি-সাধনার কোন অঙ্গই বশীভূত হয় না। পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব

বহুদিন হইতে বিদ্বৎ-সমাজে, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক সমালোচনাপ্রিয় পণ্ডিত-মণ্ডলীতে, একটি সংশয় জাগরূক রহিয়াছে। নানা গ্রন্থে নানাপ্রকার আলোচনাও হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সব আলোচনায় সমস্যার সমাধান হয় নাই। এমন কি মনে হয় অনেক স্থলে সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সেই সংশয়টির উত্থাপন করিয়া, তাহার সমাধানের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি যথাসম্ভব সন্তর্পণে প্রয়োগ করিব। বিষয়টি সাধনা-জগতের একটি গভীর রহস্য। ভাষার সাহায্যে এই সকল বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা হইতে পারে না। তথাপি কিছুমাত্র আলোচনা না করিলে একটি ভ্রান্ত ধারণার স্থায়িত্বের অবকাশ দেওয়া হয়। সেইজন্য যথাশক্তি স্পষ্টভাবে নিজের অনুভূতি এবং শ্রীগুরুদেবের "মৌন ব্যাখ্যান" অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণপূর্বক এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। সহস্র বৎসর পূর্বে কাশ্মীর-প্রদেশের উপত্যকা-ভূমিতে বোধচক্ষুঃ শ্রীতাৎপর্যাচার্যদেব "সংবিদেব হি ভগবতী বস্তূপগমে নঃ শরণম্" বলিয়া যাঁহার জয়ঘোষণা করিয়াছিলেন, বর্তমান ক্ষেত্রেও সেই ভগবতী সংবিদ্দেবীই বস্তুনির্দেশের পথ-প্রদর্শক। যাঁহারা অনুভবরসিক, তাঁহারা শব্দমোহ পরিত্যাগপূর্বক তত্ত্বাংশের দিকে লক্ষ্য করুন, ইহাই প্রার্থনা।

আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ সকলেই একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, মুক্তিই পরম পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ ও কাম পুরুষার্থ হইলেও তাহা অপর অথবা নিকৃষ্ট, তাহা 'পরম পুরুষার্থ'রূপে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। আপাততঃ আমরা প্রেমের স্বরূপ-নির্বচন অথবা তাহার পুরুষার্থত্বনির্ণয় সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। পঞ্চম পুরুষার্থবাদী সম্প্রদায় বহু প্রাচীনকাল হইতেই বর্তমান আছে—একথা অন্যত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হইতে পারে না—যাঁহারা ভক্তিবাদী তাঁহাদিগকেও কোন না কোন প্রকারে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। যাহা হউক্, জ্ঞান অথবা ভক্তি যাহাকেই সাক্ষাদ্‌ভাবে মুক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করা যাক্, তাহা কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, ইহাই প্রশ্ন। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি হঠমার্গ-প্রবর্তক নাথাচার্যগণ এবং আগম

বিদ্‌গণ বলেন যে, মূলাধারে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ না করিলে কর্ম, জ্ঞান কিংবা ভক্তি কোনটিই মুক্তি বা অনর্থনিবৃত্তির উপায়রূপে পরিণত হইতে পারে না। যে কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তি কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণের সহায়তা করে, তাহাই যথার্থ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি,—তাহাই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। তদ্ভিন্ন কর্মাদি ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র। তাহা কখনই সিদ্ধিদায়ক হয় না। কুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গ ব্যতীত আত্মা অথবা পরমাত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর নহে।

এখানে প্রশ্ন এই: কুণ্ডলিনীবাদ নবীন বাদবিশেষ অথবা ইহা নিত্য সত্য? আপাততঃ মনে হয়, এই তত্ত্ব ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে কালবিশেষে কারণবশতঃ স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু মূলতঃ ইহা বৈদিক-সিদ্ধান্ত নহে, এবং বেদানুকূল দর্শন-শাস্ত্রে ইহা পরিগৃহীত হয় নাই। এমন কি পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রে কুণ্ডলিনী কিংবা ষট্‌চক্রাদির কোন উল্লেখ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ও জৈনাদির গ্রন্থেও কুণ্ডলিনীর কোন আলোচনা নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা তন্ত্রের নিজস্ব, কেহ বলেন, ইহা এবং এতৎসম্পর্কীয় বর্ণোপাসনাপ্রণালী ভারতের বহির্দেশ হইতে (সম্ভবতঃ মগ দেশ হইতে) সমাগত। ভারতবর্ষে হঠযোগ এবং অক্ষর-উপাসনা লইয়া যখন একটা নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তখনই ইহার প্রাধান্য স্থাপিত হয়। আবার কেহ মনে করেন, এই কুণ্ডলিনীযোগ উপায়বিশেষ—ইহা অবলম্বন না করিয়া, উপায়ান্তর দ্বারাও মোক্ষলাভ সম্ভবপর।

এইপ্রকার নানারূপ সংশয়ের অবতারণা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই সকল সংশয় কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানাভাবের ফলমাত্র।[১] শুধু "বাগ্‌ বৈখরী শব্দঝরী"র দিকে লক্ষ্য করিয়া তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের দিকে উদাসীন থাকিলে এইপ্রকার বৃথা সন্দেহ উদিত হয়। সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস যে এইপ্রকার গ্রন্থমূলক বৈকল্পিক জ্ঞান হইতেই আমাদের মধ্যে যাবতীয় মতবৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

১ 'The Six Centres and the Serpent Power' নামক গ্রন্থে Arthur Avalon বলিয়াছেন—"But whereas the Jnana Yogi attains Svarupa Jnana by his mental efforts *without rousing* Kundalini, the Hatha Yogi gets this Jnana through Kundalini Herself" (p. 201). 'জ্ঞানযোগী' শ্রবণ মননাদি যে কোন উপায় অবলম্বন করুন্‌ না কেন, কুণ্ডলিনী চৈতন্য না করিলে স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন না। ইহা ধ্রুব সত্য।

কুণ্ডলিনী-চৈতন্য কিছু নূতন জিনিষ নহে। কুণ্ডলিনী কি? তাহার চৈতন্যসম্পাদন কি?—তাহা না বুঝিলে তৎসম্পর্কে কোন আলোচনাই ফলপ্রদ হইবে না। কুণ্ডলিনীর অপর নাম আধারশক্তি—যে শক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় দিয়া সকল পদার্থের মূলসত্তারূপে বর্তমান রহিয়াছে। ইহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলে ইহা নিরাধার হইয়া যায়। যখন কুণ্ডলিনী নিরাধার, তখন জগতের সকল বস্তুই নিরাধার। কুণ্ডলিনী যখন চৈতন্যময় হইয়া যায়, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই চৈতন্যময় রূপ ধারণ করে। সুতরাং যাহাকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলা হয়, তাহাও "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিনির্দিষ্ট সর্বত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মময়তা অনুভবের সাধনা একই বস্তু। এই জাগরণ ক্রমশঃ হয়। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি এই জাগরণেরই অবস্থাভেদ মাত্র। যখন জাগরণ সম্পূর্ণ হয়, যখন নিদ্রা আর লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না, তখনই পরিপূর্ণ অদ্বৈত-সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার পূর্বে দ্বৈতস্ফূর্তি অবশ্যম্ভাবী। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকেই পূর্ণাহন্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

দুই

মূল বস্তুটি পরম সাম্যাবস্থাস্বরূপ। উপনিষৎ ইহার স্বরূপনির্দেশ প্রসঙ্গে "পরমং সাম্যম্", এই পদই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে নানারূপ কল্পনা চলে না, ইহার চিন্তা নাই, বর্ণনা নাই—ইহা অবাঙ্মনসগোচর। আবার যাবতীয় নামরূপ চিন্তা ও বর্ণনার—এক কথায় সমগ্র বিশ্বের—ইহাই মূল। ইহাকে তত্ত্ব ও তত্ত্বাতীত উভয়ই বলা হইয়াছে। ইহা বিশ্বাত্মক (immanent) হইয়াও বিশ্বাতীত (transcendent)। ইহাই উপনিষদের "পূর্ণ" (The Absolute)। কেহ যেন মনে না করেন, এই বিশ্বাত্মক দিক্‌টা মিথ্যা, বিশ্বাতীতই সত্য। লক্ষ্যভেদ বশতঃ জীব পরম পদার্থের যে কোন দিকে স্থিতি নিতে পারে। বস্তু যখন অভিন্ন অথচ স্বপ্রকাশ তখন যে কোন দিকে স্থিতি নিলে উভয় দিক্‌ই যে সমভাবে খুলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই যে বিশ্বের দিক্—ইহাই 'অপর' সাম্য। ইহাই বিন্দু—মহাবিন্দু। এখানে শিব ও শক্তি, ব্রহ্ম ও মায়া, পুরুষও প্রকৃতি সমরস—একাকার। ইহা নিত্য অবস্থা। এখানে অনন্ত বৈচিত্র্য রহিয়াছে—অথচ সব একাকার।

যখন এই সাম্যভঙ্গ হয় অর্থাৎ স্তরানুসারে বিশ্বের আবির্ভাব হয়, তখন এই বিন্দুই শক্ত্যংশে পরিণাম লাভ করে এবং শিবাংশে সাক্ষী থাকে। সাক্ষী অপরিণামী ও একই, কিন্তু শক্তি ক্রমশঃ স্তরে স্তরে প্রসারিত হইতে থাকে। সাক্ষী কেন্দ্রস্থ, মূল শক্তিও তাই—উভয়ই একভাবাপন্ন। তবে শক্তির প্রসারণ

ও সংকোচ, এই দুইটি অবস্থা আছে। সাক্ষীর তাহা নাই—সাক্ষী সকল অবস্থার নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র, অর্থাৎ ইহা যেমন কেন্দ্রস্থ আত্মভাবাপন্ন মূল কিংবা সাম্যময়ী শক্তির দ্রষ্টা, তেমনই প্রসারণ ও সংকোচ নামক অবস্থাদ্বয়েরও দ্রষ্টা। সাক্ষী বিশ্বাতীত, সুতরাং নিত্যই কালচক্রের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, অথচ ইহা কালচক্রের নাভিস্বরূপ। শক্তির প্রসারকে সৃষ্টি বলে, সংকোচনকে সংহার বলে। প্রসার ও সংকোচ উভয়েরই আদি ও অন্ত সাম্যাবস্থা। মধ্যে বৈষম্য কিংবা কালচক্রের আবর্তন। কিন্তু বৈষম্যেরও অন্তস্তলে সাম্যাবস্থা নিহিত রহিয়াছে।

সৃষ্টি ও সংহার, অর্থাৎ প্রসার ও সংকোচ, শক্তির স্বভাব—স্বধর্ম, সুতরাং অনপায়ী। ইহা নিয়তই হইতেছে। এই বহির্গতি ও অন্তর্গতি, অধোগতি ও ঊর্ধ্বগতি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সম্মিলিতভাবে বৃত্তরূপে কল্পিত হয় এবং কালচক্র নামে অভিহিত হয়।

প্রদীপ হইতে যেমন প্রভা নির্গত হয়, জলাশয়ে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে সেখান হইতে যেমন চারিদিকে মণ্ডল রচিত হয়, বিন্দুও সেইভাবে প্রসারিত হয়। ক্রমবর্ধমান—কিন্তু বৃদ্ধির সীমা আছে। কারণ, সৃষ্টির প্রসৃতি অনন্ত হইতে পারে না—উহা প্রেরণার তীব্রতাসাপেক্ষ। আমরা পূর্বেই সংকোচ ও প্রসার এই দুইটি ধর্মের উল্লেখ করিয়াছি। প্রসারশক্তি যতই ক্ষীণ হইয়া আসে সংকোচশক্তি ততই পুষ্ট হইতে থাকে। সংকোচশক্তির ক্ষয়ে প্রসারের পুষ্টিও সেইপ্রকার বুঝিতে হইবে। সংকোচ ও প্রসারশক্তি ক্রমশঃ একটির পর অপরটি প্রাকট্য লাভ করে, ইহাই কালচক্রের আবর্তন—ঊর্ধ্বতম স্তর হইতে সর্বনিম্নভূমি পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব এই চক্রে আবর্তিত হইতেছে। বিন্দুকে কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া এই চক্রের আবর্তন হইতেছে। এইভাবে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ মধ্যস্থ বিন্দুকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।[২] বিন্দু অপরিবর্তনশীল, সাক্ষী, উদাসীন।

বিন্দুরূপা সাম্যশক্তি যখন বিভক্ত হইয়া ব্যাকৃতরূপ ধারণ করে, তখন উহা তিনটি স্বতন্ত্র বিন্দুরূপে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, সাক্ষীর সহিত অভেদ-ভাবাপন্ন তুরীয় বিন্দু তখনও অবিকৃতই থাকে। সাম্যাবস্থায় ঐ তুরীয়

২ ইহাকে সাংখ্যদর্শনে পরিণাম (সদৃশ ও বিসদৃশ, অনুলোম ও বিলোম) বলে। বৈদিক সাহিত্যে ইহারই নাম সংবৎসর চক্র—অথবা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গতি। উত্তরায়ণ বা ঊর্ধ্বগতিকে দেবযান এবং দক্ষিণায়ন বা অধোগতিকে পিতৃযান বলে। যাঁহারা তন্ত্রের ষোড়শনিত্যার আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এই সৃষ্টি-সংহারই শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ-রূপে মাসচক্র। চন্দ্রের ষোড়শীকলা অমৃতস্বরূপা ও বিন্দুস্বরূপ।

বিন্দুর সহিত অপর বিন্দুত্রয়ের কোনই ভেদ নাই ; কিন্তু বৈষম্যকালে মূল বিন্দু হইতে তিনটি বিন্দুই পৃথগ্‌ভাবে প্রকটিত হয়। বিন্দুর প্রাকট্যে রেখার সৃষ্টি, ইহা রেখাগণিতের সিদ্ধান্ত। বিন্দু কম্পিত বা স্পন্দিত হইলেই রেখা উৎপন্ন হয়। সংকল্পই কম্পনের হেতু, সুতরাং সংকল্প যেখানে বিকল্প-রহিত অর্থাৎ দ্বিতীয় সংকল্প-রহিত—যাহাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় সত্যসংকল্প বলা হয়—সেখানে রেখাও অখণ্ড, অনবচ্ছিন্ন, অবাধিত। রেখা চারিদিকে সমভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া, মণ্ডলাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রথম মণ্ডলটি সহস্রার নামে পরিচিত। বিন্দুটি ব্রহ্মবিন্দু বা আদিসূর্য, সহস্র রেখাই সহস্র অংশু বা চারিদিকে প্রসারিত সহস্ররশ্মি। এই জ্যোতির্ময় লোক ব্রহ্মলোক প্রভৃতি নানা নামে, ভাবভেদবশতঃ বিভিন্নভাবে, সর্বশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বময় রাজ্য।

এই জ্যোতির্মণ্ডলের বাহিরে দ্বিতীয় বিন্দুর মণ্ডল। আমরা ইহাকে তটস্থ, মধ্যস্থ কিংবা উদাসীনমণ্ডল নাম দিব। ইহার কেন্দ্র 'রজঃ' নামক দ্বিতীয় বিন্দু। 'রজঃ' শব্দের অর্থ কণা বা অণু। প্রথম স্তর অখণ্ড জ্যোতির্ময় ধাম। প্রসারণশক্তি যখন যে স্তরের চরম সীমা—জ্যোতিরেখার অন্ত্যবিন্দু ছাড়াইয়া বাহির হয়, তখন তাহারই প্রেরণায় ঐ জ্যোতিরাশি হইতে কণাসকল বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এইসকল কণা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতন অখণ্ড সত্ত্বের অংশ। অখণ্ড সত্ত্বের ন্যায় এই সমস্ত খণ্ড সত্ত্বও যে জ্যোতির্ময়, চৈতন্যময়, তাহা বলা বাহুল্য। পাঞ্চরাত্রগণ ও ভাগবতসম্প্রদায় এই সকল কণাকে 'চিৎকণ' নাম দিয়াছেন।[৩] শৈবাচার্যগণের পরিভাষা অনুসারে ইহাদের নাম 'বিজ্ঞানাকল'। ইহাই বিশুদ্ধ জীবভাব। ইহার ঊর্ধ্বে, সহস্রারের প্রান্তভূমি হইতে, শিবভাব বা ঈশ্বরভাব আরব্ধ হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও এই তটস্থমণ্ডলকেই 'সনাতন জীবলোক' বলা হইয়াছে—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'। এইসব নিত্য জীব অনন্ত শূন্যগর্ভে নৈশাকাশ-বিহারী উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে। কেহ কেহ আপন উপাধি নিরুদ্ধ করিয়া কৈবল্যপদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাদের স্বরূপ মূল সাক্ষীর সহিত অভিন্ন, উপাধি নিত্য হইলেও অব্যক্ত—সুতরাং এই সকল কেবলীদিগকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রথম মণ্ডলের পরেই মহাশূন্য, তন্মধ্যেই বিশুদ্ধ জীববিন্দুর স্থিতি।

---

৩ "ত্রসরেণুপ্রমাণাস্তে রশ্মিকোটিবিভূষিতা"—পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদিতে মুক্ত পুরুষের এইপ্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিতেছি। সাক্ষীর দৃষ্টিক্ষেত্র যাহা, তাহাই আকাশ। সাম্যাবস্থার কথা কিংবা মহাপ্রলয়ের কথা আলোচনা করিব না। কিন্তু প্রথম বিন্দুর প্রসারক্ষেত্র চিদাকাশ। ইহাকে 'পরব্যোম' শব্দেও কোন কোন স্থানে নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিন্দুর প্রসারক্ষেত্রই চিত্তাকাশ—যাহার মধ্যে খদ্যোতমালার ন্যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-পঙ্‌ক্তি ভাসমান রহিয়াছে।

এই দ্বিতীয় মণ্ডলের বাহিরে গভীর অন্ধকারময় তৃতীয় মণ্ডল। ইহা অখণ্ড তমোময় এবং বিভক্ত তৃতীয় বিন্দুর প্রসারণ হইতে উদ্ভূত। ইহাকে ভূতাকাশ বলিতে পারা যায়। ইহাই মায়া বা আবরণ। বৈষ্ণবগণ এই স্তরকে বহিরঙ্গ নাম দিয়াছেন। যে প্রসারণশক্তি বিশুদ্ধ জীবভাব পর্যন্ত অভিব্যঞ্জনা করিয়াছে, তাহা তখনও ক্রিয়াশীল বলিয়া জীবরূপ বিন্দু প্রসৃত হইতে হইতে রশ্মিরূপে এই অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করে। এই ভূতাবরণ পঞ্চভাগে বিভক্ত বলিয়া তটস্থবিন্দু ব্যাকৃত অবস্থায় পঞ্চবিন্দুরূপে বিভক্ত হইয়া প্রসারণের ফলে পঞ্চ মণ্ডলরূপে পরিণাম লাভ করে। ইহারই পারিভাষিক নাম বিশুদ্ধাদি পঞ্চ চক্র। তটস্থ বিন্দু হইতে যে মণ্ডলের বিকাশ হয়, তাহার নাম আজ্ঞা চক্র। তাহার ঊর্ধ্বেই সহস্রার চক্র। মূলাধার বা সর্বনিম্ন চক্রই ঘোর অন্ধকারের কেন্দ্রস্থল।

মূলাধার বিন্দু হইতে বহির্গত হইলেই জীব-কণা বা সুষুম্নাবাহী জীবরশ্মি স্থূল পঞ্চীকৃত ভূতময়-আবরণে বেষ্টিত হইয়া পড়ে। এই স্তরেই স্থূল জগতের জীব গঠিত হইয়া অবস্থিত থাকে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার স্থূল বস্তু ছিল, আছে এবং হইবে সে সমুদায়ের বীজ এই স্তরে চিরবর্তমান। মহা-প্রলয়ের সময় এই পঞ্চীকৃত স্তর স্বভাবের নিয়মে অপঞ্চীকৃত হইয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয় এবং বিশুদ্ধাদি চক্রে বিলীন হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা প্রসারশক্তির ক্রিয়াবসানে সংকোচশক্তির উন্মেষ হইলে হইয়া থাকে। সংকোচশক্তির ক্রিয়া যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ততই পঞ্চচক্র ক্রমশঃ উপসংহৃত হইয়া পঞ্চবিন্দুরূপ ধারণ করে, এবং পঞ্চবিন্দু পরে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। আজ্ঞামণ্ডল অথবা তটস্থ চিৎপরমাণুপুঞ্জও এইপ্রকারে উপসংহৃত হয়। সহস্রার মণ্ডলও মূল সত্ত্ববিন্দুতে আকুঞ্চিত হইয়া যায়। তদনন্তর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন বিন্দু বা মূলত্রিকোণরূপা মহাশক্তির তিন কোণ—যাহা ত্রিবৃৎকরণ প্রণালীতে অভিব্যক্ত হইয়াছিল—বৈষম্য পরিত্যাগপূর্বক অন্তঃস্থ মহাবিন্দুতে সাম্যভাবে অবস্থান করে। এই মহাবিন্দুই বৈষ্ণবগণের মহাবিষ্ণু, ত্রিক মতাবলম্বী শৈবাচার্য এবং শাক্তাগমবিদ্‌গণের সদাশিব। বেদান্তে ইহাকে তুরীয় বলে,—ইহা সামরস্য অবস্থা। এখানে সাক্ষী ও সাম্যশক্তি একাকার—অদ্বৈতভাবাপন্ন। এখানে

দেশ নাই, কাল নাই, কলা নাই, মন নাই—এমন কি উন্মনীশক্তি পর্যন্ত এখানে নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে। ইহার উপরেও অবস্থা আছে। কেহ কেহ তাহাকে তুর্যাতীত নাম দিয়াছেন। শৈব এবং শাক্তগণের শিব-শক্তি বা কামেশ্বর-কামেশ্বরী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রাধা-কৃষ্ণ এই মহাবিন্দুর ঊর্ধ্বে অবস্থিত।[৪]

পঞ্চীকরণ অথবা স্থূল জগৎ বা বীজসৃষ্টি সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। বিশুদ্ধাদি পঞ্চবিন্দু হইতে রশ্মি বিকীর্ণ হয়—ইহাই পঞ্চ তন্মাত্রাচক্র। রশ্মি বিকীর্ণ হইলেই পরস্পর মিশ্রণ হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রথম বিন্দু হইতে নির্গত রশ্মিজাল দ্বিতীয়াদি চারিটি বিন্দু হইতে নির্গত রশ্মিসহ একত্র হয়, মিশ্রিত হয়। এইপ্রকারে শব্দতন্মাত্রা স্পর্শাদি চতুর্বিধ তন্মাত্রাসহ মিশ্রিত হইয়া প্রথম চক্রকে আকাশমণ্ডলরূপে পরিণত করে। এই আকাশ স্থূলাকাশ, যাহাতে শব্দাংশের প্রাধান্য থাকিলেও স্পর্শাদি তন্মাত্রার মিশ্রণ আছে। এইরূপে দ্বিতীয় বিন্দু হইতে রশ্মি বহির্গত হইয়া অন্যান্য স্তরের রশ্মির সহিত মিশ্রিত হইয়া স্থূল বায়ুমণ্ডল রচিত হয়। ইহা দ্বিতীয় অধস্তন বিন্দুর চক্র—সুতরাং আকাশমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রণালীতে স্থূল তৈজস মণ্ডল এবং ভূমণ্ডল রচিত হইয়া ক্রমশঃ অভ্যন্তরে স্থিতি লাভ করে। স্থূলতম ভূমণ্ডল মধ্য স্থলে—অর্থাৎ নিম্নভূমিতে—অবস্থিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ভূমণ্ডল বলিতে কেহ যেন এই পৃথিবীমাত্রকে না বুঝেন। এই পৃথিবী এবং অনন্ত পৃথিবী—শুধু তাহাই নহে, যাহা কিছু পার্থিব বা পৃথ্বীবহুল পঞ্চীকৃত বস্তু,—সবই এই ভূমণ্ডল বা ভূলোকের অন্তর্গত। অন্যান্য মণ্ডল সম্বন্ধেও এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। পঞ্চীকরণ কালে পঞ্চতন্মাত্রার মিশ্রণের তারতম্যনিবন্ধন অনন্তপ্রকার স্থূল কণা বা অণু (যাহাকে

৪ দ্বারকা, মথুরা এবং বৃন্দাবন—এই শ্রীধামত্রয় মহাবিন্দুর পরপারে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা আমরা 'নিত্যলীলাতত্ত্বে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে সময়ান্তরে করিব। চিদ্ঘন সদাশিবতত্ত্ব ভেদ না করিলে অর্থাৎ আচার্য শঙ্কর প্রদর্শিত নির্গুণ অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, লীলামধ্যে প্রবেশ লাভ হয় না। শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ সত্ত্বমণ্ডলের বাহিরে যাইতে—ঈশ্বরতত্ত্ব ভেদ করিতে—পারেন নাই। যদিও তাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাকে অপ্রাকৃত ও মিশ্রসত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তথাপি তাহাকে জড়রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ ইহাকে অজড় বলিলেও রামানুজ সম্প্রদায়ের বহু আচার্যই ইহার জড়ত্ব বা অচিত্ত্বই অঙ্গীকার করিয়াছেন। মহাযানী বৌদ্ধগণ ইহাকে বজ্রধাতু বলিতেন। তাঁহাদের সুখাবতী এবং অন্যান্য নিত্যধাম এই উপাদানে গঠিত। যাহা হউক, বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে বর্তমান যুগে একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই এই সত্ত্বমণ্ডলও অতিক্রম করিয়াছেন।

পূর্বে 'বীজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি) উৎপন্ন হইয়াছে। এক একটি মণ্ডলে এক একটি ভাবের প্রাধান্য থাকে বলিয়া এই পরমাণুকে পঞ্চভাগে বিভাগ করা হইয়া থাকে।[৫] কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভূলোকে যদিও সব পরমাণুই পার্থিব তথাপি একটি পৃথিবীপরমাণুর সহিত অপর একটি পৃথিবীপরমাণুর বৈলক্ষণ্য আছে। যোগিগণ বিবেকজজ্ঞান দ্বারা সে বৈষম্য গ্রহণ করিতে পারেন।[৬] যেমন পার্থিব পরমাণুর মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, সেইপ্রকার অন্যান্য পরমাণুর মধ্যেও আছে।

৫ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ আকাশের পরমাণু স্বীকার করেন না। অন্যান্য দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ করেন, কেহ করেন না। মূলতঃ ভূত ৪ প্রকার কিংবা ৫ প্রকার, এবং ৫ প্রকার হইলেও আকাশ আণবিক সংঘাত বিশেষ অথবা বিভু পদার্থ, এখানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নহে। শুধু তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে—আপাতপ্রতীয়মান মতবৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাব বর্তমান আছে। যোগবার্তিকে (৩।৪০) বিজ্ঞান ভিক্ষু এইজন্য কারণ ও কার্যভেদে আকাশের দ্বিবিধত্ব অংগীকার করিয়াছেন। তাঁহার কারণাকাশ এবং আমাদের পূর্বর্বর্ণিত তমোমণ্ডল বা আবরণশক্তি একই বস্তু। তিনি যাহাকে 'মহাভূতাকাশ' বলিয়াছেন তাহা যে অণ্বাত্মক তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা স্বরশোধনপ্রক্রিয়া অবগত আছেন, তাঁহারা এই আকাশাণুকে দেখিতে পান। সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধগণ আকাশকে অসংস্কৃত ধর্মমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন, এবং ইহাকে আবরণাভাব অথবা অবকাশাত্মক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহা নিত্য ও বিভু; ইহা অন্য পদার্থের বাধক নহে এবং অন্য পদার্থ দ্বারা বাধিতও হয় না—ইহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। ইহা "নীরূপ" স্বপ্রকাশ বস্তু। বসুবন্ধু বলেন—যদি আবরণাভাব ইহার স্বভাব না হইত, তাহা হইলে কোন বস্তুর ক্রিয়াই সম্ভবপর হইত না। বলা বাহুল্য, ইহা আমাদের পূর্বোক্ত সাম্যশক্তিস্বরূপ। স্থবিরবাদী বৌদ্ধগণ আকাশকে সংস্কৃতধর্মজন্য পদার্থ-মধ্যে গণনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর কার্যাকাশ এবং আমাদের বিশুদ্ধ চক্রের সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।

৬ বৈশেষিকাচার্যগণ প্রতি পার্থিব পরমাণুতে দ্বিবিধ বিশেষ স্বীকার করিয়াছেন—একটি "পাকজবিশেষ" এবং অপরটি "অন্ত্যবিশেষ"। অন্ত্যবিশেষ অন্যান্য পরমাণুতেও থাকে। এই পাকজবিশেষ যতদিন পার্থিব পরমাণু আছে ততদিন থাকে—অন্ত্যবিশেষও তাই। অবান্তর প্রলয়েও পাকজবিশেষ বর্তমান থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই বিশেষবশতঃ দ্ব্যণুকাদি ক্রমে যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। বৈশেষিকগণ পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করিতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষের মূল কারণ ধরিতে পারেন নাই। যোগভাষ্যকার স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, পরমাণুও ক্ষুদ্রতর অবয়বের সমষ্টিমাত্র—"অযুতসিদ্ধাবয়বসংঘাতঃ পরমাণুঃ"। এই অবয়বসন্নিবেশের বা পঞ্চীকরণের তারতম্য নিবন্ধনই পরমাণুর বৈলক্ষণ্য উপপন্ন হয়।

স্থূলস্তরে আসিয়া প্রসারশক্তি প্রতিহত হয়। স্থূল-জগৎই বাহ্যজগৎ। বাহ্যজগতে, স্থূলদেহে, কালচক্র আবর্তিত হইতে থাকে এই আবর্তনমার্গের একাংশ (বাম) ইড়া ও অপরাংশ (দক্ষিণ) পিঙ্গলা। এই উভয়মার্গের প্রত্যেকটি অসংখ্য শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট এবং মৎস্যজালের ন্যায় সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। প্রসারশক্তি স্থূলে আসিয়া প্রতিহত হয়—এ কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তখন জীবও স্থূল কোষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে—পূর্বস্মৃতি ভুলিয়া যায়, বৈষ্ণবী-মায়ায় বিমোহিত হইয়া ইড়া-পিঙ্গলামার্গে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে সঞ্চরণ করিতে থাকে। এই সঞ্চারকে সংসারগতি অথবা কালচক্রে পরিভ্রমণ বলা হয়। যে শক্তিপ্রবাহ প্রথমতঃ জ্যোতিরূপে ও পরে নাদরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই স্থূলস্তরে আসিয়া প্রাণরূপে[৭] প্রকাশিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ু প্রভৃতি এই প্রাণশক্তিরই বিকাশ।

যখন প্রসারশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সঙ্কোচশক্তির ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই এই ব্যবস্থা। ব্রহ্মাণ্ড এই সঙ্কোচশক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া সাম্যাবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে। পৃথক্ চেষ্টা না করিলে প্রতি ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডের মুক্তির সঙ্গে মহাপ্রলয়ের সময় মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু পুরুষকার প্রয়োগ করিলে ব্রহ্মাণ্ডের মুক্তিকালের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না।

জীব স্থূলাবরণে বেষ্টিত হইয়া সূক্ষ্ম সুষুম্নামার্গে প্রবেশপথ পায় না। পূর্বসংস্কার বা বাসনা, অভিমান বা কর্তৃত্ববোধ এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বা ভোগাভিলাষ (যাহাকে কামনা বলে), এই তিনটি আবরণে জীবের স্থূলত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। বিষয়েন্দ্রিয়াদিরূপে এই স্থূলাবরণ জীবকে স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেয় না। জীবমাত্রই জ্ঞান চায়, আনন্দ চায়, অমরত্ব চায়—এককথায়, ব্রাহ্মীস্থিতি চায় এবং সেই প্রত্যাশাতে বিষয়রাজ্যে পরিভ্রমণ করে। বস্তুতঃ বিষয়াদি তাহার প্রার্থনীয় নহে—আনন্দই প্রার্থনীয়। আনন্দের সাধনরূপে গৌণভাবে সে বিষয়াদির আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু যুগ-যুগান্তর, এমন কি কল্প-কল্পান্তর, লোক-লোকান্তরে সঞ্চরণ করিয়াও তাহার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি লাভ করে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সে সর্বত্রই বাসনা ও কর্তৃত্বাদি সহকারে পরিভ্রমণ করে। যতদিন বাসনাদির উচ্ছেদ,

৭ বলা বাহুল্য আমরা পারিভাষিক শব্দ যতটা সম্ভব ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রাণশব্দ নাদ এবং জ্যোতির পর্যায়রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্পন্দন অথবা কম্পনই প্রাণতত্ত্ব। জ্যোতিঃ, নাদ ও তথাকথিত প্রাণ যে একই শক্তির ক্রমিক বিকাশ, তাহা মনে রাখিতে হইবে।

অন্ততঃ এক নিমেষের জন্যও, না হইবে ততদিন সুষুম্নায় প্রবেশ-পথ পাইবে না। কারণ, স্থূলবস্তু সূক্ষ্মমার্গে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ভূতশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতিরও তাৎপর্য এই স্থূলতা বিসর্জন ভিন্ন অপর কিছু নহে। পঞ্চভূত যখন শুদ্ধ হয়, তখন পঞ্চীকরণ থাকে না, এমন কি পঞ্চবিন্দু পর্যন্ত এক বিন্দুতে পরিণত হয়। তারপর চিত্তশুদ্ধি হইলে, সেই এক বিন্দু নির্মল হইয়া, জ্ঞানচক্ষুঃ অথবা তৃতীয় নেত্রের বিকাশ করে। ইহাই বিশুদ্ধ জীবাবস্থা। ইহার পর ঈশ্বর-তত্ত্বের সম্মুখীন হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই উপাসনা। উপাসনাতে আজ্ঞাস্থ বিন্দু ও সহস্রারস্থ মহাবিন্দুতে ভেদ থাকে, অভেদও থাকে। ক্রমশঃ এই ভেদাভেদের মধ্যে ভেদাংশ বিগলিত হইয়া অভেদ প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। ইহার পর ত্রিগুণাতীত পরম সাম্যাবস্থা বা ব্রহ্মত্ব।

তিন

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কুণ্ডলিনীশক্তির উদ্বোধন ভিন্ন জীবের ঊর্ধ্বগতি সম্ভবপর নহে। অরণিমন্থন করিয়া যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়, অর্থাৎ অরণিস্থ সুপ্ত (latent) অগ্নি যেমন সংঘর্ষণে উদ্দীপিত হয়, সেইপ্রকার সাধনপ্রণালী দ্বারা প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগাইতে হয়। অগ্নি প্রকটিত হইয়া যেমন ইন্ধনকে দগ্ধ করে, কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইলে তেমনই সাধনা বিলুপ্ত হয়। বাহ্য সাধনমাত্রই—বিচার, ভক্তি অথবা হঠ কিংবা মন্ত্রযোগাদি—পুরুষকার সাপেক্ষ, কর্তৃত্ববোধ-মূলক। এই কর্তৃত্ববোধ ক্রমশঃ কুণ্ডলিনীচৈতন্যের সহিত লুপ্ত হইয়া আসে, আবার কর্তৃত্ববোধ লুপ্ত হইতে হইতে কুণ্ডলিনী অধিকতর জাগ্রত হইয়া উঠে। যখন একবার কুণ্ডলিনী চেতন হইতে আরম্ভ হয়, তখন স্বভাবের নিয়মেই সকল কার্য হইতে থাকে। অনুকূলস্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিলে, তাহাকে যেমন আর সমুদ্রে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, সেইপ্রকার কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া তাহার প্রবাহে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিলে জীবকে আর ব্রহ্মাবস্থা লাভের জন্য পৃথক্ প্রয়াস করিতে হয় না।[৮] সংকোচশক্তি অথবা

---

৮ প্রাচীন বৌদ্ধগণ ইহাকে "স্রোত-আপন্ন" নাম দিয়াছেন। বুদ্ধদেব শক্তিসঞ্চার-পূর্বক শিষ্যকে এই ঊর্ধ্বস্রোতে স্থাপন করিতেন। ইহা সুষুম্নাবাহী ঊর্ধ্বস্রোত ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই স্রোতে পড়িলে জীবকে আর 'অপায়' মধ্যে পতিত হইতে হয় না—কারণ, তখন তাহার সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা এবং শীলব্রতপরামর্শ নামক ত্রিবিধ বন্ধন বা 'সংযোজন' ছিন্ন হইয়া যায়। অবশ্য সঞ্চারিত শক্তির ন্যূনাধিকতা এবং সঞ্চিত কর্মবাসনাদির গাঢ়তার তারতম্য নিবন্ধন 'স্রোত-আপন্ন' অবস্থা বহুপ্রকার।

উধর্ববিন্দুস্থিত আকর্ষণশক্তির প্রভাবে অন্তর্মুখ গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে সাম্যাবস্থায় গিয়া স্থিতি লাভ করে।

কুণ্ডলিনী চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে ইড়াপিঙ্গলায় প্রবহমান স্রোত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সুষুম্না পথে প্রবেশ করে, এবং সুষুম্না পথেও উর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে ক্রমশঃ আরও অধিকতর সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীবশক্তি বজ্রা ও চিত্রিণী নাড়ী ভেদ করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম নাড়ী অথবা আনন্দময় কোষে গমন করে। ইহাই ঐশ্বর্য অবস্থা। আনন্দময় কোষেও যখন আর লক্ষ্য থাকে না, তখনই গুণাতীত পরম সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে।

উধর্বস্থ সত্ত্ববিন্দু এবং অধঃস্থ তমোবিন্দু পর্যন্ত রেখাকে মেরু (axis) বলা চলে। এই রেখার উধর্ববিন্দু উত্তরমেরু এবং অধোবিন্দু দক্ষিণমেরু (North and South Poles)। উভয় বিন্দু আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট। অধোবিন্দুর আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ—ইহা ভূমধ্য হইতে প্রসৃত। উধর্ববিন্দুর আকর্ষণ সংকর্ষণ নামে পরিচিত। ইহার অপর নাম কৃপা। ইহা উধর্ববিন্দু অর্থাৎ আদিসূর্য কিংবা ঈশ্বরোপাধির কেন্দ্র হইতে চতুর্দিকে প্রসারিত। আজ্ঞাস্থ বিশুদ্ধ জীব বা কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষ উভয় আকর্ষণের ঠিক মধ্যস্থলে তটস্থভাবে বর্তমান। তাঁহাদের উপাধি নির্মল বলিয়া তাঁহাদের প্রতি মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া হয় না—এইজন্য ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তাঁহাদের স্থিতি নাই। উধর্বদৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের প্রতি ভগবৎকৃপাশক্তিও ক্রিয়া করে না। ইঁহাদিগকে সাংখ্যজ্ঞানী বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে—ইঁহারা ঈশ্বরের শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ধামে স্থান লাভ করেন না। ইঁহারা মায়াতীত হইয়াও মহামায়ার অধীন। আগমে ইঁহাদের নাম বিজ্ঞানাকল দেওয়া হইয়াছে।

ইহার অবশ্য ক্রম আছে। যখন কোন অনির্বচনীয় কারণে এই তটস্থ বিন্দু উধর্বমুখ হয় তখন অখণ্ড সত্ত্ববিন্দুর সহিত তাহার সাম্মুখ্য হয়। ইহাকে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার বলে। তখন আর সে তটস্থ নহে, তখন সে সহস্রারে প্রবিষ্ট হইয়া আপন রেখা অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা ভাবের সাধনা—ইহাও স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। তমোবিন্দু যেমন পাঁচ ভাগে বিভক্ত, সেইপ্রকার এই শুদ্ধসত্ত্বস্তরও পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এক এক স্তরে একটি ভাবের প্রাধান্য। শান্ত হইতে মাধুর্য পর্যন্ত এই পাঁচ স্তর প্রসারিত রহিয়াছে। মাধুর্যই শুদ্ধসত্ত্ববিন্দুর অন্তরতম অথবা উধর্বতম ভাব। যখন ইহাও অতিক্রান্ত হয়, তখনই পূর্ণাবস্থা লাভ হয়, তৎপূর্বে নহে। তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ মণ্ডল অতিক্রান্ত হইলে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য পূর্ণ হইল বলা যায়।

কুণ্ডলিনীর পূর্ণ জাগরণে একমাত্র অদ্বিতীয় ও পূর্ণ বস্তুতেই স্থিতি হয়, সমগ্র জগৎ নিরাধার হইয়া ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়, আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক ব্রাহ্মীস্থিতি, শাশ্বত পদে অবস্থান সুসিদ্ধ হয়।

চার

আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, কুণ্ডলিনীতত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্বের,—শুধু দেহ কেন, জগতের যাবতীয় তত্ত্বেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। যিনি মুক্তি মার্গের পথিক, তাঁহাকে জড়তত্ত্ব, চিৎতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব —সকল তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। তত্ত্বমাত্রই বৈষম্যাবস্থার অন্তর্গত। সাম্যাবস্থা তত্ত্বের অতীত। তবে তাহাকে যে কখন কখন তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হয়, সে কেবল ব্যবহারসৌকর্যের অনুরোধে।

কুণ্ডলিনী কিঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হইলেই জীবের ঊর্ধ্বগতি অথবা ক্রমমুক্তির অনুযায়ী আরোহণ আরব্ধ হয়। সমাধির ক্রমবিকাশ অথবা কুণ্ডলিনীর ক্রমোন্নতি অভিন্ন পদার্থ। যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত একাগ্র ভূমিতে অবস্থিত থাকে, ততক্ষণ তাহার অবলম্বন আছে। অবশ্য এই অবলম্বন ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ভাব প্রাপ্ত হয় ও অবশেষে বিন্দুরূপে পরিণত হয়। প্রচলিত পাতঞ্জল মতানুসারে অস্মিতাই এই বিন্দু, সেইজন্য সাস্মিত সমাধিই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরমাবস্থা। এই ভূমিতে প্রজ্ঞার উদয় হইলে চিত্ত নিরালম্বন লইয়া পরিপূর্ণ শুদ্ধি লাভ করে। তখন উপায়-প্রত্যয়াত্মক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উদয় হয়। এই অবস্থায় ক্লেশ থাকে না, কর্মাশয় থাকে না, পূর্বসংস্কার, কর্তৃত্ববোধ, কিছুই থাকে না—চিত্ত সকলপ্রকার আবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ণ শশধরের ন্যায় বিমল ও স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হয়। এই শুদ্ধ সত্ত্বই নির্মাণচিত্ত ও নির্মাণকায়াদির প্রসূতি। ইহার দ্বিবিধ অবস্থান সম্ভবপর। সঙ্কোচকালে ইহা নিরুদ্ধ হইলে পুরুষের কৈবল্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। বিকাশকালে ইহার অবস্থিতিনিবন্ধন জীবন্মুক্তির প্রাপ্তি ঘটে।[১]

সাংখ্যের কৈবল্য যে পূর্ণ অবস্থা নহে—ইহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ এক কিংবা বহু হইতে পারে না। উপাধিবিহীন শুদ্ধ-

১ যেখানে শক্তি আছে সেখানেই সঙ্কোচবিকাশের খেলা আছে। সত্ত্বাদি গুণত্রয় যে যে শক্তিরই স্ফুরণ তাহা সাংখ্যযোগে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত না হইলেও সর্বোচ্চ ভূমি হইতে লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। মুক্তির আদর্শ বিভিন্ন বলিয়া জীবন্মুক্তিও নানা-প্রকার। যে মতে যে অবস্থা মুক্তি বলিয়া পরিগণিত, সে মতে সেই অবস্থার আভাস জীবদ্দশায় লাভ করিলেই জীবন্মুক্তি লাভ হইল।

চৈতন্যে ভেদপ্রতীতি কিংবা অভেদপ্রতীতি কিছুরই সম্ভাবনা নাই। উপাধি এক হইলে তদুপহিত চৈতন্যকে এক বলা সম্ভবপর, সেইপ্রকার উপাধির বাহুল্য-নিবন্ধন তদুপহিত চৈতন্যেরও বহুত্ব অঙ্গীকার করা চলে। সাংখ্যের বহু পুরুষ বস্তুতঃ বহু সত্ত্বে পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ। সত্ত্বের বহুত্ব যে খণ্ডতা-নিবন্ধন তাহা অবশ্য স্বীকার্য। এক অখণ্ড সত্ত্বই খণ্ডিত (অথবা খণ্ডিতবৎ) হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। একই বহুর উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ। সুতরাং বহু পুরুষ যতক্ষণ এক উত্তম পুরুষকে প্রাপ্ত না হইবে, ততক্ষণ যথার্থ সাম্যভাব লাভের আশা সুদূরপরাহত। একাগ্রভূমি অবলম্বন না করিয়া নিরোধভূমিতে পদার্পণ করা যায় না। দ্বৈতাদ্বৈত উভয় প্রকার ভাবের অতীত হইতে হইলে প্রথমতঃ দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে উপস্থিত হইতে হইবে, পরে স্বভাবের নিয়মে অদ্বৈতভূমিও অতিক্রান্ত হইলে বিকল্পোপশম সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি আপনিই ঘটিবে। দ্বৈতভাবকে অদ্বৈতে পরিণত না করিয়া নিবৃত্ত করিলে ব্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। যে কারণে প্রকৃতিলীনের মগ্নোত্থানবৎ পুনরুত্থান হয়, ঠিক সেই কারণেই সাংখ্যের কেবলীদিগকেও পুনরুত্থিত হইতে হয়।

সুতরাং বৈশেষিকের মুক্তি ত দূরের কথা, সাংখ্যের মুক্তিও প্রকৃত মুক্তি নহে। তখনও যে কুণ্ডলিনী সম্পূর্ণ চেতন হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। সাংখ্যে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হয় নাই। যিনি নিত্যমুক্ত অথচ নিত্যৈশ্বর্যসম্পন্ন, যোগভাষ্যকার যাঁহার উপাধিকে 'প্রকৃষ্টসত্ত্ব' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যাঁহাকে ক্লেশাদিবিহীন পরমগুরুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই 'কারণ ঈশ্বর' সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যসম্মত ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভাদি 'কার্যেশ্বর'। সাধনার পরিপাকে সাধকের চিত্তে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্যের বিকাশ হইলেই সাংখ্য-দৃষ্টিতে ঈশ্বরত্ব লাভ হইল, বলা চলে। কিন্তু এ ঐশ্বর্য অনিত্য, কারণ, ইহা দ্বৈতবোধ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কৈবল্যের পরিপন্থী। মোট কথা, সাংখ্যনির্দিষ্ট সাধনে জীব তটস্থভাব হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হইতে পারে না। তটস্থবিন্দু ঊর্ধ্ববিন্দুর আকর্ষণের বহিঃসীমায় অবস্থিত, তাই সহস্রারে প্রবেশ পায় না। তখনও আবরণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না বলিয়া কুণ্ডলিনী আংশিকভাবে প্রসুপ্ত থাকে। শৈবাগমের মতে ইহা একপ্রকার 'বিজ্ঞানাকল' অবস্থা। ভক্তি (বৈধী) এবং উপাসনাবলে খণ্ড সত্ত্ব অখণ্ড সত্ত্বের ধারায় অর্থাৎ আদিসূর্যের একটি রশ্মিতে সংযোগ লাভ করে এবং ক্রমশঃ সেই রশ্মি অবলম্বনে কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইতে থাকে। খণ্ড সত্ত্বে ভাবের বিকাশ হইলেই সহস্রদল কমলের নিত্য বিভূতি প্রত্যক্ষ অনুভবে আসে। ভাব ধীরে ধীরে গাঢ়তর হইয়া বিধিকোটি অতিক্রম করে এবং রাগরূপে পরিণত হয়। রাগেরও ক্রমবিকাশ

আছে। দাস্যভাব পর্যন্ত ঐশ্বর্যাবস্থার অনুভব হয়, পরে দাস্যভাবের অতীত হইলেই মাধুর্যাবস্থার বিকাশ হইয়া থাকে। মাধুর্যাবস্থা সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তরূপে স্থূলতঃ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে কান্তভাবেই মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা। ভাব ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণতি লাভ করে। এই মহাভাব, বিভাব ও অনুভাব প্রভৃতি কারণবশতঃ শৃঙ্গাররসে পরিণত হয়। ইহাই আদিরস।[১০]

এইপ্রকারে কুণ্ডলিনীর ক্রমিক চৈতন্যে ঊর্ধ্ববিন্দু পর্যন্ত জীব উত্থিত হয়। কেন্দ্রে প্রবিষ্ট হইলেই লীলাভূমির অপর পার আয়ত্ত হইয়া যায়। তখন সাম্যভাবে স্থিতি হয়। সেইটিই উপশম বা শান্ত অবস্থা। কাহারও কাহারও পরিভাষানুসারে উহাই নির্বাণ পদ। সুতরাং শুদ্ধসত্ত্বের প্রাকট্যে শৃঙ্গাররসই সর্বরসের সারভূত আদিরস, এবং গুণাতীত অবস্থায় সে আস্বাদও থাকে না।

আমরা যে পূর্বে বলিয়াছি—কুণ্ডলিনীর পূর্ণ চৈতন্যসম্পাদন এবং পারমৈশ্বর্য লাভ একই কথা—এবার তাহা বুঝা গেল।

১০ শান্ত ও শৃঙ্গার—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আদিরস, তাহা লইয়া সাধক-সম্প্রদায়ে মতভেদ আছে। তবে যাঁহারা লীলানুরাগী, তাঁহারা শৃঙ্গাররসকেই আদিরস বলিয়া থাকেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শান্তরসকে সর্বাপেক্ষা নিম্ন স্থান প্রদান করেন। মোট কথা, শান্ত ও শৃঙ্গার এই দুইটি রসাস্বাদনের প্রান্তাবস্থা। কাশ্মীরীয় শৈবাচার্যগণ যদিও শান্তরসকে প্রধান বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা শিবশক্তির সামরস্যরূপে শৃঙ্গারকে শান্তের সঙ্গে সমন্বয় করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর রসতত্ত্বের শিক্ষা শৃঙ্গারাংশের প্রাধান্যখ্যাপক।

নাদ, বিন্দু ও কলা

কুণ্ডলিনী জাগরণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হইল নাদের স্ফুরণ। নাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া আছে বিন্দু ও কলাতত্ত্ব। তাই এই তিনটি তত্ত্ব ভালভাবে বুঝা আবশ্যক। তান্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে নাদ, বিন্দু ও কলা এই তিনটি শব্দের সহিত পরিচয় ঘাটিয়া থাকে। কিন্তু এই তিনটি শব্দের পারিভাষিক অর্থ কি তাহা স্পষ্টভাবে অনেকেই অবগত নহেন। যদিও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হওয়ার দরুণ এই তিনটি শব্দের ব্যবহার তন্ত্রশাস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রেও কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ভাবের মূল স্বরূপ এবং তাহার বিশ্লেষণ-প্রণালী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রদর্শিত মার্গই অবলম্বনীয়।

জগতের সৃষ্টিপ্রণালীর বিবরণ-প্রসঙ্গে সারদাতিলকে লিখিত হইয়াছে—

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীৎ শক্তিস্ততো নাদস্ততো বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥ ইত্যাদি।

এই বিবরণ হইতে আদি সৃষ্টির যে ক্রম পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে, সৃষ্টির আদিতে স-কল পরমেশ্বর হইতেই সৃষ্টির বিকাশ হইয়া থাকে। 'স-কল' বলিতে 'কলাসহিত'—ইহাই বুঝিতে হইবে। 'কলা' শব্দের অর্থ শক্তি। কিন্তু পারিভাষিক শক্তি কলা হইতে ভিন্ন। কারণ, তান্ত্রিক পরিভাষা অনুসারে অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত অবস্থাই শক্তি। পরমেশ্বর একদিকে নিষ্কল অর্থাৎ কলা-রহিত এবং অন্যদিকে স-কল অর্থাৎ অখণ্ড কলা-সম্পন্ন। তাঁহার এই 'স-কল' অবস্থা হইতেই সৃষ্টির ধারা প্রবর্তিত হয়। 'সকল' পরমেশ্বর শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই শক্তির ন্যূনতা আপন স্বাতন্ত্র্যবলে অবভাসিত করিতে সমর্থ হন। এই অবস্থায় যে ভাবের স্ফূর্তি হয় তাহা শক্তিপদবাচ্য। কিন্তু এই শক্তি মহাশক্তিরূপা হইলেও পরিচ্ছিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনন্ত ঐশ্বর্য-সম্পন্ন ঈশ্বরের ইহাই প্রথম আবির্ভাব। কলারূপে যখন শক্তি শিব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে—তখন উহা পৃথগ্‌ভূত না থাকিয়া অখণ্ডশিবস্বরূপেই একাত্মকভাবে মগ্ন থাকে।

এই স-কল পরমেশ্বর হইতে অবতরণক্রমে শক্তিতত্ত্বের বিকাশ হইয়া থাকে। স-কল পরমেশ্বরে যে সমস্ত শক্তি একাত্মকভাবে কলারূপে তাঁহার অঙ্গীভূত ছিল,

উহারা পরমতত্ত্ব স্কন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্তবৎ প্রতিভাসমান হইয়া থাকে। এই সকল শক্তিরই সমষ্টিনাম শক্তিতত্ত্ব। শক্তি হইতে (পর) নাদের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং নাদ হইতে (পর) বিন্দু, ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রকটিত হয়। নাদ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিন্দুর আকার ধারণ করে। যেমন বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুরূপে পরিণত হয়, সেইপ্রকার নাদ ঘনীভূত হইয়া আদি সৃষ্টি বা বিন্দুরূপে পরিণত হয়। নাদ বর্ণাত্মক নহে। বর্ণের অভিব্যক্তি আরও পরবর্তী।

উপর্যুক্ত বিবরণ হইতে প্রতীত হইবে যে শক্তি, নাদ এবং বিন্দু, ইহাই ক্রম। শক্তির বিশ্রান্তি দশায় ইহা স্বরূপের অঙ্গীভূত হয় বলিয়া ইহাকে কলা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। কলা অবস্থায় স্বরূপ হইতে শক্তির পৃথক্‌ভাব সম্পন্ন হয় না। কিন্তু যখন কলাতে কিঞ্চিৎ স্বয়ংসিদ্ধ ন্যূনতার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, তখন ঐ কলাই শক্তি নামে অভিহিত হয়। এই শক্তিতত্ত্ব তত্ত্বরূপ বলিয়াই যতক্ষণ ইহা স্বরূপে পরিণত না হয় ততক্ষণ ইহা পৃথক্ তত্ত্বরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। শক্তির ক্রিয়াবস্থাই নাদ এবং নিষ্ক্রিয়াবস্থা কলা। তদ্রূপ কলার বহির্মুখ অবস্থা শক্তি এবং অন্তর্মুখ অবস্থা শিব।

শক্তি স্বরূপনিষ্ঠ ক্রিয়া দ্বারা কার্যোন্মুখ হইয়া নাদরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই যে নাদের কথা বলা হইল ইহা ব্যাপক নাদ। যখন এই ব্যাপক নাদসত্তা প্রাকৃতিক একাগ্রতার প্রভাবে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুরূপে স্থূলভাব গ্রহণ করে, তখন সৃষ্টির প্রাথমিক ক্রম পরিসমাপ্ত হয়। সৃষ্টির পরবর্তী ক্রম স্কন্ধ বিন্দু হইতে আত্মপ্রকাশ করে।

শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা) আছে যে সৃষ্টির আদিতে শক্তির আবির্ভাব তিল হইতে তৈলের অভিব্যক্তির ন্যায়। ঐ সময়ে পরাশক্তি অব্যক্তাবস্থায় শিবতত্ত্বের সহিত অভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন শিবের ইচ্ছার উন্মেষ হয় তখন উহার প্রভাবে ঐ শক্তি শিব হইতে পৃথগ্‌বৎ স্ফুরিত হয়।

শিবেচ্ছয়া পরাশক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকতাং গতা।
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদিব ॥

পরমেশ্বরের স্বরূপে যে অনন্ত কলা বিদ্যমান রহিয়াছে ঐ সকল চিদাত্মক বলিয়া পরমেশ্বর তত্ত্ব হইতে অভিন্ন। সুতরাং ঐ কলা চিৎকলারই নামান্তর। এইজন্য পরমেশ্বরের স-কল অবস্থা চৈতন্য-শক্তিবিশিষ্ট চিৎ-স্বরূপকে বুঝাইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই অবস্থা শিবেরই অবস্থা—ইহাই পূর্ণত্ব। কিন্তু পূর্ণত্ব হইলেও ঐ সকল শক্তিকে বা কলাকে পরমা কলা বা আদ্যা কলা বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। যখন নবীন সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবানের ঈক্ষণ শক্তি স্বকার্য সাধনের জন্য জাগ্রৎ হইয়া উঠে, তখন ঐ চিৎকলা 'শক্তি' নাম ধারণ করিয়া স্বরূপ

হইতে পৃথক্ না হইলেও পৃথগ্‌বৎ অবস্থা লাভ করে। পূর্বোক্ত সৃষ্টি-ক্রমের মধ্যে শক্তির আবির্ভাবের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। শক্তি ইচ্ছারূপা। ইচ্ছার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে একটি তীব্র অভাববোধ জাগিয়া উঠে। অভাব না থাকিলে ইচ্ছার উদয় হয় না। যাহা নাই তাহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য যে ইচ্ছা তাহাই অভাব-বোধের নামান্তর। এই অভাবটিই বস্তুতঃ মহাশূন্য, যাহা আবির্ভূত হইয়া মহাসত্তার মধ্যে একটি দ্বিধাভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যাহার জন্য অভাববোধ অর্থাৎ ইচ্ছার যাহা বাস্তবিক বিষয়, তাহার জন্য একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। ইচ্ছার বিষয় পূর্ব সৃষ্টির বিলীন সত্তাবিশিষ্ট বিশ্বের পুনঃপ্রাপ্তি। প্রলয়ের মহাসুষুপ্তির পরে জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা অস্ফুটভাবেই জাগিয়া উঠে। তখন ঐ ইচ্ছার প্রভাবে মহাশূন্যের আবির্ভাব হয়। মহাশূন্য আকাশেরই নামান্তর। পূর্ণাবস্থায় আত্মা পরিপূর্ণ অহংভাবে বিশ্রান্ত থাকে বলিয়া উহাই সম্যক্ আত্মচৈতন্যের অবস্থা। সুষুপ্তির পর পূর্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিলে একটি অনির্দিষ্ট বস্তুর জন্য অনির্দিষ্ট রোদনের ভাবে হৃদয়টি আচ্ছন্ন হয়। এই সময় পূর্ণ অহংভাব থাকে না। তাহা খণ্ডিত হইয়া একদিকে পরিচ্ছিন্ন 'অহং' ও অপরদিকে উহার প্রতিযোগী 'ইদং' ভাসিয়া উঠে। অহংটি দ্রষ্টা এবং ইদংটি দৃশ্য। দ্রষ্টার সম্মুখে দৃশ্যরূপে মহাশূন্যের আবির্ভাব হওয়াই ইচ্ছাশক্তির বিকাশ। ইচ্ছা উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছার বিষয়রূপী অব্যক্ত বিশ্বও জাগ্রৎ হইতে উপক্রম করে। বিশ্বের আধার মহাশূন্য। সুতরাং বিশ্ব আবির্ভূত হইবার পূর্বে উহার আধাররূপী মহাশূন্য আবির্ভূত হয়। দ্রষ্টার লক্ষ্য দৃশ্যরূপী শূন্যের উপর পতিত হইলে মনে হয় সেই শূন্য হইতে একটি অব্যক্ত নাদধ্বনি ঝংকৃত হইতেছে। এই নাদ আদিনাদ অথবা পরনাদরূপে প্রসিদ্ধ। ইহার বিকাশ আর চৈতন্যের আত্মস্ফুরণ একই কথা। নাদের স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতিরও বিকাশ হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে নাদ এবং জ্যোতিঃ একই মহাসত্যের দুইটি অবতরণশীল অবস্থা মাত্র।

পরমেশ্বর ইচ্ছা দ্বারা জগৎকে প্রকাশিত করিয়া উহা হইতে খণ্ডভাবে নিজেকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তখন মহাশূন্য নাদের ঝংকারে অবিশ্রান্ত ঝংকৃত হইতে থাকে। যখন ইহার আকর্ষণে এই বাষ্পবৎ ব্যাপক সত্তা ঘনীভূত হইয়া একটি কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠে তখনই বাস্তবিক পক্ষে কোলহাট চক্র ভেদ হইতে থাকে। মহাশূন্য অভিব্যক্ত নাদের দ্বারা ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হইতে থাকে। নাদের অভিব্যক্তির তারতম্য অনুসারে আচ্ছন্নতার ন্যূনাধিক ভাব সিদ্ধ হয়। জ্যোতিঃ ও নাদ একই বস্তুর দুইটি বিভিন্ন দিক্। সুতরাং যতক্ষণ নাদ ও জ্যোতিঃ প্রকট হইয়া বিশ্বকে অবভাসিত না করে ততক্ষণ

এই প্রক্রিয়া শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। যে ব্যাপক রশ্মিমালা নাদ-জ্যোতিঃ-স্বরূপে শূন্যে প্রকাশ পায় তাহার ঘনীভূত অবস্থাই বিন্দু। নাদ ঘনীভূত হইয়া সাম্যাবস্থায় পরবিন্দুরূপে প্রকাশিত হয়। তখন কাল বা শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তি আঘাতের দ্বারা বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করিয়া উহাকে বিভক্ত করিয়া থাকে। ঐ সময় ক্ষোভের ফলস্বরূপ বিন্দু, বীজ ও নাদ এই তিনটি অবস্থার উদ্রেক হয়। এই বিন্দু অপরবিন্দু এবং এই নাদ অপরনাদ।

শক্তি বা ইচ্ছাশক্তি হইতে শূন্যের আবির্ভাব হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। এই শূন্যই কোন কোন দার্শনিকের দৃষ্টিতে মায়াপদবাচ্য। মায়া শিব ও শক্তির পরস্পর সংঘর্ষণ হইতে আবির্ভূত হয়। শিব-স্বরূপে জীবের প্রতিবিম্ব এবং জীবস্বরূপে শিবের প্রতিবিম্ব যুগপৎ উভয় আধারে পূর্ণরূপে প্রকাশমান। এই বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব হইতেই মায়ার আবির্ভাব হয়। সৃষ্টির রচনার প্রাক্কালে মূল সামগ্রীসকল আবির্ভূত হইতে দেখা যায়।

শিব-শক্তিময় বিশুদ্ধ চৈতন্য হইতে বিশ্বরচনা হইয়া থাকে। বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ, এই চারিটি স্তর আছে। সৃষ্টির সময় এইগুলি পর পর আবির্ভূত হয় অর্থাৎ সর্বপ্রথম মহাকারণ স্তর প্রকটিত হয়, এবং তাহার পর ঐ মহাকারণ সত্তা হইতে কারণ সত্তা আবির্ভূত হয়। উত্তরোত্তর স্থূলতার দিকে গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চরম অবস্থা পর্যন্ত অভিব্যক্ত হইলে সৃষ্টির ধারা নিবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই যে মহাকারণ প্রভৃতি স্তরসকলের কথা বলা হইল এইগুলি একপ্রকার দেহরূপে কল্পিত হইবার যোগ্য। জীবের ব্যষ্টি ধারাতে যেমন মহাকারণ, কারণ প্রভৃতি বিভিন্ন শরীরের সত্তা ও ক্রিয়া উপলব্ধিগোচর হয়, ঠিক সেইপ্রকার সমষ্টি ধারাতেও হইয়া থাকে। যখন মহাসুষুপ্তির পর ইচ্ছাশক্তির প্রথম উন্মেষ হয় তখন সঙ্গে সঙ্গেই মহাশূন্য আবির্ভূত হইয়া থাকে, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে এই মহাশূন্যই ভবিষ্যৎ সৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ। প্রাচীর গাত্রে যেমন চিত্র অঙ্কিত হয় তেমনি মহাশূন্যকে অবলম্বন করিয়া জগতের বিরাট্ চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। এইজন্য মহাকারণ শরীর আবির্ভূত হইবার পূর্বে মহাশূন্যের আবির্ভাব অপরিহার্য। এই মহাশূন্যই মায়াস্বরূপা। শিব ও শক্তির পরস্পরে পরস্পরের প্রতিফলন হইতে অবিবিক্তভাবে মহাশূন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যতক্ষণ মহাশূন্য ভেদ না হয় ততক্ষণ যথার্থ বিবেকজ্ঞান হয় না। মহাশূন্য ভেদ হওয়া এবং মায়া অতিক্রম করিয়া চৈতন্যময় শিবশক্তির চরণতলে পেঁছান, একই কথা।

শূন্য আবির্ভূত হওয়ার পর যখন দ্রষ্টা দৃক্‌শক্তির দ্বারা তাহাকে অনুবিদ্ধ করিতে থাকে তখন নাদ ও জ্যোতীরূপে স্পন্দন তরঙ্গশূন্য সাগরে আন্দোলিত

হইতে থাকে। এই জ্যোতির্ময় নাদ অথবা নাদাত্মক জ্যোতিঃ যে গুহ্যভূমি হইতে স্ফুরিত হইয়া দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, তাহাই বিসর্গমণ্ডল নামে প্রসিদ্ধ। নরদেহে ইহা ব্রহ্মরন্ধ্রেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত। সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড দেহেও তাহাই। ইচ্ছাশক্তি বিসর্গরূপা বলিয়া তাহার মণ্ডলটি বিসর্গমণ্ডল নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। সৃষ্টিরচনার মূল সূত্রগুলি এইখান হইতেই উপলব্ধ হয়। (পর) নাদ ও (পর) বিন্দুরূপ ক্রমবদ্ধ যে দুইটি অবস্থার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বিশ্বসৃষ্টির গোড়ার বস্তু। ইহাকে জগৎরূপী বৃক্ষের অঙ্কুর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ ইহা বৃক্ষের একটি অবস্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাকেই মহাকারণ অবস্থা বলে। ইহার মূল উপাদান অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিসর্গমণ্ডলেই বিদ্যমান থাকে। বিসর্গমণ্ডলের অতীত চৈতন্যস্বরূপে অন্বেষণ করিতে গেলে কিছুরই প্রাপ্তির আশা নাই কারণ, উহা বিশুদ্ধ ও নির্বীজ। অনন্ত সৃষ্টি বিসর্গ হইতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। বিসর্গ অন্তর্মুখ হইলে সমগ্র সৃষ্টি লুপ্ত হইয়া যাইবে।

এই পরনাদ ও পরবিন্দু মহাকারণ শরীর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহার যেটি বহিরঙ্গ প্রকাশ তাহাই জগতের কারণ সত্তা। পরবিন্দু ক্রিয়াশক্তি-রূপী কালের দ্বারা ক্ষুব্ধ হইলে একটি অস্পষ্ট মহাধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। ইহা শব্দব্রহ্ম নামে পরিচিত। এই অব্যক্তধ্বনি বা শব্দব্রহ্ম পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টির মূল কারণ। পরনাদ ও পরবিন্দুকে মহাকারণ বলিয়া গ্রহণ করিলে পরবিন্দুর ক্ষোভ হইতে উৎপন্ন বিন্দু, বীজ ও নাদ এই তিনটিকে কারণ বলিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক। শব্দব্রহ্মরূপী মহানাদ মহাকারণদেহ এবং কারণদেহের অন্তরালে বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাকারণ দেহের মূল যেমন বিসর্গমণ্ডলে নিহিত থাকে, তদ্রূপ কারণদেহের মূল শব্দব্রহ্ম নিহিত থাকে। এইজন্য শব্দব্রহ্ম ভেদ না হওয়া পর্যন্ত কারণদেহ অস্তমিত হয় না। সৃষ্টির মূলে শিবশক্তি থাকিবার দরুণ সৃষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেকটি স্থিতিতেই শিবশক্তির স্বরূপ অনুভব করা যায়। পরবিন্দুতে একপক্ষে যেমন গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, পক্ষান্তরে সেই-প্রকার উহা শিবশক্তিরও সাম্যাবস্থা। শুধু তাহাই নহে, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিনটি আদিশক্তিরও সাম্যাবস্থা উহাই। কিন্তু যখন কালের দৃষ্টিতে বিন্দু ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া বৈষম্য অবস্থায় উপনীত হইল, তখন অপরবিন্দুরূপ যে কার্য উৎপন্ন হইল তাহাতে শিবাংশের এবং বীজরূপ যে কার্য উৎপন্ন হইল তাহাতে শক্ত্যংশের প্রাধান্য রহিয়া গেল ; অর্থাৎ অপরবিন্দু প্রধানতঃ শিবভাবময় এবং বীজ প্রধানতঃ শক্তিভাবময়। এই বিন্দু ও বীজ পরস্পর সম্মিলিত হইলে যে নাদের অভিব্যক্তি হয় তাহাতে শিব ও শক্তি উভয়ের মিশ্রণভাব থাকে। পরনাদ এবং মহানাদে যেমন ভেদ আছে, ঠিক সেইপ্রকার মহানাদ এবং নাদেও

ভেদ আছে। বিন্দু, বীজ ও নাদ এই তিনটি লইয়া কুণ্ডলযন্ত্র আবির্ভূত হয়। সমষ্টিভাবে এই তিনটিই কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ। এই তিনটি সম্মিলিতভাবে ত্রিকোণাত্মক যোনিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা হইতেই সমগ্র জগতের সূক্ষ্ম উপাদানগুলি প্রয়োজন অনুসারে নির্গত হইয়া থাকে। এই ত্রিকোণই বস্তুতঃ কারণদেহের নামান্তর। বিন্দু ও বীজ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়াই কার্য করিয়া থাকে। পরবিন্দু মহানাদের মধ্য দিয়া অপর বিন্দুতে অবতীর্ণ হইলে এই বিন্দু যখন বীজকে স্পর্শ করে তখন বীজসকল বিন্দুযুক্ত হইয়া গুঞ্জন করিতে থাকে। ইহাই নাদ। এই বীজের শাস্ত্রসম্মত পারিভাষিক নাম 'অ-ক-থ' ত্রিকোণ, যাহা তিনটি পৃথক্ রেখার সংযোগে রচিত হয়। এই 'অ-ক-থ' চক্র সমষ্টি-বর্ণমালার দ্যোতক। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে দেওয়া যাইবে। এই ত্রিকোণটি গুরুর আসনরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ পরবিন্দুই গুরুর আসন। তাহাতে প্রকাশমান গুরুমূর্তি অর্ধনারীশ্বররূপে নিজেকে প্রকট করিয়া থাকেন। উহা একাধারে শিবশক্তি উভয়াত্মক। পরবিন্দু ক্ষুব্ধ হইলে যে মহানাদ উৎপন্ন হয় তাহার দুইটি প্রবাহ আছে—একটি উর্ধ্বমুখ এবং অপরটি অধোমুখ। উর্ধ্বমুখ প্রবাহটি আদিনাদ স্বরূপে যাইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। এই আদিনাদ জগৎ সৃষ্টির অভিমুখে ইচ্ছা-শক্তির প্রথম আত্মপ্রকাশ। আর যেটি অধঃপ্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করা হইল তাহা বীজকে গর্ভে ধারণ করিয়া বীজের কার্যস্বরূপ নাদ পর্যন্ত বিকশিত করিয়া কুণ্ডলিনী যন্ত্রস্বরূপে পরিণত হয়। পরবিন্দুর ক্ষোভক কাল মহাকাল নামে প্রসিদ্ধ। 'অ-ক-থ' রেখাবিশিষ্ট ত্রিকোণটি সমগ্র বর্ণাবলীর দ্যোতক। এই সকল বর্ণের প্রত্যেকটি হইতেই স্বভাবসিদ্ধ ধ্বনি নির্গত হয়। এই সূক্ষ্মধ্বনি সমষ্টিভাবে নাদরূপে পরিচিত। সাধক যখন মানসিক জপের দ্বারা ইষ্টমন্ত্রকে সূক্ষ্মরূপে পরিণত করিয়া সুষুম্নাস্থিত শূন্যমধ্যে ছাড়িয়া দেন, তখন ঐ ধ্বনি নাদ পর্যন্ত উত্থিত হইয়া উহার সহিত মিলিত হইয়া যায়। নাদ হইতে মহানাদে উহা অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না। অবশ্য বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তাহাও যে না হয় এমন নহে। তবে তখন উহা নাদ নামে প্রসিদ্ধ না হইয়া নাদান্ত নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্যহৃদয়ে অস্ফুটভাবে যে সকল চিন্তারাশি ক্রীড়া করিয়া থাকে তাহা নাদেরই খেলা। জ্ঞানরূপে অথবা ভাবরূপে কিংবা তদ্ভিন্ন অপর কোন বৃত্তিরূপে অন্তঃকরণের যে পরিণাম হয় তাহা নাদের দ্বারা ব্যাপ্ত। এইজন্যই উহা বর্ণাবলীর অতীত নহে। কিন্তু মহানাদরূপে যে চৈতন্যশক্তির খেলা উপলব্ধি করা যায় তাহা সর্বপ্রকার বিকল্পের অতীত।

ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। বিবর্ততেঽর্থ-ভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ ॥" অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত অক্ষরব্রহ্ম অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম

অর্থরূপে বিবর্তিত হন। তাহা হইতে জগতের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সর্বপ্রকার জাগতিক প্রক্রিয়ার মূলে অর্থরূপে শব্দের বিবর্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ শব্দ হইতে অর্থের আবির্ভাব হয় এবং তাহা হইতে জগতের খেলা নিষ্পন্ন হয়।

দৃষ্টিকোণের পার্থক্য অনুসারে শব্দব্রহ্মের ধারণা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পৃথক্ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান স্থলে আমরা যে ধারা অবলম্বন করিয়া বিশ্লেষণ করিতেছি তাহাতে পরবিন্দু ও অপরবিন্দুর মধ্যাবস্থাতে শব্দব্রহ্মের স্থিতি বুঝিতে পারা যায়। কালের দ্বারা পরবিন্দুর ভেদ হইলে যে অস্ফুট মহানাদ অভিব্যক্ত হয় তাহাই শব্দব্রহ্ম। পরবিন্দু ক্রিয়াশক্তিপ্রধান। সুতরাং ক্রিয়াশক্তির উন্মেষ হইতেই শব্দব্রহ্মের স্ফুরণ বুঝিতে হইবে। শব্দব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয় ইহা সত্য, কিন্তু কি প্রণালীতে শব্দব্রহ্ম অথবা মহানাদ এইসকল তত্ত্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণ, যে সকল তত্ত্ব জগৎসৃষ্টির মূলীভূত উপাদান তাহারা বীজশক্তি হইতে স্ফুরিত হয়। সুতরাং মহানাদ বীজরূপে এবং বীজসকল তত্ত্বরূপে ক্রমশঃ স্ফুরিত হয়। ইহাই ক্রিয়া-শক্তির বিকাশের ক্রম। পরবিন্দু ফাটিয়া যাওয়ার পর উহা হইতে যে দুইটি অংশ প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে শক্তিপ্রধান অংশটির নাম বীজ এবং শিবপ্রধান অংশটির নাম বিন্দু। শিব-শক্তি পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া শিবাংশে শক্তি এবং শক্ত্যংশে শিবভাব বিদ্যমান থাকে।

এই বীজগুলি সেইজন্যই বিন্দু দ্বারা নিত্য জড়িত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই সকল বীজ বস্তুতঃ বর্ণসমষ্টিরই নামান্তর। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের স্থিতির তারতম্য নিবন্ধন অবস্থার তারতম্য দ্যোতিত হইয়া থাকে। সর্বপ্রথম অ-ক-থাদি ত্রিরেখা-সমন্বিত ত্রিকোণের রেখাত্রয়ের মধ্যে নিত্য বর্তমান বর্ণসকল প্রকাশ পায়। এই ত্রিরেখা বাস্তবিক পক্ষে কুণ্ডলিনীরই নামান্তর। ইহা কুণ্ডলিনীর কারণ অবস্থা। যতক্ষণ বর্ণরাশি কুণ্ডলিনী মধ্যে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ তাহারা জ্যোতির কণারূপে প্রকাশিত হয়। এই ত্রিরেখা 'বাগ্‌ভব ত্রিকোণ' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ব্রহ্মরন্ধ্রের নিম্নদেশে অবস্থিত। কিন্তু মেরুপথের উভয় প্রান্তে সহস্রদল কমল আছে বলিয়া এই বর্ণগর্ভ ত্রিকোণটির সত্তা যেমন এক পক্ষে মস্তিষ্ক মধ্যে উপলব্ধ হয়, তেমনি অপর পক্ষে উহা মূলাধারের সন্নিকটেও উপলব্ধ হয়। ইহাই পরাবাণীর অবস্থা।

মহানাদ হইতে একটি ধারা ঊর্ধ্বমুখে এবং অপর একটি ধারা অধোমুখে প্রসারিত রহিয়াছে। ঊর্ধ্বমুখের ধারাটি যে শক্তির দ্বারা বিধৃত তাহার নাম ঊর্ধ্বশক্তি, এবং যে ধারাটি অধোদিকে প্রসারিত তাহার ধারিকা শক্তির নাম অধঃশক্তি। যে অ-ক-থ ত্রিকোণের কথা বলা হইল তাহা এই অধঃশক্তির

অন্তর্গত। কিন্তু যখন ঐ শক্তি অবতীর্ণ হইয়া আজ্ঞাচক্র ভেদপূর্বক অধোদিকে প্রসারিত হয় এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ শূন্যপথে সঞ্চরণ করে তখন বিভিন্ন চক্র ও যন্ত্রাদি অবলম্বনপূর্বক ঐ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যে সকল বর্ণ ভ্রূ-মধ্যের ঊর্ধ্বপ্রদেশে পরম অব্যক্ত পদে বিরাজ করে তাহারাই শক্তির অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ-মধ্য ভেদ করিয়া মেরুপথে ষট্চক্রে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর সর্বনিম্নে গমনপূর্বক পুনরায় পূর্ববৎ অব্যক্তাবস্থা ধারণ করে। ষট্চক্রের বিভিন্ন দলে বিভিন্ন প্রকার বর্ণ রহিয়াছে। এইগুলি সেই মূল ত্রিরেখারই বর্ণ। বস্তুতঃ এই সকল বর্ণ ঠিক ঠিক বর্ণ নহে। ইহারা সূক্ষ্ম সৃষ্টিতত্ত্বের মূর্ত প্রকাশ। মহানাদে বা শব্দব্রহ্মে যে বিশাল নাদ ও জ্যোতিঃ প্রকাশমান তাহারা আংশিকভাবে এই সকল বর্ণের মধ্যেও প্রকাশমান। অতএব প্রত্যেকটি বর্ণ শুধু বর্ণ নহে, উহাতে নাদ এবং জ্যোতিও রহিয়াছে। এইগুলি কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে বিন্যস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ভিন্ন অপর কিছু নহে। ত্রিরেখাস্থ তত্ত্বগুলি কারণ, চক্রস্থ তত্ত্বগুলি সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়গোচর তত্ত্বগুলি স্থূল। কুণ্ডলিনী শক্তিকে আশ্রয় না করিয়া জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে কুণ্ডলিনী শক্তিই ভাব-বিকাশের মূল বলিয়া জগৎসৃষ্টির মূল উপাদান।

বর্ণের প্রথম আবির্ভাব ব্রহ্মরন্ধ্রের নিম্নে অ-ক-থ ত্রিরেখায়। ইহাই বর্ণমালার কারণরূপে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপস্থিতি। এই অবস্থাতে জ্যোতির কণিকারূপে কুণ্ডলিনীমধ্যে বর্ণসকল বিদ্যমান থাকে। বলা বাহুল্য, এই অবস্থায় বর্ণসকল সুষুপ্তবৎ অবস্থিত। ইহার পর সুষুম্নাপথে নাভিপদ্মে বর্ণসকল উদিত হইয়া ওখানকার তেজস্তত্ত্বে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় বাণী পশ্যন্তী নামে অভিহিত হয়। ইহাও জ্যোতিঃপ্রধান অবস্থা। যোগী ভিন্ন এই অবস্থার অথবা ইহার পূর্ববর্তী অবস্থার সন্ধান কেহ পাইতে পারে না। ইহার পরবর্তী অবস্থায় হৃৎপদ্মে বর্ণের উদয় হয়। এই সময় আন্তর নাদের প্রাচুর্য বর্ণমধ্যে অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার পর প্রাণবৃত্তির সহিত বর্ণসকলের সম্বন্ধ হয়। ইহা অন্তঃ-সংকল্প দশা বলিয়া পরিচিত। এতদপেক্ষা বহির্মুখ অবস্থায় বর্ণসকল কণ্ঠাদি স্থানসকলে বায়ুর আঘাতে উচ্চারিত হইয়া স্থূলভাব ধারণ করে এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে বাহ্য শব্দের আকারে পরিণত হয়।

আমরা পূর্বে যে মহানাদের কথা বলিয়াছি তাহা পরপ্রণবের নামান্তর। যখন পরবিন্দু কালের প্রভাবে বিভক্ত হইয়া পড়ে তখন এই মহানাদ ঐ বিভাগের প্রত্যেকটিতে অনুস্যূত হইয়া থাকে। মহানাদের দুইটি বৃত্তি বা শক্তি প্রধান-রূপে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে একটি মহানাদ হইতে পরনাদ পর্যন্ত বিস্তৃত

হইয়া রহিয়াছে এবং অপরটি অধোদিকে প্রসারিত রহিয়াছে। পূর্বে যে অ-ক-থ ত্রিরেখার কথা বলা হইয়াছে তাহা এই অধঃশক্তির অন্তর্গত। অ-ক-থ ত্রিকোণে নিত্যসিদ্ধ বর্ণমালা প্রকাশমান। ইহারও তিনটি স্থিতি লক্ষিত হয় অথবা চারিটিও বলা যাইতে পারে। প্রথমটি পরা, যাহাতে বর্ণমালার প্রথম আবির্ভাব হইয়া থাকে অথচ তাহা অভিব্যক্ত হয় না। ইহার পর উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত বর্ণরাশির উদয় হয়। সমগ্র সৃষ্টির মূলে বর্ণমালা বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই বর্ণমালাই সৃষ্টির বীজস্বরূপ। বর্ণসকল যেখানে পরস্পরের ভেদ বিগলিত করিয়া ধ্বনিরূপে ঊর্ধ্বগামী হয় তাহাই মহানাদের ঊর্ধ্বশক্তির ব্যাপার। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইবে, এক পক্ষে মহানাদই সৃষ্টির মূল কারণ। কারণ, মহানাদ হইতেই বীজসকলকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিব্যাপার প্রবর্তিত হয়। অপর পক্ষে, মহানাদই মুক্তিরও কারণ। কারণ, ঐ সকল বীজ পরস্পরে মিলিত হইয়া এবং পরস্পর ভেদ পরিহারপূর্বক ঊর্ধ্বগামী অখণ্ড ধ্বনিরূপে যখন পরিণত হয় তখনই উহা ঊর্ধ্বগতি লাভ করে, যাহার প্রভাবে জীব বিশুদ্ধ চিন্ময় সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

পরবিন্দু বিভক্ত হইয়া বিন্দু ও বিসর্গ সৃষ্টি করে। তন্মধ্যে বিন্দু এক ও অভিন্ন। ইহার নামান্তর ব্রহ্মবিন্দু। বিসর্গ দুইটি বিন্দু, যাহার একটিকে বিষ্ণুবিন্দু ও অপরটিকে রুদ্রবিন্দু বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ব্রহ্মবিন্দু হইতে যে রেখা প্রসৃত হইয়াছে এবং যাহা ষোড়শ স্বরের আশ্রয়স্থল তাহাকে বামা রেখা বলে। তদ্রূপ বিসর্গের প্রথম বিন্দু অর্থাৎ বিষ্ণুবিন্দু হইতে যে রেখা প্রসারিত হয় তাহাই বিষ্ণুরেখা। ইহা ব্রহ্মরেখার ন্যায় সৃষ্টির অনুকূল। রুদ্রবিন্দু হইতে যে রেখা বিরচিত হয় তাহার নাম রুদ্ররেখা। ইহা সৃষ্টির প্রতিকূল সংহাররেখা। বিন্দু হইতে বিসর্গ-মণ্ডল পর্যন্ত যে প্রবাহ তাহা 'হংস'প্রবাহ নামে পরিচিত। 'হং' শব্দে ব্রহ্মবিন্দু, ইহাতে শিবাংশ প্রধান। 'সঃ' শব্দে বিষ্ণু ও রুদ্রবিন্দু। তন্মধ্যে বিষ্ণুরেখা সৃষ্টির অনুকূল এবং সৃষ্ট জীবের রক্ষাকারক। রুদ্ররেখা সৃষ্টির প্রতিকূল। যখন বিন্দু হইতে বিসর্গের দিকে ধারা চলে তখন রুদ্ররেখা তিরোহিত থাকে। এই ধারার নাম 'হংস' ধারা। যখন ব্রহ্মরেখা তিরোহিত থাকে তখন রুদ্ররেখার প্রাধান্য হয় এবং জীব 'সোহং' ধারাতে পতিত হয়। 'হং' আকাশ-বীজ ও শিবময় এবং 'সঃ' প্রকৃতি-বীজ বা ধরা-বীজ ও শক্তিময়। বিন্দু হইতে বিসর্গমণ্ডল পর্যন্ত হংসধারা মহানাদের অধঃশক্তির অন্তর্গত। তাহার পর বিসর্গ হইতে বিন্দু পর্যন্ত সোহং ধারা।

নাদরহস্য

এখন উপসংহারে নাদের তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইতেছে। আত্ম-স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শাস্ত্রে যেসকল উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে নাদ-সাধনা অথবা নাদানুসন্ধান উৎকৃষ্ট উপায়ের মধ্যে পরিগণিত হয়। মহাজনগণ মুক্তকণ্ঠে নাদের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। প্রাচীনকালে বাগ্-যোগকে মুমুক্ষুজনের আশ্রয়যোগ্য সর্বাপেক্ষা সরল রাজমার্গ বলিয়া মনে করা হইত। পরবর্তী কালে সন্তগণ 'সুরত-শব্দ-যোগ' আখ্যা দিয়া এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ নামকীর্তনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া প্রকারান্তরে মনঃ-স্থৈর্যসাধনের পক্ষে ও মূঢ় চিত্তের বোধনের পক্ষে নাদের পরম উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। যোগ ও তান্ত্রিক-সাধনাতে মন্ত্র-জপের মধ্যেও নাদেরই সর্বাতিশায়ী মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

আত্মা নির্বিকল্প প্রকাশাত্মক স্বাতন্ত্র্যময় শিবস্বরূপ—ইহা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। কিন্তু জীব পরমস্বরূপে শিবময় হইলেও পতিত দশায় পরস্বরূপ ও কেবল-চিদ্রূপ অপরস্বরূপ উভয়ই বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। সে অনাত্ম-বস্তুকে আত্মা মনে করিয়া তাহাতে অহংভাবের আরোপ করিতেছে এবং তদনুসারে কর্ম সম্পাদনপূর্বক সুখ-দুঃখরূপে তৎফলের ভোগ করিতেছে। ইহাই তাহার মায়াধীন সাংসারিক জীবন।

অশুদ্ধ বিকল্পের শোধন না হওয়া পর্যন্ত আত্মা নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারে না এবং তাহার স্বাভাবিক ঐশ্বর্যও ফুটিয়া উঠে না। কিন্তু এই অশুদ্ধ-বিকল্প-যুক্ত আত্মার স্থিতি সকলের পক্ষে একপ্রকার নহে। এমন সব আত্মা আছেন যাঁহারা বিকল্পযুক্ত হইলেও অতি উচ্চ অধিকারসম্পন্ন। ইঁহাদিগকে নিয়মাদি অবলম্বনপূর্বক কোন বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয় না—ইঁহারা মন্ত্র, পূজা, ধ্যান, চর্যা—প্রভৃতি কোন নিয়ন্ত্রণের অধীন নহেন। ইঁহারা ভগবানের অতি তীব্র অনুগ্রহ-প্রাপ্ত মহাপুরুষ। ইঁহাদিগের আত্মস্বরূপে সমাবেশ কোন উপায়ের অপেক্ষা রাখে না। যথাসময়ে ভিতর হইতেই ইঁহাদের স্বাভাবিক বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া ইঁহারা বুঝিতে পারেন যে স্ব-প্রকাশ শিবরূপী আত্মাকে প্রকাশিত করিবার সামর্থ্য কোন সাধন বা উপায়েরই নাই। এইরূপ বিবেক উৎপন্ন হওয়ার ফলে ইঁহারা

একই ক্ষণে ক্রমরহিতভাবে শিবাবেশ লাভ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিবেচন-প্রকার কতকটা এইরূপ—একটিমাত্র চিদাত্মক অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব আছে; দেশ, কাল, উপাধি, আকার, শব্দ ও প্রমাণ উহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। এই তত্ত্বটি অন্য-নিরপেক্ষ বলিয়া স্বতন্ত্র এবং আনন্দঘন। শুধু তাহাই নহে। ইঁহারা ভিতর হইতেই অনুভব করিতে পারেন যে এই তত্ত্বই ইঁহাদের নিজ স্বরূপ। ইঁহারা প্রত্যেকেই 'আমি'রূপে এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং দেখিতে পান যে সমগ্র বিশ্ব এই 'আমি'তে প্রতিবিম্বের ন্যায় ভাসমান রহিয়াছে।

এইসব পুরুষের কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরে এমন সব আত্মা আছেন যাঁহারা পূর্বোক্ত আত্মবর্গের ন্যায় অখণ্ড-মণ্ডল-রূপ মহাপ্রকাশে স্বয়ং প্রবেশ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু আত্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন স্বাতন্ত্র্য-শক্তিকে উপায়রূপে আশ্রয় করিয়া বিনা আয়াসে উহাতে প্রবিষ্ট হন, আর কোন পৃথক্ উপায়ের অবলম্বন আবশ্যক হয় না। ইঁহারাও বিধি-নিষিধের অতীত এবং মন্ত্র, পূজা, ধ্যান, চর্যাদি নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। এই যে স্বাতন্ত্র্য-শক্তির কথা বলা হইল ইহাই দর্পণতুল্য বোধাকাশে প্রতিবিম্বাত্মক ভাবসমূহকে ফুটাইয়া তোলে। প্রকাশ হইতে পৃথক্‌রূপে ভাবসমূহ ভাসমান হইতে পারে না—এইজন্য সকল ভাবই স্বরূপতঃ প্রতিবিম্বাত্মক। পরমেশ্বরকে যে বিশ্বরূপ বলা হয় ইহাই তাহার কারণ—তিনি অজড় বা চিদাত্মক বলিয়া নিজ স্বরূপের আমর্শন সর্বদাই তাঁহাতে রহিয়াছে। নিজের মুখ যেমন নিজে দেখা, ইহাও কতকটা সেইরূপ। ইহাই স্বয়ং-প্রকাশ তত্ত্বের মহিমা। এই আমর্শনের মূল যাহা তাহারই নাম পরনাদ। 'পরা বাক্'রূপে ইহার স্বরূপ আগমশাস্ত্রে কীর্তিত হইয়া থাকে। স্বররূপী পরামর্শগুলি বীজ এবং উহা হইতে উত্থিত ব্যঞ্জনরূপী পরামর্শগুলি যোনি। এই সকল পরামর্শই শক্তির নিজ স্বরূপ। মায়িক ভূমিতে এবং মায়াতীত বিশুদ্ধ বিদ্যার স্তরে এইগুলি কার্য করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ শিবময় আত্মস্বরূপে ইহারা সমষ্টিভাবে 'পূর্ণ-অহন্তা'রূপ গ্রহণ করিয়া পরা-বাণীরূপে বিরাজ করে, কিন্তু বিশুদ্ধ বিদ্যার স্তরে ইহাদের মধ্যে মায়ার উন্মেষমাত্ররূপ কিঞ্চিৎ সংকোচ আবির্ভূত হয়। মন্ত্রের স্বরূপ এবং মন্ত্রাধিষ্ঠাতা গুরুর স্বরূপ এইখানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মায়িক ভূমিতে এই সকল পরামর্শ মায়িক বর্ণের রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইস্থলে ভেদ এবং বিভাগ উভয়ই পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হয়। এই সকল বর্ণ পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী দশাতে ব্যবহারযোগ্য হয় ও ক্রমশঃ বাহ্যরূপে প্রকট হইয়া তত্ত্বরূপে ফুটিয়া উঠে। এই সকল মায়ীয় বর্ণ জীবনীশক্তিশূন্য শবের ন্যায়—ইহাদের নিজের কোন সামর্থ্য নাই, কিন্তু পূর্ববর্ণিত শুদ্ধ পরামর্শসকল ইহাদিগকে উজ্জীবিত

করিলে ইহারা কার্যক্ষম হয়। তখন এইসকল বর্ণ বীর্যসম্পন্ন হইয়া ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। যে পুরুষ নিজের আত্মাকে সাক্ষাৎকার করার অবসরে দেখিতে পায় যে উহাই সকল পরামর্শ অথবা শক্তির একমাত্র বিশ্রান্তি-স্থল, উহাতেই সমস্ত তত্ত্ব ও ভুবন প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে, সে বিনা পরিশ্রমে নির্বিকল্প ভগবৎস্বরূপে সমাবেশ লাভ করে, তাহার অন্য কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না—এমন কি বিকল্প-সংস্কারের জন্য ভাবনাও আবশ্যক হয় না।

যে সকল আত্মা আরও নিম্নস্তরে আছে তাহাদের অধিকার আরও সঙ্কুচিত। পূর্ববর্তী স্তরে বিকল্প-সংস্কারে ক্রম থাকে না—উহা একই ক্ষণে সম্পন্ন হয়, কিন্তু নিম্নস্তরে ক্রম থাকে এবং ইহার নাম ভাবনা। কিন্তু ভাবনার পূর্বে সৎ-তর্ক সদ্‌আগম ও সদ্‌গুরুর উপদেশের আবশ্যকতা আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে শুদ্ধ বিকল্প দ্বারা অশুদ্ধ বিকল্পের সংস্কারকার্য সম্পন্ন করিতে হয়। অনাদি কাল হইতে প্রতি জীব-হৃদয়ে 'আমি বদ্ধ' এইপ্রকার যে ধারণা নিরূঢ় রহিয়াছে উহাই অশুদ্ধ বিকল্প—উহা হইতেই সংসার উৎপন্ন হয়।

ভগবানের অনুগ্রহ-শক্তি তীব্র মাত্রায় সঞ্চারিত হইলে সদ্‌আগম প্রভৃতি ক্রম অবলম্বন করিয়া বিকল্প শোধিত হয় ও পরতত্ত্বে প্রবেশলাভ ঘটে। পরতত্ত্ব শুদ্ধ বিকল্পেরও বিষয় নহে। শুদ্ধ বিকল্প দ্বারা অশুদ্ধ দ্বৈত-বাসনা নিবৃত্ত হয়, পরতত্ত্বের প্রকাশনে ইহার কোন কারণতা নাই। পরতত্ত্ব সর্বত্র সর্বরূপ বলিয়া স্বপ্রকাশ, বিকল্পের কোনপ্রকার প্রভাব উহার উপর পড়ে না। শক্তিপাত অত্যন্ত অধিক হইলে আপনা আপনিই হৃদয়াভ্যন্তরে সৎ-তর্কের উদয় হয়। ইহাকে সাধারণতঃ 'দৈবী দীক্ষা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। শক্তিপাতের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হইলে সাক্ষাৎভাবে সৎ-তর্ক উদিত হয় না বটে, কিন্তু আগমকে আশ্রয় করিয়া হয়। আগমের নিরূপণ যিনি করেন তিনি গুরু। আগম শঙ্কাহীন সজাতীয় বিকল্পাত্মক, উহা হইতে সমুচিত বিকল্প উৎপন্ন হয়। এই সকল বিকল্প বিশুদ্ধ বিকল্প, ইহাদের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই সৎ-তর্কের স্বরূপ। প্রচলিত ভাষায় যাহাকে ভাবনা বলা হয় তাহা এই সৎ-তর্কেরই ধারামাত্র। যে ভূতার্থ অস্ফুট বলিয়া অভূতবৎ বিদ্যমান থাকে তাহাও ইহা দ্বারা পরিস্ফুট হয়। ইহাই বস্তুতঃ শুদ্ধ বিদ্যার প্রকাশ এবং যোগের একমাত্র অঙ্গ। ইহাই সাক্ষাৎ যোগাঙ্গ—অন্যান্য যোগাঙ্গ অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবধান-বিশিষ্ট।

কিন্তু যে সকল সাধকের আধারগত যোগ্যতা আরও কম তাহাদের মলিন বিকল্প শোধনের জন্য শুদ্ধ বিকল্প পর্যাপ্ত নহে। উহাকে সাহায্য করিবার জন্য জীবসত্তার দিক্‌ হইতে কোন না কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এই সকল

উপায়কেই সাধারণতঃ জীবনে সাধন বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই সকল সাধন বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে তিনটি প্রধান—

১। একটি ধ্যানাত্মক। ইহা বুদ্ধির কার্য। বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম অনুসন্ধান।

২। দ্বিতীয়টি স্থূলে উচ্চারণাত্মক এবং সূক্ষ্মে বর্ণাত্মক। ইহা প্রাণের কার্য। ইহাই প্রাণের অসাধারণ ধর্ম।

৩। তৃতীয়টি করণ-মুদ্রাদি ক্রিয়াত্মক। ইহা দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ব্যাপার। ইন্দ্রিয়, বিষয়, প্রাণাদি সকলের পিণ্ডরূপে একীভাবে সংস্থানই দেহের বিশিষ্ট ধর্ম।

যে উপায় দেহ হইতেও বাহ্য তাহা অত্যন্ত স্থূল উপায়। এখানে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে না।

যিনি বুদ্ধির স্তরে অভিমানসম্পন্ন তাঁহার পক্ষে ধ্যানই শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি প্রাণময় ভূমিতে অধিষ্ঠিত তাঁহার পক্ষে উচ্চারণই প্রধান উপায়। যে সাধকের দেহাত্মভাব অত্যন্ত প্রবল তাঁহার পক্ষে করণ মুদ্রা আসন প্রভৃতি উপায় বিকল্প-উপশমের পক্ষে সমধিক উপযোগী। কিন্তু এই সকলের পৃষ্ঠদেশে শূন্য ভূমিতে সাধনার কোন উপযোগ সম্ভবপর নহে।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি—এই বিশ্ব প্রমাতৃপ্রমেয়াত্মক ;—ইহা আত্মার সঙ্গে অবিভক্তরূপে অবস্থিত বলিয়া সকল বৈচিত্র্যসত্ত্বেও বস্তুতঃ প্রকাশাত্মক। শুদ্ধ সংবিৎস্বরূপ আত্মা পূর্ণ হইয়াও লীলাচ্ছলে স্বাতন্ত্র্য-বলে নিজের মধ্যে অপূর্ণত্ব অবভাসন করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ হইতে অবিভক্ত সমগ্র বিশ্বকে নিজ হইতে বিভক্তবৎ করেন এবং নিজকে তখন বিশ্বোত্তীর্ণরূপে আমর্শন করিয়া বিবিক্ত আকাশের রূপ ধারণ করেন অর্থাৎ সকল প্রকার ভাব হইতে মুক্ত হইয়া অনাবৃতরূপে স্ফুরিত হন। ইহাই চৈতন্যের শূন্যরূপতা। যে প্রমাতা এই দশার অধিষ্ঠাতা তাহাকেই শূন্যপ্রমাতা বলা হয়। মনে রাখিতে হইবে, এই শূন্য বস্তুতঃ শূন্য নহে, ইহা অভাবেরই নামান্তর—অর্থাৎ যাবতীয় অবলম্বন-ধর্ম, সত্ত্বগর্ব ও ক্লেশ না থাকিলে সেই অভাবকেই শূন্য বলিয়া গণনা করা হয়। এই অবস্থায় ভাবাত্মক অনুভূতি হয় না।

শূন্যপ্রমাতা কিঞ্চিৎ বহির্মুখ হইলেই প্রাণপ্রমাতার রূপে পরিণত হয়। শূন্যপ্রমাতা নিজকে অপূর্ণ মনে করে বলিয়াই তাহার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং এই আকাঙ্ক্ষার বিষয়কে গ্রহণ করিবার জন্য সে নিজ সত্তা হইতে পৃথক্‌কৃত আন্তর ও বাহ্য পদার্থের দিকে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ তাহার বহির্মুখভাবের উদয় হয়। এই সময়ে সে প্রাণপ্রমাতা নামে অভিহিত হয়।

প্রাণ কি ? কিঞ্চিৎ চলন অথবা স্পন্দনের প্রথম প্রসর। সংবিৎ বা চৈতন্য-

শক্তি শূন্যতা ফুটাইয়া তাহার পর প্রাণরূপে ধারণ করে। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধির আবির্ভাবের পূর্বেই প্রাণের উল্লাস ঘটিয়া থাকে, কারণ অন্তঃকরণতত্ত্বের সারভূত বুদ্ধি প্রাণকে আশ্রয় করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। জীবের স্বাধিষ্ঠিত ভূমির তারতম্যবশতঃ তাহার সাধনপ্রকারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। নিম্নতম স্তরের আত্মাতে জীবভাব প্রবল থাকে বলিয়া জীবের আধারনিষ্ঠ বৈচিত্র্য অনুসারে তাহার সাধনের বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক।

অতএব প্রাণভূমিতে উচ্চার, বুদ্ধিভূমিতে ধ্যান এবং দেহভূমিতে করণাদি উপায়রূপে পরিগণিত হয়। ইহার মধ্যে উচ্চারাদি সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ উপায়, ধ্যানাদি উহার তুলনায় বহিরঙ্গ জানিতে হইবে। প্রাণাদি জড় ও অপারমার্থিক হইলেও উহাদের উচ্চারাদি পারমার্থিক স্বরূপপ্রাপ্তির সহায়ক হইতে বাধা নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, প্রাণাদি প্রমাতাতে অহন্তা রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞাতৃত্ব ও কর্তৃত্বরূপ পরম ঐশ্বর্য বিকল্পরূপে উপস্থিত হইতে পারে। কারণ, বিভিন্ন প্রকার অবচ্ছেদের মধ্য দিয়া পরিস্ফুটরূপে অবধারণ সম্ভবপর। ইহার ফলে তদ্গত উচ্চার অথবা ধ্যান পারমার্থিক স্বরূপলাভের নিমিত্ত হইতে পারে। শূন্যপ্রমাতাতেও অবশ্য ঐ প্রকার ঐশ্বর্য সম্ভবপর, কিন্তু প্রাণাদিপ্রমাতাতে যেমন নিয়ত অবচ্ছেদ আছে শূন্যপ্রমাতাতে সেইপ্রকার কোন অবচ্ছেদ নাই। সেইজন্য উহা বিকল্পিত হইতে পারে না এবং তাই পরমার্থপ্রকাশের নিমিত্তও হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাণাদি জড় হইলেও যদি তাহাদের ব্যাপার পারমার্থিক স্বরূপপ্রাপ্তির নিমিত্ত হইতে পারে, তাহা হইলে ঘটপটাদি বাহ্য জড় পদার্থের ব্যাপারও সেরূপ নিমিত্ত হইতে পারে না কেন? ইহার সমাধান এই—প্রাণাদি জড় ও চিৎ উভয় ধর্মবিশিষ্ট। মায়িক সৃষ্টিবিকাশের সময় পরমেশ্বর স্বেচ্ছায় বাহিরে অবভাসিত ভাবরাশির মধ্য হইতে প্রাণাদি কোন কোন জড় পদার্থে স্ব-গত অহন্তাত্মক কর্তৃত্ব অভিষিক্ত করিয়া উহাকে গ্রাহকরূপে রচনা করেন, কিন্তু ঘট-পটাদি জড় পদার্থকে ইদন্তার বিষয়ীভূত করিয়া চিদ্রূপতার লঙ্ঘন-পূর্বক গ্রাহ্যরূপে প্রকটিত করেন। সেইজন্য প্রাণাদি জড় হইলেও এক হিসাবে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ চিৎ। জীব যখন চিদ্রূপ জড় প্রাণাদির জড়াত্মকভাব আচ্ছাদন করিয়া অর্থাৎ উহাতে অহন্তা অভিমান অভিভূত করিয়া স্বাতন্ত্র্যের উল্লাসবশতঃ চিদ্রূপ আকারে পারমার্থিক স্বরূপে, অর্থাৎ অকৃত্রিম পূর্ণাহন্তার আস্পদরূপে, নিজকে অনুভব করে, তখন ঐ জীব আর জীব থাকে না—সে অম্বয় হয় এবং সংবিৎমাত্ররূপে স্ফুরিত হয়।

দুই

নাদতত্ত্ব বুঝিতে হইলে আমাদিগকে পূর্ববর্ণিত ত্রিবিধ সাধনের মধ্যে প্রাণগত উচ্চারের রহস্যটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই উচ্চার। ইহার দুই প্রকার বৃত্তি আছে—একটি সামান্য বা স্পন্দাত্মক ও ভেদহীন এবং অপরটি বিশিষ্ট, যাহা প্রাণাদি ভেদে পাঁচ প্রকার। সামান্য বৃত্তি বিশিষ্ট বৃত্তিনিচয়ের ভিত্তিস্বরূপ। ইহা দেহকে আত্মসাৎ করিয়া আছে বলিয়াই দেহ অচেতন হইলেও চেতনবৎ প্রতীত হয়।

এই প্রাণাত্মক উচ্চারে একটি অব্যক্ত ধ্বনি নিরন্তর স্ফুরিত হইতেছে। ইহাকে অনাহত নাদ বলে। ইহা প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে স্বাভাবিক ভাবে সর্বদাই চলিতেছে—ইহার কোন কর্তা নাই এবং কোন প্রতিরোধকও নাই। অবিভক্তভাবে যাবতীয় বর্ণ ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে—ইহাই বর্ণোৎপত্তির নিমিত্ত। তাই ইহাও 'বর্ণ' পদবাচ্য।

অনাহত নাদের মুখ্য অভিব্যক্তি-স্থান দুইটি বীজ—একটি সৃষ্টিবীজ "স"কার ও দ্বিতীয়টি সংহারবীজ "হ"কার। এই দুইটি বীজ আশ্রয় করিয়াই নাদ অভিব্যক্ত হয়। যোগিগণ জানেন যে প্রাণের আদিমূলে অনুসন্ধান করিলে চিদাকাশের প্রথম স্পন্দনটিই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। চিদাকাশের স্পন্দনটিও বস্তুতঃ স্বতঃসিদ্ধ নহে—ইহা পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির যোগাবস্থা হইতে উদ্ভূত। বিন্দুযুক্ত "হ"কার (হং) পরম পুরুষের ও বিসর্গযুক্ত "স"কার (সঃ) পরমা প্রকৃতির বাচক। উভয়ের যুক্তাবস্থাই আদি হংসের রূপ, যেটিকে নিঃস্পন্দ ও স্পন্দতত্ত্বের সন্ধিস্থান মনে করা যাইতে পারে। এই আদি প্রাণকেই সংবিৎ-এর প্রথম পরিণাম বলে—ইহাই সৃষ্টির সকল তত্ত্বের ধারিকা শক্তি। আমাদের দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের খেলা এই হংসরূপী প্রাণেরই ব্যাপার। হং-কারে বহির্মুখ গতি অথবা অনন্তের দিকে গতি হয় এবং সঃ-কারে অন্তঃপ্রবেশ বা দেহে প্রত্যাবর্তন সূচিত হয়। এই গতাগতির নিয়ামক আপাততঃ ত্রিগুণস্থ ঈশ্বর ও মূলে কুলাকুলে অবস্থিত পরম হংস। ইহাই অজপা মন্ত্র, যাহার জপ প্রতি মনুষ্য অহোরাত্রে ২১৬০০ বার করিয়া থাকে।

তিন

সৃষ্টিক্রমে শব্দের গতি পরা বাক্ হইতে বৈখরী বাকের দিকে, কিন্তু সাধনক্রমে সংহার অথবা প্রত্যাহারের ধারা অবলম্বিত হয়। তখন শব্দের গতি হয় ক্রমশঃ বৈখরী হইতে মধ্যমা ও পশ্যন্তীর মধ্য দিয়া পরা বাকের দিকে। বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে শব্দের উচ্চারণ হয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা শ্রুত হয় তাহা শব্দের বৈখরী অবস্থা। ইহাই শব্দের স্থূল রূপ। জপ ও

কীর্তনাদিতে বৈখরী বাক্‌কে আশ্রয় করিয়াই সাধনকার্য আরব্ধ হয়। এই কার্যের মূলে কর্তার ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব অভিমান বিদ্যমান থাকে। অন্যান্য কর্ম যেমন সংকল্পমূলক ইহাও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু গুরুদত্ত মন্ত্র অথবা ভগবন্নাম নিষ্ঠাপূর্বক যথাবিধি উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমশঃ এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যখন চেষ্টাপূর্বক উচ্চারণ আবশ্যক হয় না। মন্ত্র বা নাম তখন আপনিই কণ্ঠ হইতে স্ফুরিত হইতে থাকে অথবা কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইলে হৃদয় হইতে চলিতে থাকে। সুতরাং স্থূলভাবে উচ্চারণের সামর্থ্যও তখন থাকে না অথচ ভিতর হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ চলিতে থাকে, ইহা স্পষ্টই শুনিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থাকে সাধকগণ সাধারণতঃ জপ করা বা নাম করা বলেন না, ইহা জপ ও নামের আপনা আপনি হওয়ার অবস্থা, কারণ ইহা কাহারও ইচ্ছা বা প্রযত্নের অপেক্ষা রাখে না। সাধক শুধু অবহিত চিত্তে এই ভিতরকার নামের খেলা লক্ষ্য করিয়া আনন্দ লাভ করেন।

দেখিতে পাওয়া যায় যে সদ্‌গুরু-প্রদত্ত নাম চৈতন্য-সম্পন্ন বলিয়া সাধকের হৃদয় পরিষ্কৃত থাকিলে আপনা আপনিই চলিতে থাকে। উহাকে চেষ্টা করিয়া চালাইতে হয় না, উহা শুধু একাগ্রভাবে শ্রবণ করিতে হয়। সাধকের দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভ্যাসের ফলে, বিশেষতঃ শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রভাবে, সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত জপও ঐ প্রকার অবস্থাতে পরিণত হয়। ইহাই মন্ত্রচৈতন্যের পূর্বাভাস। এই অবস্থার উদয় হইলে স্বভাবের ধারাটি উন্মুক্ত হয় বলিয়া পুরুষকারের আবশ্যকতা ক্রমশঃ কমিয়া আসে। তত্ত্ববিশ্লেষণের ফলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ যে পরিমাণে কর্তৃত্বের অভিমানে আবদ্ধ এবং পূর্ব সংস্কার ও ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা সংকুচিত ঠিক সেই পরিমাণে তাহার প্রাণের ক্রিয়াও চৈতন্যের স্বাভাবিক গতি হইতে বঞ্চিত। ঐ সময়ে তাহার প্রাণ বক্রগতি-সম্পন্ন থাকে বলিয়া ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী অবলম্বনপূর্বক ক্রিয়া করিতে থাকে। যথাবিধি সাধন অনুষ্ঠিত হইলে প্রাণ ও অপানের বিরুদ্ধ প্রবাহ ক্রমশঃ সাম্য প্রাপ্ত হয় ও ঐ সমশক্তি সুপ্ত কুণ্ডলিনীর জাগরণবশতঃ মধ্যনাড়ী সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হইয়া সরল গতিতে ঊর্ধ্বমুখে সঞ্চালিত হইতে থাকে। এই ঊর্ধ্বদিকে চলন বা চরণই 'উচ্চরণ' নামে অভিহিত হয়। প্রাণের সঙ্গে মনও ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও নির্মল হইয়া ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। কুণ্ডলিনীর প্রবোধনে প্রাণ ও মন একসঙ্গে সংস্কার লাভ করে। কুণ্ডলিনীশব্দ-মাতৃকা, বিন্দু বা বিশুদ্ধ সত্ত্ব ইহার নামান্তর। মন ও বায়ুর ঊর্ধ্বমুখ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপ ধারণপূর্বক ঊর্ধ্ব দিকে বহিতে থাকে। নাদের অধিষ্ঠান সুষুম্না। ইহা অধঃশক্তি দ্বারা উত্থিত হইয়া,—মূলাধার হইতে জাগিয়া উঠিয়া—প্রাণাত্মিকা ঊর্ধ্ব শক্তি দ্বারা সমগ্র জগৎ ও তত্তৎ ভূমির অধিষ্ঠাতৃরূপ

কারণবর্গকে ভেদ করিয়া ঐ সাষুম্না নাড়ীরই উপরিভাগে নির্গত হয় এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে বিশ্রান্ত হইয়া সর্বভূতে চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতঃ নাদান্ত স্থান ব্রহ্মরন্ধ্রের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে—ঐখানেই নাদ লীন হইয়া সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। এই নাদ অব্যক্ত ধ্বনি বা অচল অক্ষর মাত্র।

প্রকৃত অনাহত নাদ অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্বে ইড়া পিঙ্গলার ক্রিয়া মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার শ্রুতিমধুর স্থূলে নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। মন প্রাণ ও কুণ্ডলিনীর যুক্তভাবে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর নাড়ীমার্গে সঞ্চরণের ফলে ঐ সকল আনন্দদায়ক ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। ঐগুলি বিভিন্ন স্তর হইতে উদিত হয় এবং উহাদের সংখ্যা বস্তুতঃ অগণিত হইলেও সাধারণতঃ উহারা নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। গুরুর উপদেশ এই যে, ঐ সকল ধ্বনির কতকগুলি অনাহতপ্রাপক হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহারা অনাহত নহে। তাই ঐগুলিকে পরিহার করিয়া যেটি বাস্তবিক অনাহত ধ্বনি বা পরম নাদ তাহাকেই আশ্রয় করিতে হয়। পক্ষান্তরে, এমনও হইতে পারে যে ঐ সকল মধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে অকস্মাৎ গুরুকৃপায় অনাহত নাদ শ্রবণপথে আসে। তখন ঐ সকল অবান্তর ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যায় না, কারণ ঐ সময়ে মন অনাহতে লীন হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশদ্বার খুলিয়া যায়।

কিন্তু ইহার মধ্যেও ক্রম আছে। অবিচ্ছিন্ন নাদের উদয় মধ্যমা বাকের আবির্ভাব সূচিত করে। বৈখরী বাকে সাধকের অভিমান-মূলক কণ্ঠক্রিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যমার উদয়ে অনেক সময় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায় অথবা রোধ ঘটিতে আরম্ভ হয়। একদিকে যেমন কণ্ঠদ্বার নিরুদ্ধ হয়, অপরদিকে তেমনি মধ্যনাড়ীর অধোদ্বার ক্রমশঃ অধিক উন্মীলিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় প্রাণ, মন ও কুণ্ডলিনী সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া মধ্যমার্গে প্রবিষ্ট হয়। ক্রমশঃই দৃষ্টির অন্তর্মুখতা বাড়িতে থাকে। ফলে অবিদ্যাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশ নির্মল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোকিত হইয়া উঠে। বাসনার কালিমা বা কুজ্ঝটিকা চিত্ত হইতে অপসৃত হয়। অন্তরাকাশ নির্মল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়সরোবরস্থ ভাব-কমলটি প্রস্ফুটিত হইয়া ঊর্ধ্বমুখ হয়। অনাহতের সূচক অবান্তর নাদসকলও নাড়ী-শোধন, ভূত-শোধন ও চিত্ত-শোধনের কার্য করে। বস্তুতঃ চেতন শব্দই জ্যোতিরূপে এই সংস্কারকার্য সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থাতেও সাধারণতঃ স্থিরভাবে জ্যোতিদর্শন হয় না, তবে তমোহরণরূপ জ্যোতির কার্য অবাধে চলিতে থাকে। তমোনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল অবান্তর ধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। পরে এমন একটি স্থিতির উদয় হয় যখন নির্মল বাহ্য আকাশে সূর্যমণ্ডলের উদয়ের ন্যায় বিশুদ্ধ অন্তরাকাশে জ্যোতির মণ্ডল স্পষ্টরূপে ভাসিয়া উঠে। এই ব্যাপারটি ক্রমিক

হইতে পারে অথবা ক্রমহীন একই ক্ষণেও হইতে পারে। এইটি মধ্যমা পার হইয়া পশ্যন্তী অবস্থায় বাকের সঞ্চারের লক্ষণ। পূর্ণ পশ্যন্তী অবস্থার উদয় হইলে পূর্ববর্ণিত নাদধ্বনি সকল থাকিয়াও যেন আর থাকে না অর্থাৎ তখন আর শ্রুতিগোচর হয় না, কারণ ঐ সময়ে মন উপরম প্রাপ্ত হয়। ইহাই মন্ত্রাত্মক ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকারের অবস্থা, ইহাই ষোড়শ কলাবিশিষ্ট আত্মার ষোড়শী বা অমৃত কলার অভিব্যক্তির সূচনা। এই অবস্থাতে আত্মার অধিকার নিবৃত্ত হয়, কারণ ভোগ ও অপবর্গ এই দুইটি পুরুষার্থ তখন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ত্রয়ীবাকের এইখানেই উপশম হয় জানিতে হইবে। জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি যেমন চরমে অস্মিতাতে উৎকর্ষ লাভ করে, তদ্রূপ এই জ্যোতিদর্শনও ক্রমশঃ নিজের সত্তা-সাক্ষাৎকারে পর্যবসিত হয়। বৈখরীতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে পরস্পর ভেদই থাকে, মধ্যমাতে উভয়ের মধ্যে ভেদও থাকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভেদও থাকে, কিন্তু পশ্যন্তীতে ভেদ মোটেই থাকে না। তখন একমাত্র অভেদই বিরাজ করে অর্থাৎ পশ্যন্তী অবস্থায় শব্দ ও অর্থ অভিন্ন হয়—ইহারই নাম মন্ত্রসাক্ষাৎকার। ইহার পর সর্ব বিকল্পের উপশম হইলে যখন পূর্ণ অহন্তার বিকাশ হয় তখনই বুঝিতে হইবে পরা বাকের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। এই পরা বাক্ই পরমেশ্বরের পরম শক্তি এবং ইহা তাঁহার সহিত অভিন্ন। ইহার স্বরূপ নিত্যোদিত এবং এইজন্য এই স্থানেই জীব নিজের শিবভাবকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশ্যন্তীতে অখণ্ড জ্যোতির্মণ্ডল দর্শন হয়, চিদাকাশে এই জ্যোতির্মণ্ডল ভেদ করিতে পারিলে স্বয়ংপ্রকাশ নিজ স্বরূপে ফুটিয়া উঠে। তখন আর আকাশ থাকে না, সুতরাং চিদাকাশও থাকে না, নিজের মধ্যেই নিজ স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। এইজন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"স্বে মহিম্নি"। 'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমচিন্ত্যং শ্যামসুন্দরম্'—ইহারই নাম জ্যোতিভেদে স্বরূপের প্রাপ্তি। পশ্যন্তীর যেটি পৃষ্ঠভূমি তাহাই পরা। দৃষ্টির বৈলক্ষণ্যবশতঃ সেই পরাকে বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের অন্তরঙ্গ শক্তি বলিয়া যেমন কেহ কেহ মনে করেন, তেমনই কেহ কেহ উহাকে ভেদ করাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই দ্বিতীয় মতে পরা বাক্ই শব্দব্রহ্মরূপ সূর্যমণ্ডল এবং ইহাকে ভেদ করিয়া আত্মস্বরূপে স্থিত হওয়াই মহাজ্ঞানের যথার্থ ফল।

চিৎশক্তি আত্মস্বরূপের অন্তরঙ্গ শক্তি। আনন্দশক্তিও তাই। কিন্তু এমন একটি স্থিতি আছে যেখানে চিৎশক্তি আত্মস্বরূপে সমরসভাবে বিরাজ করে বলিয়া তাহার প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে এই চিৎশক্তি ক্রিয়াত্মক রূপ ধারণ করে, অর্থাৎ চিৎস্বরূপে অক্ষুণ্ণ সাম্য থাকা সত্ত্বেও চিৎশক্তি যেন উদ্রিক্ত হইয়া মহামায়াকে ক্ষুব্ধ করে। মহামায়া কুণ্ডলিনী বা বিন্দুরূপে

বিশ্বের মূলে উপাদানস্বরূপে অব্যক্ত রহিয়াছে। উহা আছে কি নাই তাহার কোন নিদর্শন নাই, কারণ উহা অব্যক্ত। কিন্তু পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যরূপা চিৎশক্তি ক্রিয়ারূপে প্রবলতা ধারণ করিলে বিন্দু ক্ষুব্ধ হয়। তখন ঐ ক্ষুব্ধ বিন্দু হইতে নাদ ও জ্যোতির স্ফুরণ হয়। বস্তুতঃ নাদ ও জ্যোতি নিত্য বলিয়া এক হিসাবে বিন্দু-ক্ষোভের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। তখনকার ঐ জ্যোতি পরম প্রকাশরূপে এবং নাদ পরনাদরূপে কোন কোন স্থানে বর্ণিত হইয়া থাকে। বিশ্বের দৃষ্টি অনুসারে ঐ পরিস্থিতিতে নাদ কিম্বা জ্যোতি কিছুরই কল্পনা করা যায় না, কারণ উহা অব্যক্ত পদ। কিন্তু চিৎশক্তি ক্রিয়াত্মক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাদ ও জ্যোতি সমসূত্রভাবে সৃষ্টির মূল হইতেই ক্রমশঃ বহির্মুখে অধিকতর আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। এইজন্য চিৎশক্তির যেটা পরবিন্দুর অভিমুখ দিক্ সেটিকে নাদময় বলা চলে এবং যেটি উহার চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরের অভিমুখ দিক্ সেটিকে নাদাতীত বলা চলে। বস্তুতঃ চিৎশক্তিতে এইরূপ বিভাগ নাই এবং থাকিতে পারে না। অর্থাৎ শক্তির বহির্মুখ অবস্থায়ই নাদ ও জ্যোতি স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু অন্তর্মুখ অবস্থায় বিন্দু অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া বা ক্রিয়াশক্তির উন্মেষ নাই বলিয়া সবই এক পরম অব্যক্ত-রূপে বিদ্যমান থাকে। তখন নাদ নাই, বিন্দু নাই এবং শিব-শক্তিও যেন নাই, অথচ সবই আছে এক অব্যক্ত মহাসত্তারূপে।

এইজন্যই প্রাচীন আগমে পরবিন্দু ও পরনাদে কেহ কেহ অভেদ কল্পনা করিয়াছেন এবং কেহ কেহ ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। দ্বৈতদৃষ্টিতে পরবিন্দু হইতে পরনাদ ভিন্ন—এই নাদ সৃষ্টির হৃদয়নিহিত বীজরূপ নাদ নহে, কারণ তাহা বিন্দু হইতে আবির্ভূত হয়। কিন্তু ইহা বিন্দুর অতীত। ইহাকে কোন তত্ত্বের মধ্যে ফেলা যায় না অথবা ফেলিতে হইলে বিশ্বাতীত শক্তিতে অন্তর্ভূত করা চলে। এই স্থলে পরনাদ ও বিশুদ্ধ সংবিৎ বা চিৎসত্তা একপ্রকার অভিন্ন। অদ্বৈতদৃষ্টিতে পরা বাক্ আত্মার স্বরূপশক্তি এবং স্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত বলিয়া চিদ্রূপা। পরা শক্তি ও পরা বাক্ অভিন্ন—এইজন্যই এই শক্তিকে বোধের নিত্য-সিদ্ধ বাগ্‌রূপা শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহার অভাবে প্রকাশ প্রকাশমান হইয়াও 'স্বয়ংপ্রকাশ' পদ-বাচ্য হইতে পারে না। এই পরা বাক্ই আত্মার নিজের বিমর্শরূপা স্বরূপানুবিদ্ধ শক্তি।

বিন্দু ক্ষুব্ধ হওয়ার পরে যে নাদ ও জ্যোতির প্রাকট্যের কথা বলা হইল, তাহাই সৃষ্টির মূল। তবে মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টির মূলে সর্বত্রই দুইটি ব্যাপার বিদ্যমান রহিয়াছে। একটি ব্যাপারের মূলে একমাত্র স্বভাবই কার্য করিতেছে, পুরুষের ইচ্ছা বা প্রযত্নের কোন প্রয়োজন হয় না—শুধু সান্নিধ্যই পর্যাপ্ত। কিন্তু আর একটি ব্যাপারের মূলে ইচ্ছাশক্তি অথবা তদনুরূপ কোন

শক্তি বিদ্যমান আছে। প্রথম ব্যাপারটি না থাকিলে দ্বিতীয় ব্যাপারের কোন সম্ভাবনা থাকে না। বায়ুমণ্ডলে বায়ু সূক্ষ্মভাবে নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। সূর্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে নিরন্তর কিরণমালার বিকিরণ হইতেছে। এই-প্রকার স্বভাবের শক্তি স্বভাবের বশে নিরন্তর স্বকার্য সাধনের দিকে উন্মুখ হইয়া চলিতেছে। ইহা নিত্য এবং স্বয়ং স্ফূর্তিশীল। কিন্তু এই ক্রিয়াশীল শক্তিকে কোন প্রয়োজনসাধনে নিয়োগ করিতে হইলে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তি আবশ্যক হয়। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে এবং নির্দেশে ঐ স্বভাবের শক্তি ইচ্ছানুরূপ আকার ধারণ করে, ইচ্ছার প্রেরণা না থাকিলে উহা কোন কার্যই সাধন করে না। অথচ শক্তির স্পন্দন হইতে থাকে, ইহা নিশ্চয়। সাংখ্যে সদৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণামের কথা আছে। সদৃশ পরিণামে সৃষ্টি-আদি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, কারণ তখন গুণ-বৈষম্য হয় না, প্রকৃতিতে সাম্যভাবের খেলা চলিতে থাকে। কিন্তু ইচ্ছার সংস্রব ঘটিলে অথবা ভোগনিমিত্ত কর্মবীজের পরিপক্বতার ফলে অর্থ-সৃষ্টি সম্পাদনের জন্য ধর্মপরিণাম-সাধক তত্ত্বান্তর-পরিণাম স্থলে গুণগত বৈষম্য আপনিই ফুটিয়া উঠে। ইহা বিসদৃশ পরিণাম। স্বরূপ-পরিণাম আপনা-আপনিই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম-পরিণামের মূলে সাক্ষাৎভাবে ইচ্ছা বা কর্ম বিদ্যমান থাকে ও তত্ত্বান্তর-পরিণামে উহাই বিপ্রকৃষ্টভাবে থাকে। তান্ত্রিক যোগীর সৃষ্টিক্ষেত্রেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টিমুখে কলার প্রসার আপনা-আপনিই হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বের প্রসার ঠিক তদ্রূপ নহে। তারপর তত্ত্ব হইতে ভুবনের আবির্ভাব একপ্রকার অর্থ-সৃষ্টির অন্তর্গত বলিয়া স্ফুটভাবেই প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে। এইজন্য ইচ্ছা, কর্ম বা অধিকার ভুবন-সৃষ্টির পশ্চাতে থাকিতে বাধ্য।

চার

বর্তমান স্থলেও নাদ সম্বন্ধে এই রহস্যটি মনে রাখিতে হইবে। প্রাণের চলনে বর্ণাদির উদয় হইয়া থাকে। প্রাণের চলন দুইপ্রকার—একটি স্পন্দাত্মক ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয়টি ক্রিয়াত্মক ও প্রযত্নজন্য। যেটি স্পন্দনরূপ স্বাভাবিক চলন তাতে স্বভাবতঃই বর্ণের উদয় হয়। বর্ণের উদয়ে কাহারও ইচ্ছা বা প্রযত্ন আবশ্যক হয় না—বর্ণসকল নিয়তরূপ ও সর্বত্র অবিশিষ্ট। কিন্তু মন্ত্রপদাদির উদয় যোগীর ইচ্ছা ব্যতীত ঘটিতে পারে না—উহারা অগণিত ও অনিয়ত, বর্ণের ন্যায় পরিগণিত ও নিয়ত নহে। যোগী প্রয়োজনবিশেষের অনুরোধে বিশিষ্ট মন্ত্রাদি অভিব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে তদনুরূপ প্রযত্ন করেন এবং তাহার ফলে অভিপ্রেত মন্ত্রাদি উদিত হয়। এই উদয় অবশ্য প্রাণের চলনেই হয় তাহাতে

সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য ইচ্ছা ও প্রযত্ন আবশ্যক হয়। দীক্ষাকালে ভাবী শিষ্যের মন্ত্রোদ্ধারও এই প্রণালীতেই হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ণের অভিব্যক্তির জন্য ইচ্ছা বা কৃতির প্রয়োজন হয় না। উহা স্বভাবতঃই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে—বাস্তবিকপক্ষে উহা নিরন্তরই অভিব্যক্ত হইতেছে। চিৎশক্তি বা সংবিৎ স্পন্দরূপা। যখন সৃষ্টিমুখে উহা প্রাণরূপে পরিণত হয় তখন ঐ প্রাণকে ভিত্তি করিয়া বিরাট্ দেশ ও বিরাট্ কালের প্রাসাদ গড়িয়া উঠে। মূর্তি-বৈচিত্র্যের আভাসনশক্তি হইতেই দেশ এবং ক্রমের কলনা হইতে কাল উদ্ভূত হয়। সমগ্র বিশ্বই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে প্রাণ আছে বা স্পন্দ-শক্তির খেলা আছে সেখানে প্রবাহ থাকিবেই—মূলে এই প্রবাহটি সরল থাকে, পরে উহা ক্রমশঃ বক্রভাবে পরিণত হয়। নাদের যেটি পরম রূপ সেটি ঐ সরল প্রবাহেই পরি-স্ফুরিত হয়। তাহা সর্বদাই প্রকাশমান—তাহার তিরোভাব কখনই হয় না। কিন্তু নাদের অপর রূপের নিরন্তর উদয় ও অস্ত হইতেছে। উভয়ই বর্ণোদয়ের অন্তর্গত এবং প্রযত্ন-নিরপেক্ষ ও স্বারসিক। নাদের পরাপররূপে সূক্ষ্মতম তারতম্য আছে। বর্ণের যেটি পরম স্বরূপ তাহার সূক্ষ্মতর অবস্থাতে বর্ণগত ভেদ বা বিভাগ থাকে না, কারণ উহাই সর্ববর্ণের অবিভক্ত সামান্য রূপ। পূর্বে যে অনাহত ধ্বনির কথা বলা হইয়াছে উহাই তাহার স্বরূপ। এই ধ্বনি প্রাণী-মাত্রেরই হৃদয়ে সর্বদাই আপনা-আপনি ধ্বনিত হইতেছে।

একো নাদাত্মকো বর্ণঃ সর্ববর্ণাবিভাগবান্।
সোঽনস্তমিতরূপত্বাৎ অনাহত ইবোদিতঃ॥

ইহার উদয়ই আছে, অস্ত নাই। পরবর্ণের যেটি অপেক্ষাকৃত কম সূক্ষ্ম অবস্থা সেখানে উদয় আছে। অস্তও আছে। তবে এ অস্ত অস্ত নয়, কারণ এ অস্তের মধ্যেও পুনরুদয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। সূক্ষ্মবর্ণের তিনটি স্তর আছে—সূক্ষ্মতার তারতম্য তিনটিতেই আছে। স্থূলবর্ণের উদয় বর্গক্রমে হয়। এক অহোরাত্রে অষ্টবর্গের উদয় হয়। এই উদয় সম্বন্ধে বিবিধ মত আছে—এক মতে ইহা বাহ্য আহোরাত্রের অধীন, অন্য মতে ইহা কিছুর অধীন নহে। পূর্বমতে যে উদয় হয় তাহা বিষম, কিন্তু উত্তরমতে এই উদয় বিষম না হইয়া সমভাবাপন্ন হয়। উত্তরমতানুসারে প্রাণসঞ্চারের পরিমাণ ৩৬ অঙ্গুলি বলিয়া এক এক বর্গের উদয় ৪½ অঙ্গুলি হইয়া থাকে। পূর্বমতে এক এক সংক্রান্তিতে ৯০০ প্রাণের সঞ্চার অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা হইয়া থাকে। দিবাভাগে ১৩টি সংক্রান্তি ও রাত্রিবেলায় ১২টি সংক্রান্তি নির্দিষ্ট আছে। দিবাভাগে প্রাণের যে 'চার' হয় তাহার সংখ্যা ১০৮০০। রাত্রিকালেও ঐ রূপই জানিতে হইবে। মোট চার অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা ২১৬০০। ইহাই অহোরাত্রে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যাবিশিষ্ট অজপা।

এই যে বর্ণের অবিভক্ত সামান্য রূপ বা নাদের কথা বলা হইল ইহা ব্রহ্ম-প্রণব-সংলগ্ন নাদ বা জ্যোতি। এইখানে মন লয়প্রাপ্ত হইলেই পরম পদের সাক্ষাৎকার হয়। মন না থাকিলে নাদ থাকে না, আবার নাদ না থাকিলেও মন থাকে না। কেহ কেহ এই অবস্থাটিকে পরব্রহ্ম অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করেন। যখন (আবরণবশতঃ) নাদ শ্রুত হয় না সেটি বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত অথবা মূঢ় দশা, কিন্তু যখন নাদ শ্রুতিগোচর হয়, সেইটি একাগ্র অবস্থা অথবা জ্ঞানের অবস্থা। আর যখন নাদ-শ্রবণ স্থগিত হইয়া যায় সেইটি চিত্তের নিরোধ অবস্থা। তখন মনের বৃত্তি থাকে না, শুধু সংস্কারমাত্ররূপে মন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এই সংস্কারও যখন থাকে না, তখন চিন্মাত্র বা শুদ্ধ আত্মার স্বরূপস্থিতি জানিতে হইবে।

এই অবিভক্ত বর্ণ বা (পর) নাদ কিংবা (পর) জ্যোতি বস্তুতঃ চিদাত্মিকা শক্তি। ইহাই 'পরা বাক্' পদবাচ্য। পূর্ণ অহন্তা ইহার স্বরূপ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। যাঁহারা পরা বাক্‌কে ও জ্যোতিকে বিন্দু-ক্ষোভ-জন্য মনে করেন তাঁহারা এই কারণ অবস্থার কার্যভাবের দিক্‌টাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এইজন্য সেই মতে পরা বাক্‌কে ভেদ না করিয়া আত্মা নিজের শিবস্বরূপ লাভ করিতে পারে না। এই দৃষ্টিতে পরা বাক্ই শব্দব্রহ্মরূপ রবি, যাহাকে বোধরূপী খড়্গ দ্বারা ভেদ করিয়া স্বরূপ লাভ করিতে হয়।

এই মাত্রাতীত চিন্ময় ও অসীম নাদপ্রবাহ বিশ্বকল্যাণের জন্য ঊর্ধ্ব হইতে ভ্রূ-মধ্যে পতিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপদ হইতে যেমন গঙ্গা শিবমস্তকে অবতীর্ণ হইয়াছেন তদ্রূপ এই নাদগঙ্গাও বিশ্বসৃষ্টির জন্য ও জীবের পরম কল্যাণ সাধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভ্রূমধ্যস্থানই চিত্তের কেন্দ্র-বিন্দু। এই স্থানে প্রকৃতি হ, ক্ষ ও তন্মধ্যে লং বীজ রক্ষা করিয়া সৃষ্টিমুখে নীচে অবতীর্ণ হন। মনোভূমি সঞ্চালনের জন্য এই তিনটি বর্ণ ভ্রূ-মধ্যে সংরক্ষিত হয়। ইহার পর চিৎ-সূত্র অবলম্বন পূর্বক অধঃপ্রদেশে ক্রমশঃ তিনটি মণ্ডল রচিত হয়—প্রথমে সোমমণ্ডল, তাহার পর সূর্যমণ্ডল এবং অন্তে অগ্নিমণ্ডল। তিনটি মণ্ডলই বর্ণময় জানিতে হইবে। তন্মধ্যে সোমমণ্ডল স্বরবর্ণময়, সূর্যমণ্ডল ক-কারাদি ২৫টি ব্যঞ্জন বর্ণময় এবং অগ্নিমণ্ডল য-কারাদি অবশিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণময়। এই তিন মণ্ডলে ক্রমশঃ কারণদেহ, সূক্ষ্ম দেহ ও স্থূল দেহ উদ্ভূত হয়। ইচ্ছা, মন এবং প্রাণের অভিব্যক্তির ইহাই ক্রম। এই পর্যন্ত বর্ণমালাত্মক রচনা সম্পূর্ণ হইলে বর্ণসমষ্টি আরও নীচে অবতরণ করে এবং অজ্ঞানময় কারণসমুদ্রে যাইয়া নিমগ্ন হয়। তখন উহার নাম হয় কুণ্ডলিনী। এইটি চিন্ময় বর্ণমালার সুপ্ত অবস্থা। ইহা ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে সমভাবে হইয়া থাকে।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে নাদ হইতেই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্ট হয়, এবং সৃষ্ট বিশ্বের অন্তরে নাদই প্রাণ বা জীবনী-শক্তিরূপে নিহিত থাকে। ইহাই অনন্ত বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসুপ্ত ভুজগাকারে অবস্থান করিতেছে। আগমবিদ্গণ ইহাকে স্বয়ম্-উচ্চরণশীল অনচ্ক হ্কার বা পরম বীজ বলেন। এই অবস্থায় ইহার নাদ-ভাব অভিভূত থাকে এবং প্রাণাত্মক ভাব উন্মুক্ত থাকে। যখন ইহা বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া থাকে তখন ইহার নাম হয় পরাকুণ্ডলী; যখন ইহা নাদাত্মক রূপে স্ফুরিত হয় তখন ইহার নাম হয় বর্ণকুণ্ডলী এবং যখন এই নাদরূপও ডুবিয়া গভীর সুষুপ্তিতে অবস্থান হয়, তখন ইহার নাম হয় প্রাণকুণ্ডলী।

এই প্রাণই হংস। ইহা আপন স্বভাবে অধঃ-উর্ধ্ব সঞ্চারণ করে—'হ' কার বিমর্শরূপে হান (ত্যাগ) করে ও 'স' কার বিমর্শরূপে সমাদান (গ্রহণ) করে—ত্যাগ ও গ্রহণ ইহার স্বভাব। ইহাই নাদাত্মক হংসের নিত্য উচ্চার। অনচ্ক (হ্)-অভিব্যঞ্জক 'অ' কার। ইহা নাদের শিরোরূপে কল্পিত হয়। এই অকারের সংগে যোগ হইলে উকার অধঃ-উর্ধ্ব সঞ্চারক বলিয়া চরণ রূপে কল্পিত হয়। উকারের যোগ হইলে বিন্দু প্রভৃতি প্রমেয়ের প্রাকট্যের সূত্রপাত হয়। ইহা অনুস্বার বা মকার মাত্রাতেই হইয়া থাকে। এই প্রকারে অ-উ-ম রূপে বা প্রণবরূপে এই উচ্চরণের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। ইহাই বর্ণের উচ্চার।

এই যে বর্ণ-উচ্চারের বিবরণ দেওয়া হইল, ইহার অনুভূতি একটু অন্তর্মুখ হইলে সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেরই হইতে পারে। ইহা নাদের স্থূল অনুভূতি। কুণ্ডলিনী শক্তি প্রবুদ্ধ হইলে ইহা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই লাভ করিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মন ও প্রাণ সম্মিলিত হইয়া জাগ্রৎ কুণ্ডলিনীর সহিত যোগে মধ্য নাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্রই অনন্ত প্রকার বিচিত্রতা-সম্পন্ন স্থূল নাদের অনুভব হইতে আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ দশ প্রকার ধ্বনির বর্ণনা পাওয়া যায়, ইহারও নানা ভেদ আছে। নয়টি ধ্বনি ত্যাগ করিয়া দশমটিকে ধরিয়া থাকিবার বিধান রহিয়াছে। এই সকল ক্রমশঃ অধিক-তর সূক্ষ্ম। সুষুম্না নাড়ীই ব্রহ্মনাড়ী বটে, কিন্তু যতক্ষণ ইহার সহিত সংসৃষ্ট অন্য নাড়ীর যোগসূত্র ছিন্ন না হয় ততক্ষণ ইহা প্রকৃত ব্রহ্মনাড়ী-পদ-বাচ্য হয় না। বজ্রা, চিত্রিণী প্রভৃতি নাড়ী ব্রহ্মনাড়ীরই পূর্বাভাস। এই নাড়ী-সংঘট্টবশতঃ মন, বায়ু ও কুণ্ডলিনীর সঞ্চার বিভিন্ন মার্গে ঘটিয়া থাকে। ব্যক্তিগত আন্তর প্রকৃতির ভেদবশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে। এইজন্যই স্থূল নাদের বৈচিত্র্য ঘটে। নাদের সহিত জ্যোতির সম্বন্ধ আছে। নাদের ভিন্নতার অনুরূপ জ্যোতিরও ভিন্নতা হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ জ্যোতি তাহাই যাহাতে

কোন রং নাই—যাহা শুভ্র প্রকাশ অথবা অবর্ণ প্রকাশ। বিশুদ্ধ নাদও তাহাই যাহাতে স্বরগত, মাত্রাগত ও গুণগত কোন বিভাগ নাই।

হঠযোগে নাদ-সাধনার উপদেশ রহিয়াছে। আদিনাথ শংকরপ্রোক্ত সোয়া কোটি লয়যোগের মধ্যে নাদানুসন্ধানেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। হঠযোগিগণ আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি এই চারিটি নাদভূমির বর্ণনা করিয়া থাকেন। নিষ্পত্তি অবস্থাই সিদ্ধ অবস্থা। ইহার এক একটি অবস্থায় এক একটি গ্রন্থির ভেদ হয় ও এক একপ্রকার শূন্যের উদয়ে এক একপ্রকার ধ্বনির অভিব্যক্তি হয়। এই সম্বন্ধে অধিক বিবরণ বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক।

অ-উ-ম রূপে যে নাদক্রিয়ার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহা যোগাভ্যাস-বশতঃ ক্রমশঃ অধিক অধিক সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। মকার মাত্রার পর ঐ উচ্চার ভ্রূ-মধ্যে বিন্দুরূপ ধারণ করে। 'অ'-কারাদি তিন মাত্রাতে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণরূপে বিদিত নিঃশেষ ভেদ বিদ্যমান আছে—এই সকল ভেদ পিণ্ডীভূত হইয়া অবিভক্তরূপে যেখানে বিদিত হয় তাহাই বিন্দু। এখানে বেদ্য বা জ্ঞেয়ই প্রধান। যোগিগণের নয়টি যোগভূমি বা চিন্ময় অনুভূতিভূমির মধ্যে বিন্দুই প্রথম। এই নয়টি ভূমিও 'নবনাদ' নামে প্রসিদ্ধ। স্থূলেও যেমন নাদের নয়টি বিভাগ কল্পিত হয়, সূক্ষ্মেও তেমনি নয়টি বিভাগই কল্পিত হয়। বিন্দুর উচ্চারণ-কাল অর্ধমাত্রাতে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ঐ সকল যোগভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক মাত্রা হইতে অর্ধমাত্রাতে প্রবেশ অত্যন্ত দুরূহ। মনের লৌকিক স্থিতিতে অর্ধমাত্রাতে প্রবেশ মোটেই ঘটে না, কারণ একাগ্রতা ও নিরোধের সন্ধিস্থানে অর্ধমাত্রা অবস্থিত। প্রজ্ঞার উৎকর্ষ যদি বিভূতির দিকে হয় তাহা হইলে সর্বজ্ঞত্বের আবির্ভাব হয়, কিন্তু যদি উহা চিৎ-প্রকাশের দিকে হয় তাহা হইলে সর্বজ্ঞত্বের নিরোধ ও বিবেকের উদয়, ইহাই উক্ত উৎকর্ষের লক্ষণ। অস্মিতাই গ্রন্থি—ইহা মুক্ত হইলে পূর্ণ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত যে বিবেক-প্রবাহ চলিতে থাকে তাহাই পূর্ণ নিরোধের দিকে লইয়া যায়। ইহারই নাম উন্মনী। মাত্রাহ্রাসানুসারে কালের সম্বন্ধ যতটা কম হয় জড়ের সম্বন্ধও ততটাই কম হইয়া থাকে এবং সেই অনুপাতে চিৎ-প্রকাশের উজ্জ্বলতাও বাড়িয়া থাকে। তাই নিরোধ বা উন্মনী অবস্থায় কাল থাকে না।

দেহতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। ইহা ভেদ করিতে হইলে দেহের স-কল, স-কল-নিষ্কল ও নিষ্কল, এই তিনটি স্তর ভেদ করিতে হয়। অকুল সহস্রার হইতে মূলাধারাদি যাবতীয় কুলপদ্ম ভেদ করিয়া ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিতে হয়। আমরা সাধারণতঃ যে সহস্রদল কমলের কথা শুনিয়া থাকি তাহা দেহের ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত। অকুল হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত প্রদেশের ভাবনা স-কল, বিন্দু হইতে উন্মনী পর্যন্ত স-কল-নিষ্কল এবং মহাবিন্দু নিষ্কল।

ভ্রূমধ্যে কিঞ্চিৎ উপর দিকে ললাটে বিন্দুর স্থান। ইহা বর্তুলাকার এবং দেখিতে দীপের ন্যায়। বিন্দু-আবরণে মূল পাঁচটি কলারই স্থিতি রহিয়াছে। চারিদিকে নিবৃত্তি প্রভৃতি চারিটি কলা এবং শান্ত্যতীতা নামে পঞ্চম কলা বিন্দুর মধ্যে অবস্থিত। 'মতঙ্গ পরমেশ্বর' নামক আগমের মতে যে-পরম তত্ত্বকে লয় অবস্থাতে শিব বলা হয়—ব্যক্ত অবস্থাতে তাহাকেই বিন্দুও বলা হয়। সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থাই বিন্দু। আবার অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে অনন্তে প্রবেশ করিবার প্রথম দ্বারই বিন্দু। স-কল অবস্থাতে সাধক সীমার মধ্যে বর্তমান থাকে, কিন্তু এই অবস্থায় পর পর ভূমি ভেদ করার ফলে চিত্ত ক্রমশঃ অধিকতর একাগ্রতা লাভ করে। আজ্ঞাচক্রে একাগ্রতার পূর্ণ বিকাশ হয়। পাতঞ্জল মতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ণ বিকাশ অস্মিতা নামে অভিহিত হয়। উহাতে প্রজ্ঞার পূর্ণ বিকাশ হইলেও উহা স্থূলেরই ব্যাপার, কারণ সর্বজ্ঞত্বও স্থূলের ধর্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে। বিশুদ্ধ চিদনুভূতি এই ভূমিতে হয় না। গ্রন্থিভেদের পর নিরোধের দ্বার খুলিয়া গেলে সূক্ষ্ম চিদনুভূতির সূত্রপাত হয়। নিরোধের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং পূর্বর্বণিত নব নাদের ক্রমিক উৎকর্ষ একই কথা। নিরোধের চরম অবস্থায় চিত্ত বৃত্তি-শূন্য হয়। অতএব এই নব নাদের ব্যাপারটি নিরুদ্ধ চিত্তের গুপ্ত রহস্য।

বিন্দুর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই ভূমিতে জ্যোতির্ময় জ্ঞানরূপে ঈশ্বরবোধের সূচনা ঘটে। এখানে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে জাগতিক জ্ঞান বিলুপ্ত হইতে পারে না। সমাধিজনিত প্রজ্ঞা হইতে ইহা অনেক উপরের অবস্থা, কারণ সমাধিজনিত জ্ঞান উৎকৃষ্ট হইলেও জাগতিক জ্ঞান মাত্র। কিন্তু অর্ধমাত্রার জ্ঞান চিন্ময় অনুভব, তাই উহা শ্রেষ্ঠ। লৌকিক জ্ঞানে ত্রিপুটীর লোভ ঘটে না—বিরাট্ অভেদজ্ঞানের উদয় হইলেও ভেদবোধের নিবৃত্তি ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। ঐ ভেদবোধ ক্রমশঃ স্তর ভেদ করিতে করিতে কাটিয়া যায়। তখন প্রথম দেশকালের জ্ঞান থাকে বটে, তবে তাহা একটু অন্য প্রকারের। যোগিগণ যে পঞ্চ শূন্যের পরিচয় প্রাপ্ত হন বিন্দুই তন্মধ্যে প্রথম শূন্য। বিন্দুস্তরে বীজ থাকে না অর্থাৎ প্রকৃতির স্ফুরণ থাকে না, তাই ইহাকে পুরুষের অভিন্ন স্বরূপও বলা যাইতে পারে।

বিন্দুর পর অর্ধচন্দ্র। এইটি দ্বিতীয় ভূমি। ইহার মাত্রা ½। বিন্দুকে পূর্ণচন্দ্র বা চন্দ্রবিন্দু কল্পনা করিয়া অর্ধচন্দ্রকে তাহারই অর্ধাংশরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা বিন্দুর উপরে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে চারিটি এবং মধ্যে একটি, মোট পাঁচটি কলা আছে। ইহা কিন্তু শূন্য নহে। ললাটস্থিত অর্ধচন্দ্রে বিন্দুর জ্ঞেয়প্রধান ভাব কাটিয়া যায়।

ইহার পর তৃতীয় ভূমির নাম নিরোধিকা বা রোধিনী। ইহার মাত্রা আরও

সূক্ষ্ম অর্থাৎ ১/৮। এই নিরোধিকা ভূমি লঙ্ঘন করা অতি কঠিন। সমগ্র বিশ্বের শাসনের ভার ব্রহ্মাদি যে পঞ্চ কারণের উপর অর্পিত রহিয়াছে, তাঁহাদেরও ঊর্ধ্বগতি এই নিরোধিকা ভূমিতেই রুদ্ধ হইয়া যায়, কারণ এই ভূমি ভেদ করিলে বিশ্ব-শাসনের কার্য করা আর তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। একমাত্র যোগীই ইহাকে ভেদ করিয়া নাদপথে প্রবেশ করিতে পারে। বস্তুতঃ ইহা বিন্দু-আবরণেরই শেষ প্রান্ত মাত্র।

নিরোধিকার পর নাদ ও নাদের পর নাদান্ত, ক্রমশঃ এই দুইটি ভূমি আছে। নাদের মাত্রা ১/১৬ ও নাদান্তের মাত্রা ১/৩২। এই নাদকে বেষ্টন করিয়া অসংখ্য মন্ত্র-মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। নাদের স্থান ব্রহ্মরন্ধ্র মুখে—বিশুদ্ধ, ত্রিগুণাতীত ও চিতের আভাস-যুক্ত শব্দ এইখানে অনুভূত হয়। বিশুদ্ধ চিত্তের ধারা এইখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বলা চলে। নাদান্তটি শূন্য—ইহাই তৃতীয় শূন্য। কোন কোন আচার্যের মতে নাদ ও নাদান্ত ঈশ্বরপদরূপে গৃহীত হয়। ইহাতে গুণীভূত বেদ্যের ভেদই প্রধান। এই ভূমিতে সমস্ত বাচক শব্দ অভিন্নরূপে বিমর্শনের বিষয়ীভূত হয়। ইহার পর অনাহত ধ্বনি বা হংস ললাটমধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকে। নাদান্তটি নাড়ীর আধার ও ব্রহ্মবিলে লীন—ইহা মোক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। ইহা অধঃ-শক্তি দ্বারা সকল জগৎ ভেদ করিয়া ঊর্ধ্ব-শক্তিতে সমাপ্ত।

ইহার পর শক্তিস্থান—ইহাই ষষ্ঠ চিদ্ভূমি। এই স্থানটি ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে। ঊর্ধ্বকুণ্ডলী এই শক্তিরই নামান্তর—ইহা বিশ্বাধার, কারণ ইহারই গর্ভে অনুন্মিষিত বিশ্ব নিহিত রহিয়াছে। ইহা চারিটি কলার দ্বারা বেষ্টিত—ইহার কেন্দ্রস্থ কলার নাম ব্যাপিনী। শক্তির মাত্রা ১/৬৪। শক্তিতেই আনন্দসত্তার অনুভব হয়। ইহার পর ব্রহ্মের সগুণ শক্তির আনন্দের আভাস। শক্তি হইতে উন্মনী পর্যন্ত প্রতি ভূমিই দীপ্ত দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল। শক্তিটি শূন্যাত্মক নহে, কিন্তু ব্যাপিনী শূন্যস্বরূপ। পঞ্চশূন্যের মধ্যে ইহাই চতুর্থ শূন্য।* শক্তি হইতে ব্যাপিনী পৃথক্। পৃথিবী পর্যন্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও

* অধিকাংশ যোগী উপাসকের ইহাই মত। স্বচ্ছন্দাগমও এই মতের সমর্থক। এই মতে (ক) ঊর্ধ্বশূন্য=শক্তিপদ, যেখানে নাদান্ত পর্যন্ত নিঃশেষ পাশ প্রশান্ত। (খ) অধঃশূন্য=হৃদয়ক্ষেত্র, যাহাতে এখনও প্রপঞ্চের উল্লাস হয় নাই। (গ) মধ্যশূন্য=কণ্ঠ, তালু, ভ্রূমধ্য, ললাট ও ব্রহ্মরন্ধ্রই শক্তিস্থান। তাই ব্যাপিনী চতুর্থ শূন্য। তিনটি শূন্য চল ও হেয়, কারণ ইহারা আপেক্ষিক। বস্তুতঃ চতুর্থ শূন্যও তাই। এই মতে সমনাতে পঞ্চম শূন্য ও উন্মনাতে ষষ্ঠ শূন্য। এইগুলিও চল ও হেয়। পরতত্ত্বের তুলনাতে উন্মনাতেও কিঞ্চিৎ চলত্ব আছে। তবে এসব শূন্য তত্ত্বও পরম শিব দ্বারা

ভুবন বস্তুতঃ শক্তিরই প্রপঞ্চ। শক্তিতত্ত্বটিই অনাশ্রিত ভুবন বা যোগীদের প্রকৃত নিরালম্বপুরী। শিবতত্ত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তিতত্ত্বেই ব্যাপিনীতে অবস্থিত। এই অনাশ্রিত ভুবনের চারিদিকে চারিটি অনুরূপ শক্তি অবস্থিত—মধ্যে আছে অনাশ্রিতা শক্তি। শিবরূপী অনাশ্রিত দেবের উৎসঙ্গে অনাশ্রিতা শক্তি বিরাজমান।

ব্যাপিনীর পর সমনার স্থান। ইহাই পরা শক্তি। ইহা ব্যাপিনী-পদাবস্থিত অনাশ্রিত ভুবনেরও উপরে। ইহাই সকল কারণের কর্তৃভূতা এবং সকল অণ্ডের আধারভূতা। এই শক্তিতে আরূঢ় হইয়াই শিব সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, রক্ষা, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহরূপ পাঁচটি কার্য সম্পাদন করেন। তন্ত্রমতে মহেশ্বর হেতুকর্তা ও শক্তি তাঁহার করণ।

ব্যাপিনীর মাত্রা ১/১২৮ ও সমনার মাত্রা ১/২৫৬।

ইহার পর উন্মনা। কোন মতে ইহার মাত্রা ১/৫১২। মতান্তরে ইহার উচ্চারণকাল নাই, কারণ ইহা মনের অতীত। এইখানেই নাদরূপী শব্দব্রহ্মের শেষ। ইহাই পঞ্চম শূন্য এবং নব নাদের মধ্যে এইটি নবম ভূমি।

শক্তিতে আনন্দময় স্পর্শের অনুভব হয়—তারপর ঊর্ধ্বে প্রবেশ হয়। ব্যাপিনীতে—ত্বক্ ও কেশস্থানে—ব্যাপ্তি লাভ হয়। তারপর শিখাকেশ-স্থানে বা সমনা পদে শুদ্ধ মনন মাত্র থাকে, কিন্তু মননের কোন বিষয় থাকে না। পরে মননও থাকে না—তখন হংস শুদ্ধ আত্মার রূপ ধারণ করে। ঐ স্থিতিতে যুগপৎ অশেষ বিশ্বের অভেদে প্রকাশ হয়। ইহা উন্মনা শক্তির আশ্রয় ঘটে। তখন শিবত্ব লাভ হয়—চিদানন্দঘন পরমেশ্বর-স্বরূপে সমাবেশ হয় এবং হংস সঙ্কোচহীনভাবে প্রসৃত হয় অর্থাৎ ব্যাপক হইয়া ৩৬ তত্ত্বরূপে এবং তদুত্তীর্ণরূপে স্ফুরিত হয়।

স্থূল বর্ণের উচ্চারণ কালকে মাত্রা বলে। বিশ্ব হইতে সমনা পর্যন্ত সূক্ষ্ম বর্ণের উচ্চারণকাল অর্ধমাত্রা হইতে পূর্বোক্ত বিবরণ অনুসারে এক মাত্রার ১/৫১২ ভাগ। কালাংশ ক্রমশঃ অধিকতর সূক্ষ্ম। প্রাচীন আচার্যগণ সূক্ষ্মতম কালের অবয়বের নাম দিয়াছেন 'লব'। পদ্মের একটি দল ভেদ

অধিষ্ঠিত—তাই সিদ্ধিপ্রদ। তাই স্বচ্ছন্দ শাস্ত্রের পরিভাষাতে ছয়টি শূন্য ত্যাগ করিয়া সপ্তমে প্রবেশ আবশ্যক। উহাই বস্তুত পরম পদ। ছয়টি শূন্যই অবস্থা—পথের অন্তর্গত। সপ্তমটিই যোগীর মহালক্ষ্য। উহা—

অশূন্যং শূন্যমিত্যুক্তং শূন্যংচাভাব উচ্যতে।
অভাবঃ স সমুদ্দিষ্টঃ যত্র ভাবাঃ পরং গতাঃ॥

অতএব এই সপ্তম শূন্যই অখণ্ড মহাসত্তা।

করিতে যে সময় লাগে তাহার নাম 'লব'। তাঁহাদের মতে ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর কাল আর নাই। বস্তুতঃ ইহা ঠিক নহে।

মন্ত্র বা নাম চৈতন্যসম্পন্ন হইলে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতা লাভ করে। তখন কালমাত্রা অর্ধমাত্রা হইতে ক্রমশঃ অধিক অধিক কমিয়া আসে। ফোটোগ্রাফের instantaneous exposure-এর সহিত এই কালগত ক্রমিক সূক্ষ্মতা তুলনীয়। সূক্ষ্মতা ক্রমশঃ অর্ধ মাত্রার ধারা ধরিয়া বাড়িতে থাকে। মাত্রা যতই কম হউক্ একেবারে শূন্য হয় না, এবং হইতেও পারে না। তবে শূন্য না হইলেও ব্যবহার ক্ষেত্রে উহা শূন্যবৎ। ২৫৬ মাত্রাকে মনের সূক্ষ্মতম মাত্রার উচ্চারণ মনে করা হয়। মাত্রা আরও সূক্ষ্ম হইলে মনের ক্রিয়া রাখা যায় না বলিয়া উহাকে উন্মনা বলা হয়। তখন আর মনকে ধরা যায় না। মনই ত চন্দ্র—বিন্দুটি পূর্ণচন্দ্র, অবশ্য বিশুদ্ধ ও চিন্ময়। তাই বিন্দু হইতেই চিদনুভবের আরম্ভ হয়। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন জ্যোতি প্রতিফলিত হয় তদ্রূপ চিদালোক প্রতিফলিত হয়। মাত্রাবিভাগের ফলে মনের উপাদান ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। মন থাকিলেই কালের ভয় থাকে। কারণ, মন চন্দ্র ও কাল রাহু। এ কাল অবশ্য সূক্ষ্ম কাল, যাহা জরা ও ক্ষয়ের হেতু। মন যতই ক্ষীণ হয় কালস্পর্শ ততই কম হয়। কিন্তু কম হইলেও থাকে। পক্ষান্তরে প্রতিফলিত চিতের উজ্জ্বলতা ততই অধিক হয়। এই ক্ষীয়মাণ মন সমনা পর্যন্ত থাকে। বিন্দু পূর্ণিমা—তাহার পর হইতেই কৃষ্ণপক্ষ চলিতে থাকে। সমনাকে বলে কৃষ্ণা চতুর্দশী। তাহার পরই উন্মনা—ইহাই অমাবস্যা।

কিন্তু সমনা হইতে উন্মনা কিভাবে হয় তাহা বুঝান কঠিন। যোগী তাহা নিজে অনুভব করেন, তাহা স্ব-সংবেদ্য। এক হিসাবে উন্মনাতে কলা থাকে না—কিন্তু না থাকিলেও থাকে। যেমন অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্ত বৃত্তিরূপে থাকে না, কিন্তু তবু থাকে, অর্থাৎ সংস্কাররূপে থাকে। সমনাতে সূক্ষ্ম মন আছে। উন্মনাতে সূক্ষ্ম মন নাই, সংস্কার আছে।

আরও একটি রহস্য আছে। বিন্দুকে পূর্ণিমা বলিয়াছি, কিন্তু উহা ঠিক পূর্ণিমা নহে। প্রকৃত পূর্ণিমা ষোড়শী—পঞ্চদশী নহে। ঠিক পূর্ণিমা হইলে পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকিত—কৃষ্ণপক্ষ আসিত না। কৃষ্ণ পক্ষই কালগ্রাস। বিন্দুতে ১৫ কলা আছে, এক কলা নাই। অর্থাৎ অমৃতকলা বা ষোড়শীর অভাব আছে। তদ্রূপ উন্মনাতে ১৫ কলার অবসান, কিন্তু গুপ্ত কলাটি আছে—সেটাতে ষোড়শীর আভাস। পঞ্চদশ কলা সেখানে অস্তমিত। প্রকৃতই যদি ষোড়শী থাকিত তাহা হইলে অমাবস্যার পর শুক্ল পক্ষ হইত না। কালচক্রের আবর্তন হয় ষোড়শীর ব্যক্ততার অভাবে। ষোড়শকল পুরুষে

অমৃতকলা একটি—তাহাই প্রকৃত অমাকলা, বাকী ১৫টি কলা কালস্পৃষ্ট ও কালরাজ্যে সংক্রমণ করে।

পাঁচ

নামসাধনার দুইটি দিক্ আছে—একটিতে নামসাধনা নাদে পর্যবসিত হয়, অপরটিতে ইহা রূপাভিব্যক্তির মধ্য দিয়া ভাবসাধনার পথে রসে পর্যবসিত হয়। রসের পথই নিত্যলীলার পথ। দুইটি পথে পরস্পর সম্বন্ধ বা যোগ আছে, আবার পৃথক্ ভাবেও প্রস্থান সম্ভবপর। বর্তমান আলোচনাতে আমরা নাদের দিক্ ধরিয়াই সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিলাম।

নাম হইতে ভাবসাধনার পথে প্রথমে সদ্গুরুপ্রাপ্তি ও মন্ত্রসাধনার অধিকার জন্মে। মন্ত্রসাধনার ফলে দৈহিক উপাদান বিশুদ্ধ হয় ও মন্ত্রসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবদেহের বিকাশ হয়। তখন স্বভাবের পথ উন্মুক্ত হয় ও বিধি-নিষেধের গণ্ডী কাটিয়া যায় বলিয়া রাগমার্গে ভজনের অধিকার জন্মে। ইহাই প্রারম্ভ সাধনা। সাধনার আরম্ভে আশ্রয়-তত্ত্ব ব্যক্ত হয়, তাই রাগসাধনা সম্ভবপর হয়—এটি ভাবরাজ্যের ব্যাপার। ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হইলে প্রেমের বিকাশ হয়। তখন বিষয়-তত্ত্বের অধিকার হয়। ভাবসাধনা একপ্রকার বিরহের ক্রন্দন, কিন্তু প্রেমসাধনা মিলনের উল্লাস। পরে আশ্রয় ও বিষয় পরস্পর মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। এই একসত্তাই রস—এই সমরসতা সিদ্ধাবস্থা বা রসাদ্বৈত। এই মহাস্থিতিতে অনন্ত লীলার স্ফুরণ সম্ভবপর হয়। তখন এক সত্তা অনন্তরূপে ফুটিয়া উঠে ও নিজের আনন্দ অনন্তকাল, অনন্তভাবে নিজেরই মধ্যে আস্বাদিত হইতে থাকে, কিন্তু স্থিতি থাকে সেই একে।

শুধু নামের মাহাত্ম্যে এতদূর পর্যন্তও হইতে পারে। মোট কথা, নামের শক্তি অনন্ত ও অচিন্ত্য।